আমার প্রিয় গল্প

পরশুরাম : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : নরেন্দ্র মিত্র : বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : অচিন্ত্য সেনগুপ্ত : বিভূতি মুখোপাধ্যায় : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রবোধ সান্যাল : আশাপূর্ণা দেবী : গজেন্দ্র মিত্র : সুমথ ঘোষ : বনফুল : সুবোধ ঘোষ : প্রেমেন্দ্র মিত্র : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রমথনাথ বিশী : বিমল মিত্র

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—পাঁচ টাকা—

প্রথম সংস্করণ, পৌষ ১৩৩৫
দ্বিতীয় সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৬৪

প্রচ্ছদপট :
অঙ্কন—আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
ব্লক ও মুদ্রণ—রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, ও কালিকা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, ২৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

ডিকেন্‌স্‌ বহুদিন আগেই বলেছিলেন—'প্রত্যেক স্নেহশীল বাপ-মায়েরই একটি প্রিয়তম সন্তান আছে,—ডেভিড কপারফিল্‌ড্‌ আমার সেই সন্তান।' অথচ ডিকেন্‌স্‌ নিজেই স্বীকার করতেন তাঁর লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে ব্লীক্‌ হাউস্‌ই সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শ্রেষ্ঠই যে প্রিয় হবে তার কোনো মানে নেই। আবার কেউ কেউ বলেন যে, সন্তানের মধ্যে যেটি অক্ষম বা দুর্বল, বাপ-মা তাকেই ভালোবাসেন বেশি; কিন্তু এক্ষেত্রে সেকথাও খাটল না, কারণ আর যাই হোক ডেভিড কপারফিল্‌ড্‌কে কেউ ডিকেন্‌সের অক্ষম রচনা বলতে পারবেন না।

তাহ'লে—প্রিয় কোন্‌টি? কেন প্রিয়?

শিল্পীর রচনার মধ্যে কোন্‌টি তাঁর নিজের বেশি প্রিয়—এ জানবার কৌতূহল পাঠক বা দর্শকদের চিরকালীন। কেন, বলা শক্ত; হয়ত স্রষ্টারা নিজেও ঠিক জানেন না সব সময়ে কারণটা। জীবনের কোন্‌ একটি বিশেষ মুহূর্তে কোন্‌ বেদনার তন্ত্রীতে ঘা লেগে কী ছন্দ গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে কবির মনে, কথাশিল্পী কী চিত্র আঁকেন শব্দ সাজিয়ে, শিল্পীর তুলিতে কী সঙ্গীত রেখায়িত হয়ে ওঠে, তা কে বলতে পারে? এক-একটি বিশেষ রচনার সঙ্গে জীবনের এক-একটি বিশেষ মুহূর্তের ইতিহাস জড়িত থাকে অনেক সময়—হয়তো সেই দাবীতেই তা স্রষ্টার মনে স্নেহের আসন দখল করে। সুতরাং কারণটা জানা সম্ভব না হ'লেও, পাঠকরা বা দর্শকরা যদি কোন্‌টি প্রিয় জানতে পারেন তাহ'লেও তাঁদের কৌতূহলী মন অন্তত সেই রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে রচকের মন জানবার চেষ্টা করতে পারেন, নিজের কল্পনায় তার কারণকে ইচ্ছামতো রূপ দিতে পারেন। সেই উদ্দেশ্যেই বর্তমান সংকলন-গ্রন্থটি প্রকাশ করার প্রয়াস। এর অন্য মূল্য যাই থাক্‌—একটা ঐতিহাসিক মূল্য নিশ্চয়ই আছে। পরবর্তী যুগের পাঠকরা এর মধ্যে দিয়ে কথাশিল্পীদের মনের গতি লক্ষ্য করবার সুযোগ পাবেন—আর বর্তমানকালের পাঠকরা পারবেন

তাঁদের কৌতূহল মেটাতে। এ বইটি ছোটগল্পের সংকলন। বাংলাদেশের বিখ্যাত কথাশিল্পীদের মধ্যে অধিকাংশের কাছেই আমরা এই আবেদন নিয়ে গিয়েছিলুম যে, তাঁদের লেখা সমস্ত ছোটগল্পের মধ্যে যেটি তাঁদের সবচেয়ে প্রিয়—তাঁরা যেন সেইটে বেছে দেন; এবং আমরা আনন্দ ও গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, তাঁদের অনেকেই সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। বাংলাদেশের কথাসাহিত্য-বিভাগ পৃথিবীর কথাসাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি প্রধান স্থান অধিকার ক'রে আছে। বর্তমানকালের কথাশিল্পীদের মধ্যে বাঙালীর সৌভাগ্যক্রমে যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁরা যে-গল্পটিকে তাঁদের প্রিয় ব'লে মনে করেন সেইগুলির এই অপূর্ব সঞ্চয়ন পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারবে ব'লেই আমরা আশা করি।

যাঁদের কাছে প্রার্থনা পৌছানো সম্ভব হয়নি কিংবা ভিক্ষা মেলেনি—তাঁদের রচনা দিয়ে এটি সম্পূর্ণ করতে পারলাম না ব'লে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ইতি—

প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

এই সংকলন-গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ বহুদিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। নানা কারণে পুনর্মুদ্রণ বহু বিলম্বিত হয়েছে। তার জন্য পাঠকসাধারণের কাছে আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তবে একটা সান্ত্বনা—এবার আমরা তিনটি বিশিষ্ট রচনার সংযোজনে সংকলনটিকে সমৃদ্ধতর করতে পেরেছি। পরশুরাম, প্রমথনাথ বিশী এবং বিমল মিত্রের তিনটি গল্প এতে সংযোজিত করতে পারায় আমরা কৃতার্থ। ইতি—

সূচী

পরশুরাম

বাংলা সাহিত্যে পরশুরামের আবির্ভাব একেবারে অত্যাশ্চর্য। বিজ্ঞানবিদ্ রাজশেখর বসু—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের উত্তরসাধক, বেঙ্গল কেমিক্যালের কর্ণধার—তিনি যে "শ্রীশ্রী-সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড" লিখবেন, এ কে জানত। বস্তুত ১৯২২ সালে যখন ঐ প্রথম গল্পটি 'পরশুরাম' এই ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় সেদিন সে পরশুরামের সঙ্গে স্বভাবগম্ভীর মিতভাষী কর্মবীর রাজশেখরের কোন সাদৃশ্য কেউ খুঁজে বার করতে পারেন নি—কল্পনাও করেন নি।...সেদিনের সে জয়যাত্রা আজও অব্যাহত আছে। নানা ঝড়-ঝাপটা, দুঃখ-শোক তাঁকে সইতে হয়েছে বারবার, তার মধ্যেও তাঁর কৌতুকবোধের উৎস শুকোয় নি, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের ক্ষুরধার তীব্রতা অম্লান আছে। যে গল্পটি এখানে ছাপা হল সেটি তাঁর সাতাত্তর বছর বয়সের রচনা, ১৯৫৬ সালে লিখিত। এতে তাঁর শক্তির অক্ষুণ্ণতা খানিকটা বোঝা যাবে। কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্র ছাড়াও রাজশেখর বসু মহাশয়ের সাহিত্যকৃতি বাংলা ভাষার অপরাপর ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখে গেছে। আধুনিক বাংলা ভাষার অভিধান হিসাবে তাঁর সঙ্কলিত 'চলন্তিকা' আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। মূল সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের তৎকৃত সারানুবাদ বাঙ্গালীর বহুদিনের অভাব দূর করেছে। তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি আগামী পঞ্চাশ বছর পরেও শিক্ষিত বাঙ্গালীকে চিন্তার খোরাক জোগাবে এবং সম্ভবত চিরদিন এক বিস্ময়কর মনীষার সাক্ষ্য হয়ে থাকবে।...মুক্তার মত হস্তাক্ষর, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন পাণ্ডুলিপি পরশুরামের আর এক বৈশিষ্ট্য। অত্যন্ত নিয়মানুগ বা 'মেথডিক্যাল' মানুষ তিনি। এখনও পুরাতন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে আংশিক ভাবে জড়িত আছেন। জন্ম—১৬ই মার্চ, ১৮৮০; ১৮৯৯এ বিজ্ঞানের দুটি বিষয়ে অনার্স নিয়ে বি এ পাস করেন। তার পরের বছরই রসায়নে এম এ পাস করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল কেমিক্যালে যোগ দেন।

নির্মোক নৃত্য

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, তোমার মতলবটা কি উর্বশী? এই স্বর্গধামে তো পরম সুখে আছ, উত্তম বাসগৃহ, সুন্দর প্রমোদকানন, মহার্ঘ বেশভূষা, প্রচুর বেতন, সবই তো ভোগ করছ। এ সব ত্যাগ করে মর্ত্যলোকে যেতে চাও কেন? এখন রাজা পুরূরবা সেখানে নেই যে তোমাকে মাথায় করে রাখবেন। স্বর্গে তুমি চিরযৌবনা অনিন্দিতা সুরেন্দ্রবন্দিতা, কিন্তু মর্ত্যে গেলেই দু দিনে বুড়িয়ে যাবে, তখন যতই প্রসাধন লেপন কর তোমার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না।

উর্বশী নতমস্তকে বললেন, দেবরাজ, এখানে আমার অরুচি ধরেছে। সব পুরুষকেই আমি জয় করেছি, তাদের একঘেয়ে চাটুবাক্য আর প্রেমভিক্ষা আমার আর ভাল লাগে না। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে আমার অসংখ্য ভক্ত জুটবে, অর্থও প্রচুর পাব। জরার লক্ষণ দেখলে আবার না হয় এখানে চলে আসব।

—তোমার অত্যন্ত অহংকার হয়েছে দেখছি। এখানে তোমার আদরের অভাবটা কি?

—মানুষের কাছে ঢের বেশী আদর পাব। মর্ত্যের এক কবি লিখেছেন, 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল, তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।' অমরাবতীর কোন্ কবি এমন লিখতে পারে?

—কবিরা বিস্তর মিছে কথা লেখে। যদি প্রমাণ করতে পার যে এখানকার সব পুরুষকে তুমি জয় করেছ তবে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। দেবর্ষি আর মহর্ষিদের কাবু করতে পার?

—তাঁরা তো সেই কবে কাবু হয়ে গেছেন।

—আচ্ছা, তোমাকে পরীক্ষা করব। দিব্য মানব জান? যাঁরা স্বর্গে মর্ত্যে অবাধে আনাগোনা করেন, যেমন সনৎকুমার সনাতন সনক সদানন্দ।

এঁরা হলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। এঁদের ঘাঁটাতে চাই না, অত্যন্ত বদরাগী মুনি। তবে আরও তিন জন সম্প্রতি এখানে বেড়াতে এসেছেন— কুতুক, পর্বত, আর কর্দম ঋষি। এঁরা বেশ শান্তস্বভাব আর একেবারে নির্বিকার। এঁদের কাবু করতে পারবে?

—যদি পুরুষ হন তবে কাবু করতে পারব না কেন?

—শুধু পুরুষ নন, ওঁরা মহাপুরুষ।

—তবে ওঁদের মহাকাবু করব।

—উত্তম কথা। ওঁরা হলেন দেবর্ষি নারদের বন্ধু। নারদকে বলব তোমার নাচ দেখবার জন্যে আমার সভায় ওঁদের নিমন্ত্রণ করে আনবেন।

নারদের মুখে নিমন্ত্রণ পেয়ে তিন ঋষি প্রীত হলেন। বললেন, আমরা ময়ূর-নৃত্য খঞ্জননৃত্য দেখেছি, বানর-ভল্লুকাদির নৃত্যও দেখেছি, কিন্তু নারীনৃত্য কখনও দেখি নি। দেখবার জন্য খুব কৌতূহল আছে। কিন্তু উর্বশী তো শুনেছি অপ্সরা, সে নারী বটে তো?

নারদ বললেন, এমন নারী যার জন্যে 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা।' তার নৃত্য দেখলে তোমরা মুগ্ধ হবে। এখন ইন্দ্রসভায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও।

পর্বত ঋষির দাড়ি গলা পর্যন্ত, কর্দমের বুক পর্যন্ত, আর কুতুক ঋষির হাঁটু পর্যন্ত। এঁরা যথাসাধ্য ভব্য বেশ ধারণ করে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন। পর্বত একটি বল্কল পরলেন, বল্কল না থাকায় কর্দম শুধু কৌপীন ধারণ করলেন। মহামুনি কুতুক একেবারে সর্বত্যাগী, তাঁর বল্কলও নেই কৌপীনও নেই, অগত্যা তিনি দিগম্বর হয়েই রইলেন। নারদ বললেন, ওহে কুতুক, অন্তত একটা তৃণগুচ্ছের মেখলা পরে নাও। কুতুক বললেন, কোনও প্রয়োজন

নির্মোক নৃত্য

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, তোমার মতলবটা কি উর্বশী? এই স্বর্গধামে তো পরম সুখে আছ, উত্তম বাসগৃহ, সুন্দর প্রমোদকানন, মহার্ঘ বেশভূষা, প্রচুর বেতন, সবই তো ভোগ করছ। এ সব ত্যাগ করে মর্ত্যলোকে যেতে চাও কেন? এখন রাজা পুরূরবা সেখানে নেই যে তোমাকে মাথায় করে রাখবেন। স্বর্গে তুমি চিরযৌবনা অনিন্দিতা সুরেন্দ্রবন্দিতা, কিন্তু মর্ত্যে গেলেই দু দিনে বুড়িয়ে যাবে, তখন যতই প্রসাধন লেপন কর তোমার দিকে কেউ ফিরেও তাকাবে না।

উর্বশী নতমস্তকে বললেন, দেবরাজ, এখানে আমার অরুচি ধরেছে। সব পুরুষকেই আমি জয় করেছি, তাদের একঘেয়ে চাটুবাক্য আর প্রেমভিক্ষা আমার আর ভাল লাগে না। পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে আমার অসংখ্য ভক্ত জুটবে, অর্থও প্রচুর পাব। জরার লক্ষণ দেখলে আবার না হয় এখানে চলে আসব।

—তোমার অত্যন্ত অহংকার হয়েছে দেখছি। এখানে তোমার আদরের অভাবটা কি?

—মানুষের কাছে ঢের বেশী আদর পাব। মর্ত্যের এক কবি লিখেছেন, 'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল, তোমারি কটাক্ষপাতে ত্রিভুবন যৌবনচঞ্চল।' অমরাবতীর কোন্ কবি এমন লিখতে পারে?

—কবিরা বিস্তর মিছে কথা লেখে। যদি প্রমাণ করতে পার যে এখানকার সব পুরুষকে তুমি জয় করেছ তবে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। দেবর্ষি আর মহর্ষিদের কাবু করতে পার?

—তাঁরা তো সেই কবে কাবু হয়ে গেছেন।

—আচ্ছা, তোমাকে পরীক্ষা করব। দিব্য মানব জান? যাঁরা স্বর্গে মর্ত্যে অবাধে আনাগোনা করেন, যেমন সনৎকুমার সনাতন সনক সদানন্দ।

এঁরা হলেন ব্রহ্মার মানসপুত্র। এঁদের ঘাঁটাতে চাই না, অত্যন্ত বদরাগী মুনি। তবে আরও তিন জন সম্প্রতি এখানে বেড়াতে এসেছেন— কুতুক, পর্বত, আর কর্দম ঋষি। এঁরা বেশ শান্তস্বভাব আর একেবারে নির্বিকার। এঁদের কাবু করতে পারবে?

—যদি পুরুষ হন তবে কাবু করতে পারব না কেন?

—শুধু পুরুষ নন, ওঁরা মহাপুরুষ।

—তবে ওঁদের মহাকাবু করব।

—উত্তম কথা। ওঁরা হলেন দেবর্ষি নারদের বন্ধু। নারদকে বলব তোমার নাচ দেখবার জন্যে আমার সভায় ওঁদের নিমন্ত্রণ করে আনবেন।

নারদের মুখে নিমন্ত্রণ পেয়ে তিন ঋষি প্রীত হলেন। বললেন, আমরা ময়ুর-নৃত্য খঞ্জননৃত্য দেখেছি, বানর-ভল্লুকাদির নৃত্যও দেখেছি, কিন্তু নারীনৃত্য কখনও দেখি নি। দেখবার জন্য খুব কৌতূহল আছে। কিন্তু উর্বশী তো শুনেছি অপ্সরা, সে নারী বটে তো?

নারদ বললেন, এমন নারী যার জন্যে 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা।' তার নৃত্য দেখলে তোমরা মুগ্ধ হবে। এখন ইন্দ্রসভায় যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নাও।

পর্বত ঋষির দাড়ি গলা পর্যন্ত, কর্দমের বুক পর্যন্ত, আর কুতুক ঋষির হাঁটু পর্যন্ত। এঁরা যথাসাধ্য ভব্য বেশ ধারণ করে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলেন। পর্বত একটি বল্কল পরলেন, বল্কল না থাকায় কর্দম শুধু কৌপীন ধারণ করলেন। মহামুনি কুতুক একেবারে সর্বত্যাগী, তাঁর বল্কলও নেই কৌপীনও নেই, অগত্যা তিনি দিগম্বর হয়েই রইলেন। নারদ বললেন, ওহে কুতুক, অন্তত একটা তৃণগুচ্ছের মেখলা পরে নাও। কুতুক বললেন, কোনও প্রয়োজন

নেই, আজানুলম্বিত শ্মশ্রুই আমার বসন।

নবাগত তিন ঋষিকে পাদ্য অর্ঘ্য আসন ইত্যাদি দিয়ে যথাবিধি সৎকার করে ইন্দ্র বললেন, হে মহাতেজা তপঃসিদ্ধ জিতেন্দ্রিয় মহর্ষিত্রয়, আমার মুখ্যা অপ্সরা উর্বশী আপনাদের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত একটি অভিনব নৃত্য দেখাবে—নির্মোক নৃত্য, মর্ত্যলোকের প্রতীচ্যখণ্ডের ম্লেচ্ছগণ যাকে বলে স্ট্রিপ-টীজ। এখানে অগ্নি বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, অগস্ত্যাদি মহর্ষিগণ, সকলেই সমবেত হয়েছেন, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরারাও আছেন। আপনাদের আগমনে আমরা সকলেই কৃতার্থ হয়েছি। এখন অনুমতি দিন, উর্বশী নৃত্য আরম্ভ করুক।

আগন্তুক তিনি ঋষির মুখপাত্র মহামুনি কুতুক বললেন, হাঁ হাঁ, বিলম্বে প্রয়োজন কি, আমরা নৃত্য দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

লাস্য নৃত্যের উপযুক্ত বেশভূষার উপর একটি আলখাল্লা বা ঘেরাটোপ পরে উর্বশী ইন্দ্রসভায় প্রবেশ করলেন। সকলকে প্রণাম করে যুক্তকরে বললেন, হে মহাভাগ দেবগণ এবং অগ্নিকল্প ঋষিগণ, আমি যে নির্মোক নৃত্য দেখাব তাতে আমার দেহ ক্রমে ক্রমে অপাবৃত হবে। আপনাদের আপত্তি নেই তো?

কুতুক তাঁর মাথা আর বিপুল দাড়ি নেড়ে বললেন, আপত্তি কিসের? যাবতীয় জন্তুর ন্যায় তোমার দেহও পঞ্চভূতের সমষ্টি। তার অভ্যন্তরে নারীসত্তা কোথায় আছে তাই আমরা দেখতে চাই।

উর্বশী পুনর্বার সবিনয়ে বললেন, আমার নৃত্যে যদি অসভ্য বা কুৎসিত কিছু পান তবে দয়া করে জানাবেন, তৎক্ষণাৎ আমি নৃত্য সংবরণ করব।

ঘেরাটোপ ফেলে দিয়ে উর্বশী তাঁর মণিমুক্তাস্বর্ণময় দৃষ্টিবিভ্রমকর উজ্জ্বল

বেশ প্রকাশ করলেন। তার পর কিছুক্ষণ নৃত্য করে তাঁর উত্তরীয় বা ওড়না খুলে ফেলে দিলেন।

পর্বত ঋষি হাত তুলে বললেন, নিবৃত্ত হও, তোমার নৃত্যে শালীনতার অত্যন্ত অভাব দেখছি। এই চিত্তপীড়াকর নৃত্য আমরা দেখতে চাই না।

মহামুনি কুতুক ধমক দিয়ে বললেন, তোমার চিত্তপীড়া হয়েছে তো আমাদের কি ? তুমি চক্ষু মুদ্রিত করে থাক, নৃত্য চলুক।

উর্বশী চুপিচুপি ইন্দ্রকে বললেন, দেবরাজ, পর্বত ঋষি কাবু হয়েছেন।

নৃত্য চলতে লাগল। পর্বত ঋষি দুই হাতে চোখ ঢাকলেন, কিন্তু কৌতূহল দমন করতে না পেরে আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলেন।

ক্রমে ক্রমে উর্বশী তাঁর দেহের ঊর্ধ্বাংশ অনাবৃত করলেন। তখন কর্দম ঋষি চোখ ঢেকে বললেন, উর্বশী, তোমার এই জুগুপ্সিত নৃত্য ক্ষান্ত কর, দেখলে আমাদের তপস্যা নষ্ট হবে।

কুতুক ভর্ৎসনা করে বললেন, কেন ক্ষান্ত করবে ? তোমার সহ্য না হয় তো উঠে যাও এখান থেকে।

সহাস চক্ষুর ইঙ্গিতে উর্বশী ইন্দ্রকে জানালেন যে কর্দমও কাবু হয়েছেন।

তার পর উর্বশী ক্রমশ তাঁর সমস্ত আবরণ আর আভরণ খুলে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন এবং অবশেষে 'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি' প্রকাশ করে পাষাণ-বিগ্রহবৎ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সভাস্থ দেবগণ দেবর্ষিগণ ও মহর্ষিগণ বললেন, সাধু সাধু !

কুতুক বললেন, থামলে কেন উর্বশী, চালাও নাচ, আরও নির্মোক ত্যাগ কর।

নারদ বললেন, আর নির্মোক কোথায় ? উর্বশী তো সমস্তই মোচন করেছে।

কুতুক বললেন, ওই যে, ওর সর্বগাত্রে একটি পদ্মপলাশতুল্য শুভ্রারক্ত

মসৃণ আবরণ রয়েছে।

—আরে ও তো ওর গায়ের চামড়া।

—ওটাও খুলে ফেলুক।

—পাগল হলে নাকি হে কুতুক? গায়ের চামড়া তো শরীরেরই অংশ, ও তো পরিচ্ছদ নয়।

—পরিচ্ছদ না হ'ক নির্মোক তো বটে। ওই খোলসটাও খুলে ফেলুক। নীচে কি আছে দেখব।

নারদ বললেন, কি আছে শোন। চর্মের নীচে আছে মেদ, তার নীচে মাংস, তার নীচে কংকাল।

—তার নীচে কি আছে?

—কিচ্ছু নেই।

—যার প্রভাবে 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা', উর্বশীর সেই নারীত্ব কোথায় আছে?

—নারীত্ব আছে ওর বসনে, আভরণে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে, ভাবভঙ্গীতে, আর অনুরাগী পুরুষের চিত্তে। তুমি তো বীতরাগ, চিত্ত পুড়িয়ে খেয়েছ, দেখবে কি করে?

মহামুনি কুতুক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমাকে প্রতারিত করবার জন্যে এখানে ডেকে এনেছ? এই উর্বশী একটা অন্তঃসারশূন্য জন্তু, ছাগদেহের সঙ্গে ওর দেহের প্রভেদ কি? ওহে পর্বত, ওহে কর্দম, চল আমরা যাই, এখানে দেখবার কিছু নেই।

উর্বশীর লাঞ্ছনা দেখে মেনকা ঘৃতাচী মিশ্রকেশী প্রভৃতি অপ্সরার দল আনন্দে করতালি দিলেন।

কুতুম কর্দম ও পর্বত সভা ত্যাগ করলে উর্বশী নতমুখে অশ্রুপাত করতে লাগলেন।

ইন্দ্র বললেন, উর্বশী, শান্ত হও, নিরন্তর জয়লাভ কারও ভাগ্যে ঘটে না, আমিও বৃত্রাসুর কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলাম।

উর্বশী বললেন, একে কি পরাজয় বলে দেবরাজ? ওই কুতুক ঋষি একটা অপুরুষ অপদার্থ দগ্ধেন্দ্রিয় উন্মাদ, ওকে দিয়ে এই সভায় আমার এমন অপমান করিয়ে আপনার কি লাভ হল? আমি অমরাবতীতে থাকব না, মর্ত্যেও যাব না, তপশ্চর্যা করব।

অনন্তর উর্বশী মাথা মুড়োলেন, তুলসীমালা পরলেন, তিলকচর্চা করলেন, এবং নিত্যধাম গোলোকে গিয়ে হরিপাদপদ্মে আশ্রয় নিলেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা-সাহিত্যের মৌলিক গোয়েন্দা-গল্প বোধ হয় প্রথম লেখেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'ব্যোমকেশের কাহিনী' ও 'ব্যোমকেশের ডায়েরী' একদিন পাঠক-সমাজে চাঞ্চল্য এনেছিল। এ-ছাড়া প্রাচীন ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা তাঁর গল্পও তাঁকে যথেষ্ট খ্যাতি দিয়েছে। 'চুয়াচন্দন' 'বিষকন্যা' প্রভৃতি এই শ্রেণীরই বই। তাঁর 'বিষের ধোঁয়া' নামক উপন্যাস 'ভাবী' নামে হিন্দী কথাচিত্রে রূপান্তরিত হয়ে তাঁকে প্রথম ফিল্ম্-জগতে প্রচুর খ্যাতি এনে দেয়—সেই থেকে তিনি আজ পর্যন্ত বোম্বেতে থেকে অসংখ্য জনপ্রিয় ছবির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। ইনি বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালী, মুঙ্গেরে এঁর বাড়ি। আইন পাস করেছিলেন কিন্তু ওকালতিতে বিশেষ মন দেননি। এঁর পুত্রও সম্প্রতি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চিত্র-পরিচালনা শুরু করেছেন।

মেঘদূত

জ্যৈষ্ঠ মাসের অপরাহ্ণে ব্রতীন মাঠ ভাঙিয়া গ্রামের দিকে চলিয়াছিল। সূর্য প্রায় অস্তোন্মুখ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার চোখের রক্ত-রাঙা ক্রোধ এখনও নিভিয়া যায় নাই।

রৌদ্রে পোড়া চারণভূমি; ঘাস যে দু'চার গাছি ছিল জ্বলিয়া খড় হইয়া গিয়াছে। মাঠে জনপ্রাণী নাই। সম্মুখে প্রায় মাইল খানেক দূরে গ্রামের খোড়ো ঘরগুলি দিগন্তরেখাকে একটু অসমতল করিয়া দিয়াছে। তাহারই কাছাকাছি একটা নিঃসঙ্গ তালগাছ শূন্যে গলা উঁচু করিয়া যেন দূরের কোনও দৃশ্য দেখিবার চেষ্টা করিতেছে; অবসন্ন মূর্ছাহত দিগন্তের ওপারে শীতলতার কোনও আশ্বাস আছে কিনা তাহারই সন্ধান করিতেছে। ঐ তালগাছটা ব্রতীনের বাড়ির কাছেই।

তপতীর কথা ব্রতীনের মনে হইল ; তপতী হয়তো জানালায় দাঁড়াইয়া তাহার পথ চাহিয়া আছে। ব্রতীন আরও জোরে পা চালাইল। একে তো ঘরমুখো বাঙালী ; তার উপর ক্যাম্বিসের জুতার তল ভেদ করিয়া মাটির উত্তাপ তাহার পায়ের চেটো পুড়াইয়া দিতেছে। সমস্ত দিনের অগ্নিক্ষারণ মাটির কটাহে সঞ্চিত হইয়া টগবগ করিয়া ফুটিতেছে।

ব্রতীন ভদ্রসন্তান ; শহরের আবহাওয়ায় লেখাপড়া শিখিয়া সে মানুষ হইয়াছিল। জীবনে বেশি উচ্চাশা তাহার ছিল না ; গতানুগতিক ভাবে চাকরি-বাকরি করিয়া সংসার পাতিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া দিবে এইরূপ একটা ভাসা-ভাসা অভিপ্রায় তাহার মনে ছিল। কিন্তু সহসা একদিন ভাব-বন্যার দুর্নিবার টানে তাহার ঘাটে-বাঁধা খেয়াতরী ভাসিয়া গিয়াছিল। তার পর বহু আঘাটা ঘুরিয়া অবশেষে তাহার জীর্ণ তরী এক যুগাবতার মহাপুরুষের আশ্রম-বন্দরে গিয়া ভিড়িয়াছিল।

আশ্রমে মহাপুরুষের সান্নিধ্যে থাকিয়া ব্রতীন শান্তি পাইয়াছিল, জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট পন্থা দেখিতে পাইয়াছিল, মনুষ্যত্বের নিঃসংশয় মূল্য কোথায় তাহা অনুভব করিয়াছিল। ক্রমে আশ্রমের নিঃস্বার্থ ফললিপ্সাহীন কর্মের মধ্যে সে ডুবিয়া গিয়াছিল।

এই আশ্রমেই তপতীর সহিত তাহার পরিচয় হয়। তপতীও ব্রতীনের মত নোঙর-ছেঁড়া নৌকা। দুজনের দুজনকে ভালো লাগিয়াছিল ; আশ্রমের বহু যুবকযুবতীর মধ্যে ইহারা পরস্পরকে বিশেষভাবে কাছে টানিয়া লইয়াছিল। এই প্রীতির মধ্যে জৈব আকর্ষণ কতখানি ছিল বলা যায় না, তাহারা সজ্ঞানে কিছুই অনুভব করে নাই।

কিন্তু মহাপুরুষ তাহাদের মনের অবস্থা অনুভবে বুঝিয়াছিলেন। একদিন তাহাদের নিভৃতে ডাকিয়া স্মিতমুখে বলিলেন,—'তোমাদের মনের কথা আমি জানি। বিয়ে করবে?'

দুজনে গুরুর সম্মুখে পাশাপাশি বসিয়াছিল, তাঁহার কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; পুলকিতচিত্তে ভাবিল, গুরু কি অন্তর্যামী? তাহাদের অন্তরের গূঢ়তম আকাঙ্ক্ষা তিনি জানিলেন কি করিয়া?

তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়া গুরু আবার হাসিলেন, বলিলেন,—'বেশ, তোমাদের আমি বিয়ে দেব। কিন্তু একটি শর্ত আছে। যতদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন না হয় ততদিন ব্রহ্মচর্য পালন করবে।'

শর্তের কথা শুনিয়া দুজনেই লজ্জা পাইয়াছিল; একটু কৌতুকও অনুভব করিয়াছিল। মাছকে যদি বলা হয়, তুমি সারা জীবন জলে বাস করিবে, তাহা হইলে সে কি দুঃখিত হয়? ব্রতীন ও তপতী এতাবৎ অনায়াসে অবহেলাভরে ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছে, কখনও গুরুতর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে নাই। তবে যে আজ তাহারা পরস্পরকে কামনা করিয়াছে, সে তো মনের প্রতি মনের আকর্ষণ; সান্নিধ্যের বাসনা, আত্মসমর্পণের আনন্দ। তাহারা পরস্পরের হইতে চায়, ইহার বেশি আর কিছু নয়।

নতমুখে ঘাড় নাড়িয়া তাহারা গুরুর শর্ত সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অতঃপর মহাপুরুষ স্বয়ং তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন।

বিবাহের কিছুদিন পরে মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন,—'এখানকার কাজ তোমাদের শেষ হয়েছে। এখন গ্রামে গিয়ে বাস কর; তোমাদের আদর্শে গ্রামবাসীকে গ'ড়ে তোলো।'

ব্রতীনরা তিনপুরুষ আগে জমিদার ছিল। এখনও গ্রামে তাহাদের ভাঙা ভদ্রাসন ও কয়েকবিঘা জমি পড়িয়া ছিল। ব্রতীন তপতীকে লইয়া ভাঙা ভদ্রাসনে গিয়া উঠিল।

তদবধি গত কয়েকমাস ধরিয়া এই গ্রামে তাহাদের জীবনযাত্রা শান্ত ধারায় বহিয়া চলিয়াছে। ব্রতীন জমিজমা দেখে, গ্রামের ছেলেবুড়োকে পড়ায়; তপতী গৃহকর্ম করে, গ্রামের মেয়েদের সেলাই শেখায়, সূতা কাটিতে শেখায়;

এমনিভাবে শীত বসন্ত কাটিয়াছে, জ্যৈষ্ঠও শেষ হইতে চলিল।

আজ সকালে ব্রতীন পাশের গ্রামে গিয়াছিল একজোড়া বলদ কিনিবার জন্য। বর্ষা নামিতে আর দেরি নাই, এখন হইতে চাষবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিদাঘের কঠোর পৌরুষ কখন সংযম হারাইয়া সঞ্জীবনী ধারায় পৃথিবীকে নিষিক্ত করিবে তাহার স্থিরতা নাই, রৌদ্রঋতুরুক্ষা ধরিত্রী প্রতীক্ষা করিয়া আছে।

পাশের গ্রামটি ক্রোশ দুই দূরে ; সেখানে দ্বিপ্রহর কাটাইয়া ব্রতীন বাড়ি ফিরিতেছিল। বলদ দুটি তাহার পছন্দ হইয়াছে, দরদামও ঠিক হইয়াছে—কাল সকালে তাহার লোক গিয়া তাহাদের লইয়া আসিবে।

ব্রতীন ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল—বলদ দুটি তপতীর নিশ্চয় খুব পছন্দ হইবে। গোলগাল গড়ন, দুধের মত সাদা—যেন দুটি যমজ ভাই। ব্রতীন তাহাদের নাম রাখিবে কার্তিক গণেশ—না—গৌর নিতাই। তপতী তাহাদের না দেখা পর্যন্ত উত্তেজনায় ছটফট করিয়া বেড়াইবে—রাত্রে ঘুমাইতে পারিবে না। তপতীর একটা অভ্যাস, কোনও বিষয়ে অধিক কৌতূহল হইলে সে বাঁ হাত দিয়া ডান হাতের তর্জনী মুঠি করিয়া ধরিয়া দুই হাত একসঙ্গে নাড়িতে থাকে এবং অনর্গল প্রশ্ন করে। আজও তেমনি ভাবে দুই হাত নাড়িতে নাড়িতে জিজ্ঞাসা করিবে,—বল-না কেমন দেখতে? কত বয়স? শিং খুব বড় বড়—?

চিন্তান্বিত মুখে চলিতে চলিতে ব্রতীন সহসা অনুভব করিল তাহার চারিদিকে আলোর উগ্রতা যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে। সে চকিতে চোখ তুলিয়া আকাশের পানে চাহিল ; তার পর থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার হর্ষোৎফুল্ল চোখে নীল কপিশ মেঘের ছায়া পড়িল। নৃত্য-পাগল বাউলের বিস্রস্ত জটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে—সূর্যের চোখে গাঢ় মেঘের অঞ্জন। প্রবল বাতাসের ফুৎকারে ফুৎকারে মেঘের দল ছুটিয়া আসিতেছে—তাহাদের খাঁজে খাঁজে নীল বিদ্যুতের

চাপা আগুন। বায়ুমণ্ডলে একটা শব্দহীন স্পন্দন উঠিতেছে—ঝনন্ ঝনন্—

ব্রতীন দাঁড়াইয়া প্রকৃতির এই হর্ষোন্মাদনা দেখিতে লাগিল। দূরে তাহার বাড়ির পাশের তালগাছটা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এখন হঠাৎ যেন কোন অপ্রত্যাশিত আনন্দ-সংবাদ পাইয়া বাহু আস্ফালন করিয়া উন্মত্ত বেগে নাচিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বিদ্যুৎকশাহত মেঘের দল আসিয়া পড়িল, মাঠের রৌদ্রদগ্ধ তৃণদল থরথর বেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঝড়ের আবেগে সাড়া দিল। ব্রতীনের হাতে মুখে তপ্ত বাতাসের স্পর্শ লাগিল।

কিছুক্ষণ ঝড়ের মাতামাতি চলিবার পর বর্ষণ নামিল। বড় বড় ফোঁটা; প্রথমে অশ্রুজলের মত আতপ্ত, তার পর বরফের টুকরার মত ঠাণ্ডা। শীতলতা! কি অপূর্ব শীতলতা! চারিদিক বৃষ্টিধারায় ঝাপসা হইয়া গেল; দুর্মদ বাতাস বৃষ্টিধারাকে মথিত করিয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সিক্তভূমি হইতে ঝাঁঝালো সোঁদা গন্ধ উঠিল—

ব্রতীন যখন বাড়ি ফিরিল তখন তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া জলের স্রোত বহিতেছে। তপতী তাহাকে জানালা দিয়া দেখিয়াছিল, সে বারান্দায় উঠিতেই তপতী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল, হাসিভরা অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, 'বা রে, তুমি কেমন ভিজলে, আমি ভিজতে পেলুম না!'

ব্রতীন আঙুল দিয়া নিজের মুখের জল চাঁছিয়া লইয়া তপতীর মুখে তাহার ছিটা দিয়া বলিল,—'এই তো, ভেজো না!'

পাখীর কুহরণের মত ছোট একটি হাসি তপতীর কণ্ঠ হইতে বাহির হইল।

'ও বুঝি আবার ভেজা! বিষ্টিতে দাঁড়িয়ে না ভিজলে কি মজা হয়?'

ব্রতীন সিক্ত খদ্দরের পাঞ্জাবীটি খুলিয়া ফেলিতে ফেলিতে বলিল,—'বেশ তো, তাই ভেজো। আমি তো ভেবেছিলুম এসে দেখব তুমি দিব্যি ভিজে বসে আছ।'

'ইচ্ছে কি হয়নি ? কিন্তু ভয় হল তুমি এসে যদি বকো—ভিজি তাহলে ?' নিমেষ মধ্যে আঁচলটা গাছ-কোমর করিয়া বাঁধিয়া সে তৈয়ার হইয়া দাঁড়াইল।

ব্রতীন স্নিগ্ধহাস্যে তাহার পানে তাকাইল। তাহার মনে হইল তপতী যেন হঠাৎ বদলাইয়া গিয়াছে, তাহার এ-রূপ তো সে আগে কখনও দেখে নাই। তপতীর দেহের যৌবন যেমন বস্ত্রের শাসন লঙ্ঘন করিয়া সহজে ধরা দেয় না, তাহার মনের ছেলেমানুষিও বাহিরের সংযত গাম্ভীর্য দিয়া ঢাকা থাকে, সহসা চোখে পড়ে না। কিন্তু আজ যেন বাহিরের সমস্ত আবরণ ফেলিয়া দিয়া তাহার ভিতরের চপলা তরুণীটি কলহাস্যে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্রতীন বিবাহের এতদিন পরে তাহার একটা নূতন পরিচয় পাইল।

ভিজা পাঞ্জাবীটা খুলিয়া মেঝেয় ফেলিতেই ব্রতীনের নগ্ন উর্ধ্বাঙ্গের উপর তপতীর দৃষ্টি পড়িল। বিস্তৃত বক্ষ, বলিষ্ঠ দুই বাহু ; বুকের মাঝখান দিয়া বিরল রোমশতার একটি রেখা নামিয়াছে। তপতী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ক্ষণেক চাহিয়া রহিল। ব্রতীনকে নগ্নদেহে সে ইতিপূর্বে দেখে নাই।

এই সময় শীকরসিক্ত বাতাসের একটা ঝাপটা আসিয়া তপতীর গায়ে লাগিল ; তাহার বুকে গলায় রোমাঞ্চ-সঞ্চার করিয়া সারা দেহে শিহরণ জাগাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। এই অনাহূত হর্ষের লজ্জা চাপিবার জন্যই যেন সে ব্রতীনের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, 'চল, তোমাকেও ছাড়ব না—দুজনে মিলে ভিজব—'

দুজনে উঠানে গিয়া ভিজিল। তার পর মাঠে গিয়া বৃষ্টির মধ্যে ছুটাছুটি করিল। তপতী একবার পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া কাদায় মাখামাখি হইল ; ঝড়ের গর্জনের সঙ্গে তাহাদের মিলিত হাস্যরব মিশিল। সন্ধ্যার নিস্তেজ আলোতে ঘন ধারাবর্ষণের কুজ্ঝটিকার মধ্যে তাহাদের এই উচ্ছ্বসিত ঋতু-সংবর্ধনা কেহ লক্ষ্য করিল না।

অবশেষে ভিজিবার সাধ আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসিল।

বারান্দায় দুজনে হাসিমুখে দুজনের দিকে ফিরিল।

'কেমন, মন ভরেছে এবার—?' সকৌতুকে পরিহাস করিতে গিয়া ব্রতীনের গলায় কথাটা আট্‌কাইয়া গেল, যেন কে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। বৃষ্টির মধ্যে হুড়াহুড়ি করিবার সময় সে এমন করিয়া তপতীর সিক্তবাস-দেহটি লক্ষ্য করে নাই,—এ যেন ভরা-পুকুরে প্রায়-ডুবিয়া-যাওয়া একটি কুমুদ ফুল ফুটিয়াছে ; নারীত্বের গৌরবে তাহার যৌবন-শ্রী যেন উদ্ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রতীন ক্ষণেক নিশ্বাস রোধ করিয়া রহিল, তার পর চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বলিল,—'যাও, আর দেরি কোরো না, ভিজে কাপড় ছেড়ে ফেল।' বলিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল।

রাত্রি হইয়াছে। বায়ুর বেগ ও মেঘের গর্জন অনেকটা শান্ত হইয়াছে বটে কিন্তু বৃষ্টিধারা তেমনি অবিশ্রাম ঝরিয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে অল্প বিদ্যুৎ চমকিতেছে—যেন পরিতৃপ্ত মুখের হাসি।

তপতীর শয়নঘরে খোলা জানালার সম্মুখে ব্রতীন ও তপতী পাশাপাশি দাঁড়াইয়া ছিল। ঘরের কোণে রেড়ির তেলের প্রদীপ—ঘরটি ছায়াময় স্বপ্ন-কুহকপূর্ণ। একপাশে তপতীর সঙ্কীর্ণ শুভ্র শয্যা অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

জানালার বাহিরে বৃষ্টির-রোমাঞ্চবিদ্ধ অন্ধকার। মাথার উপর তালগাছটা গদ্‌গদকণ্ঠে অর্থহীন কথা বলিতেছে। কিন্তু যথার্থ ই কি অর্থহীন কথা? কান পাতিয়া শুনিলে যেন তাহার অর্থ বোঝা যায়—আদর-সোহাগ-প্রীতি-মিশ্রিত রতিরসার্দ্র কলকূজন। ব্রতীন অনুভব করিল, মাটির তলায় অসংখ্য শুষ্ক বীজ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে—অঙ্কুরিত হইতেছে, তাহাদের কণ্ঠেও এই রসার্দ্র শীৎকার, গাঢ় গদ্‌গদভাষণ। ধরিত্রীর দেহ হইতে একটি সুমিষ্ট গন্ধ বাহির হইয়া আসিতেছে, যেন সম্ভুক্তা বধূর নিবিড় দেহ-সৌরভ।

তপতী শান্ত ভাবেই ব্রতীনের পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু তাহার মনের ভিতরটা কেমন যেন অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে পাশের দিকে তাকাইল,

আবছায়া-আলোতে ব্রতীনের মুখ ভালো দেখা গেল না। নিরুৎসুক কণ্ঠে তপতী জিজ্ঞাসা করিল,—'বলদ কেমন দেখলে ?'

'ভালো।' ব্রতীন তপতীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, একটু করুণ হাসিয়া বলিল,—'আজ কি খেতে ইচ্ছে করছে জানো ? মসুর ডালের খিচুড়ি আর ডিম ভাজা।'

'আমারও !' প্রবল উচ্ছ্বাসের সহিত কথাটা তপতীর মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল। তার পর দুজনেই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। কিন্তু হাসির পিছনে অনেকখানি ব্যর্থতা ছিল। দুজনেই জানে মসুর ডাল এবং ডিম নিষিদ্ধ খাদ্য—গুরুর নিষেধ।

তপতীর চোখ ছলছল করিয়া উঠিল—সে ব্রতীনের একটু কাছে সরিয়া আসিয়া তাহার হাতের উপর হাত রাখিল। ব্রতীন চমকিয়া উঠিল। তপতীর হাতের স্পর্শ তপ্ত—তাহার যেন জ্বর হইয়াছে।—

ব্রতীন ধীরে ধীরে নিজের হাত সরাইয়া লইল, তার পর জানালার দিকে ফিরিয়া বাহিরের মসীলিপ্ত দুরবগাহ রহস্যের পানে চক্ষু মেলিয়া রহিল।

আজ বর্ষাগমের সঙ্গে সঙ্গে ব্রতীনের রক্তে ছন্দের একটা দোলা লাগিয়াছিল। এই ছন্দ মৃদঙ্গের মত তাহার মাথার মধ্যে বাজিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মন্থর লয়ে আরম্ভ হইয়া ক্রমে তাহার গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া এখন এমন এক স্থানে পৌঁছিয়াছিল যেখানে সব সঙ্গীত পরিণতির চরম সমে গিয়া পরিসমাপ্তি লাভ করে, অন্তঃপ্রকৃতির হর্ষাবেগ বহিঃপ্রকৃতির সহিত ওতপ্রোত একাকার হইয়া যায়। ব্রতীনের স্নায়ুশিরার এই পরমোৎকণ্ঠা দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছিল।

ঘরের কোণে প্রদীপের সোনালি শিখাটি অল্প অল্প নড়িতেছে, যেন একটি স্নিগ্ধ অথচ সতর্ক চক্ষু ব্রতীন ও তপতীর উপর দৃষ্টি রাখিয়াছে। ব্রতীনের নাভি হইতে একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, সে তপতীর দিকে

ফিরিল। তপতীর একটা হাত জানালার উপর রাখা ছিল, ব্রতীন তাহার উপর হাত রাখিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, 'তপতী!'

এবার তপতী হাত টানিয়া লইল। উচ্চকিত জিজ্ঞাসায় ব্রতীনের মুখের পানে চোখ তুলিয়া তপতীর সারা দেহ যেন ঝাঁকানি দিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ব্রতীনের মুখের দর্পণে তপতীর মনের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। তপতীর বুকের ভিতরটা অসহ্য স্পন্দনে ধড়্‌ফড়্‌ করিতে লাগিল, সে দু'হাতে বুক চাপিয়া ধরিল।

ব্রতীন আরও কাছে সরিয়া আসিয়া ডাকিল, 'তপতী!'

ব্যাকুলভাবে মাথা নাড়িয়া তপতী বলিয়া উঠিল, 'না-না! একটা কথা তোমায় বলা হয়নি। আজ গুরুদেবের চিঠি এসেছে।'

পাথরের মূর্তির মত ব্রতীন দাঁড়াইয়া রহিল। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল সে নিজেই জানে না। তার পর মনের অতল হইতে উঠিয়া আসিয়া সে দেখিল জানালার উপর মুখ রাখিয়া তপতী নিঃশব্দে স্থির হইয়া আছে।

নীরস কণ্ঠে ব্রতীন বলিল, 'আজ রাত্রে কিছু খাব না—ক্ষিদে নেই।' বলিয়া নিজের শয়নঘরে গিয়া মাঝের দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

মধ্যরাত্রি। বর্ষণের ধারা এখনও থামে নাই—কিন্তু তাহার সুর বদলাইয়া গিয়াছে। ক্লান্ত দেহে বিস্রস্ত কুন্তলে সে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে, মাটিতে মাথা কুটিতেছে—

পাশাপাশি দুই অন্ধকার ঘরে দুইটি স্ত্রী-পুরুষ ঊর্ধ্বমুখ হইয়া শুইয়া আছে—তাহাদের অপলক চক্ষু অন্ধকারের রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছে না। তাহাদের জীবনে ইহা পরম সিদ্ধি অথবা চরম ব্যর্থতা—তাহা কে বলিবে?

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বাংলা-সাহিত্যে যে সব নবাগত কথাশিল্পীরা প্রবেশ করেছেন তাঁদের মধ্যে নরেন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কুটিল মনস্তত্ত্বের কুটিল গতি-প্রকৃতিই হচ্ছে তাঁর রচনার প্রধান উপজীব্য। শৌখিন বস্তিবিলাসী দরদী ইনি নন—অর্থাৎ এঁর সহানুভূতি বিশেষ-একটি সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইনি দেখেছেন বিস্তর—এবং সে দেখাকে কাজে লাগাতেও জানেন। পূর্বপাকিস্থানের ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু কর্মস্থল এঁর কলকাতাতেই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত একটি ব্যাঙ্কে কাজ করছিলেন—সম্প্রতি এক বিখ্যাত সাময়িক পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। 'উল্টো রথ', 'দ্বীপপুঞ্জ', 'হলদে বাড়ি', 'দূরভাষিণী', 'অসমতল' প্রভৃতি বই এঁর বিখ্যাত।

রস

কার্তিকের মাঝামাঝি চৌধুরীদের খেজুর বাগান ঝুরতে শুরু করল মোতালেফ, তার পর দিন পনের যেতে না যেতেই নিকা করে নিয়ে এল পাশের বাড়ির রাজেক মৃধার বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে। পাড়াপড়শী সবাই তো অবাক। এই অবশ্য প্রথম সংসার নয় মোতালেফের। এর আগের বউ বছর খানেক আগে মারা গেছে। তবু পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের জোয়ান পুরুষ মোতালেফ আর মাজুখাতুন ত্রিশে না পৌঁছলেও তার কাছাকাছি গেছে। ছেলেপুলের ঝামেলা অবশ্য মাজুখাতুনের নেই। মেয়ে ছিল একটি, কাঠিখালির শেখেদের ঘরে বিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ঝামেলা যেমন নেই, তেমনি মাজুখাতুনের আছেই বা কি। বাক্স সিন্দুক ভরে যেন কত সোনাদানা রেখে গেছে রাজেক মৃধা, মাঠ ভরে যেন কত ক্ষেত খামার রেখে গেছে যে তার ওয়ারিশি পাবে

মাজুখাতুন। ভাগের ভাগ ভিটার পেয়েছে কাঠা খানেক, আর আছে একখানি পড়োপড়ো শণের কুঁড়ে। এই তো বিষয়-সম্পত্তি, তার পর দেখতেই বা এমন কি একখানা ডানাকাটা হুরীর মত চেহারা। দজ্জাল মেয়েমানুষের আঁট-সাঁট শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কি আছে মাজুখাতুনের যা দেখে ভোলে পুরুষেরা, মন তাদের মুগ্ধ হয়।

সিকদার-বাড়ির, কাজী-বাড়ির বউঝিরা হাসাহাসি করল, 'তুক করছে মাগী, ধূলা-পড়া দিছে চোখে।'

মুন্সীদের ছোটবউ সাকিনা বলল, 'দিছে ভালো করছে। দিবে না? অমন মানুষের চোখে ধূলাপড়া দেওনেরই কাম। খোদা তো পাতা দেয় নাই চোখে। দেখছো তো কেমন ট্যারাইয়া ট্যারাইয়া চায়। ধূলা ছিটাইয়া থাকে তো বেশ করছে।'

কথাটা মিথ্যা নয়, চাউনিটা একটু তেরছা তেরছাই মোতালেফের। বেছে বেছে সুন্দর মুখের দিকে তাকায়, সুন্দর মুখের খোঁজ করে ঘোরে তার চোখ। অল্পবয়সী খাপসুরৎ চেহারার একটি বউ আনবে ঘরে, এতদিন ধরে সেই চেষ্টাই সে করে এসেছে। কিন্তু দরে পটেনি কারো সঙ্গে। যারই ঘরে একটু ডাগর গোছের সুন্দর মেয়ে আছে সে-ই হেঁকে বসেছে পাঁচকুড়ি সাতকুড়ি। সবচেয়ে পছন্দ হয়েছিল মোতালেফের ফুলবানুকে। চরকান্দার এলেম শেখের মেয়ে ফুলবানু। আঠার উনিশ বছর হবে বয়স। রসে টলটল করছে সর্বাঙ্গ, টগমগ করছে মন। ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুরে এসেছে ফুলবানু। খেতে পরতে কষ্ট দেয়, মারধোর করে, এইসব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইডুবির গফুর সিকদারের কাছ থেকে। আসলে বয়স বেশি আর চেহারা সুন্দর নয় বলে গফুরকে পছন্দ হয়নি ফুলবানুর। সেই জন্যই ইচ্ছা করে নিজে ঝগড়া

কোন্দল বাধিয়েছে তার সঙ্গে। কিন্তু একহাত ঘুরে এসেছে বলে কিছু ক্ষয় যায়নি ফুলবানুর, বরং চেকনাই আর জেল্লা খুলেছে দেহের, রসের ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনের মধ্যে। চরকান্দায় নদীর ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মোতালেফ। একনজরেই বুঝেছিল যে, সেও নজরে পড়েছে। চেহারাখানা তো বেমানান নয় মোতালেফের। নীল লুঙ্গি পরলে ফর্সা ছিপছিপে চেহারায় চমৎকার খোলতাই হয় তার, তাছাড়া অমন ঢেউখেলানো টেরিকাটা বাবড়িই বা এ তল্লাটে ক'জনের মাথায় আছে। ফুলবানুর সুনজরের কথা বুঝতে বাকি ছিল না মোতালেফের। খুঁজে খুঁজে গিয়েছিল সে এলেম শেখের বাড়িতে। কিন্তু এলেম তাকে আমল দেয়নি। বলেছে গতবার যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে তার। এবার আর না দেখে না শুনে যার তার হাতে মেয়ে দেবে না। আসলে টাকা চায় এলেম। গাঁটের কড়ি যা খরচ করতে হয়েছে মেয়েকে তালাক নেওয়াতে গিয়ে, সুদে আসলে তা পুরিয়ে নিতে চায়। গুনাগার চায় সেই লোকসানের। আঁচ নিয়ে দেখেছে মোতালেফ সে গুনাগার দু'এক কুড়ি নয়, পাঁচকুড়ি একেবারে। তার কমে কিছুতেই রাজি হবে না এলেম। কিন্তু অত টাকা সে দেবে কোত্থেকে।

মুখ ভার করে চলে আসছিল মোতালেফ। আশ্ শেওড়া আর চোখ-উদানের আগাছার জঙলা ভিটার মধ্যে ফের দেখা হোল ফুলবানুর সঙ্গে। কলসী কাঁখে জল নিতে চলেছে ঘাটে। মোতালেফ বুঝল সময় বুঝেই দরকার পড়েছে তার জলের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিক করে একটু হাসল ফুলবানু, কি মেঞা, গোসা কইরা ফিরা চললা নাকি ?'

'চলব না ? শোনলা নি টাকার খাককাই তোমার বা-জানের !'

ফুলবানু বলল, 'হ, হ, শুনছি। চাইছে তো দোষ হইছে কি ? পছন্দসই জিনিস নেবা, বা-জানের গুনা, তার দাম দেবা না ?'

মোতালেফ বলল, 'ও খাককাইটা আসলে বা-জানের না, বা-জানের মাইয়ার। হাটে বাজারে গেলেই পারো ধামায় উইঠা।'

মোতালেফের রাগ দেখে হাসল ফুলবানু, 'কেবল ধামায় ক্যান্, পালায় উইঠা বসব। মুঠ ভইরা ভইরা সোনা জহরৎ ওজন কইরা দেবা পালায়। বোঝব ক্ষেমতা, বোঝব কেমন পুরুষ মাই'যের মুঠ।' মোতালেফ হন হন করে চলে যাচ্ছিল, ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মিঞা, রাগ করলানি? শোন শোন।'

মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি শোনব?'

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আরো একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন, বা-জানের মাইয়া টাকা চায় না, সোনাদানাও চায় না, কেবল মনে রাখতে চায় মনের মাইন্‌ষেরে। মাইন্‌ষের ত্যাজ দেখতে চায়, বোঝ্‌ছ?'

মোতালেফ ঘাড় নেড়ে জানাল, বুঝেছে।

ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা আকাম কুকাম কইরো না মেঞা, জমি ক্ষেত বেচতে যাইও না।'

বেচবার মত জমি ক্ষেত অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুল-বানুর কাছে ভাঙল না মোতালেফ, বলল, 'আইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানের সবুর থাকবেনি দেখবার?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।'

গাঁয়ে এসে আর একবার ধারের চেষ্টা করে দেখল মোতালেফ। গেল

মল্লিকবাড়ি, মুখুজ্যেবাড়ি, সিকদারবাড়ি, মুন্সীবাড়ি—কিন্তু কোথাও সুরাহা হয়ে উঠল না টাকার। নিলে তো আর সহজে হাত উপুড় করবার অভ্যাস নেই মোতালেফের। ধারের টাকা তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে বেজায় ঝামেলা। সাধ করে কে পোয়াতে যাবে সেই ঝক্কি।

কিন্তু নগদ টাকা ধার না পেলেও শীতের সূচনাতেই পাড়ার চারপাঁচ কুড়ি খেজুর গাছের বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ। গত বছর থেকেই গাছের সংখ্যা বাড়ছিল, এবার চৌধুরীদের বাগানের দেড়কুড়ি গাছ বেশি হোল। গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তার। মেহনৎ কম নয়, এক একটি করে এতগুলি গাছের শুকনো মরা ডালগুলি বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকাচায় ধার তুলে তুলে জুৎসই করে নিতে হবে ছ্যান। তার পর সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুঁততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই করে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবে তো রাত ভরে টুপ টুপ করে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক খেজমৎ। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এ তো আর মার দুধ নয়, গাইয়ের দুধ নয় যে বোঁটার বানে মুখ দিলেই হোল।

অবশ্য কেবল খাটতে জানলেই হয় না, গাছে উঠতে-নামতে জানলেই হয় না, গুণ থাকা চাই হাতের। যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁওয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে। এ তো আর ধান কাটা নয়, পাট কাটা নয় যে, কাচির পোঁচে গাছের গোড়াসুদ্ধ কেটে নিলেই হোল। এর নাম খেজুর গাছ কাটা। কাটতেও হবে, আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা না পায়, যেন কোন ক্ষতি না হয়

গাছের। একটু এদিক ওদিক হলে বছর ঘুরতে না ঘুরতে গাছের দফা রফা হয়ে যাবে। মরা মুখ দেখতে হবে গাছের। সে গাছের গুঁড়িতে ঘাটের পৈঠা হবে ঘরের পৈঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায় ফোঁটায় সে গাছ থেকে হাঁড়ির মধ্যে রস ঝরবে না রাত ভরে।

খেজুর গাছ থেকে রস নামাবার বিদ্যা মোতালেফকে নিজের হাতে শিখিয়েছিল রাজেক মৃধা। রস সম্বন্ধে এ-সব তত্ত্বকথা আর বিধি-নিষেধও তার মুখের। রাজেকের মত অমন নামডাকওয়ালা 'গাছি' ধারে-কাছে ছিল না। যে গাছের প্রায় বারো আনা ডালই শুকিয়ে এসেছে সে গাছ থেকেও রস বেরুত রাজেকের হাতের ছোঁওয়ায়। অন্য কেউ গাছ কাটলে যে গাছে রস পড়ত আধ-হাঁড়ি, রাজেকের হাতে পড়লে সে রস গলা-হাঁড়িতে উঠত। তার হাতে খেজুর গাছ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকত গৃহস্থেরা। গাছের কোন ক্ষতি হোত না, রসও পড়ত হাঁড়ি ভরে। বছর কয়েক ধরে রাজেকের সাকরেদ হয়েছিল মোতালেফ। পিছনে পিছনে ঘুরত, কাজ করত সঙ্গে সঙ্গে। সাকরেদ দু' চারজন আরো ছিল রাজেকের—সিকদারদের মকবুল, কাজীদের ইসমাইল। কিন্তু মোতালেফের মত হাত পাকেনি কারো। রাজেকের স্থান আর কেউ নিতে পারেনি তার মত।

কিন্তু কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না কুড়িতে কুড়িতে, রসের হাঁড়ি বয়ে আনলেই তো হবে না বাঁশের বাখারির ভারায় ঝুলিয়ে, রস জ্বাল দিয়ে গুড় করবার মত মানুষ চাই। পুরুষ মানুষ গাছ থেকে কেবল রসই পেড়ে আনতে পারে,—কিন্তু উনান কেটে, জ্বালানি জোগাড় করে, সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে সেই তরল রস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালিগুড়ে পরিণত করবার ভার মেয়েমানুষের ওপর। শুধু কাঁচা রস দিয়ে তো লাভ নেই, রস থেকে গুড় আর গুড় থেকে পয়সায় কাঁচা রস যখন পাকা রূপ নেবে তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সমস্ত খেজমৎ মেহনৎ। কিন্তু বছর দুই ধরে

বাড়িতে সেই মানুষ নেই মোতালেফের। ছেলেবেলায় মা মরেছিল। দু'বছর আগে বউ মরে ঘর একেবারে খালি করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যার পর মোতালেফ এসে দাঁড়াল মাজুখাতুনের ঝাপ-আঁটা ঘরের সামনে, 'জাগনো আছো নাকি মাজুবিবি ?' ঘরের ভিতর থেকে মাজুখাতুন সাড়া দিয়ে বলল, 'কেডা ?' 'আমি মোতালেফ। শুইয়া পড়ছ বুঝি ? কষ্ট কইরা উইঠা একবার ঝাপটা যদি খুইলা দিতা, কয়ডা কথা কইতাম তোমার সাথে।'

মাজুখাতুন উঠে ঝাপ খুলে দিয়ে বলল, 'কথা যে কি কবা তা তো জানি। রসের কাল আইছে আর মনে পইড়া গেছে মাজুখাতুনরে। রস জ্বাল দিয়া দিতে হবে। কিন্তু চাইর আনা কইরা পয়সা দেবা মেঞা। তার কমে পারব না। গতরে সুখ নাই এ বছর।'

মোতালেফ মিষ্টি করে বলল, 'গতরের আর দোষ কি বিবি। গতর তো মনের হাত ধইরা ধইরা চলে। মনের সুখই গতরের সুখ।'

মাজুখাতুন বলল, 'তা যাই কও তাই কও মেঞা, চাইর আনার কমে পারব না এবার।'

মোতালেফ এবার মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'চাইর আনা ক্যান্ বিবি, যদি ষোল আনা দিতে চাই, রাজী হবা তো নিতে ?'

মোতালেফের হাসির ভঙ্গিতে মাজুখাতুনের বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করে উঠল, কিন্তু মুখে বলল, 'তোমার রঙ্গ তামাসা থুইয়া দাও মেঞা। কাজের কথা কবা তো কও, নইলে যাই, শুই গিয়া।'

মোতালেফ বলল, 'শোবাই তো। রাইত তো শুইয়া ঘুমাবার জন্যেই। কিন্তু শুইলেই কি আর চৌখে ঘুম আসে মাজুবিবি, না চাইয়া চাইয়া এই শীতের লম্বা রাইত কাটান যায় ?'

ইসারা ইঙ্গিত রেখে এর পর মোতালেফ আরো স্পষ্ট করে খুলে বলল মনের কথা। কোন রকম অন্যায় সুবিধা সুযোগ নিতে চায় না সে। মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে সে নিকা করে নিয়ে যেতে চায় মাজুখাতুনকে। ঘর গেরস্থালির যোল আনা ভার তুলে দিতে চায় তার হাতে।

প্রস্তাব শুনে মাজুখাতুন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তার পর একটু ধমকের সুরে বলল, 'রঙ্গ তামাসার আর মানুষ পাইলা না তুমি! ক্যান্, কাচা বয়সের মাইয়া পোলার কি অভাব হইছে নাকি দেশে যে তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমার দুয়ারে?'

মোতালেফ বলল, 'অভাব হবে ক্যান্ মাজুবিবি। কম বয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওন যায়। কিন্তু শত হইলেও, তারা কাচা রসের হাড়ি।'

কথার ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ করল মাজুখাতুন, বলল, 'সাঁচাই নাকি! আর আমি?'

'তোমার কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশার কালে তাড়ি আর নাস্তার কালে গুড়, তোমার সাথে তাগো তুলনা?'

তখনকার মত মোতালেফকে বিদায় দিলেও তার কথাগুলি মাজুখাতুনের মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না, অন্ধকার নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফের কথাগুলি মনের ভিতরটা কেবলই তোলপাড় করতে লাগল। মোতালেফের সঙ্গে পচিরয় অল্প দিনের নয়। রাজেক যখন বেঁচে ছিল, তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে যখন কাজকর্ম করত মোতালেফ, তখন থেকেই এ বাড়িতে তার আনাগোনা, তখন থেকেই জানাশোনা দুজনের। কিন্তু সেই জানাশোনার মধ্যে কোন গভীরতা ছিল না। মাঝে মাঝে একটু হালকা ঠাট্টা তামাসা চলত, কিন্তু তার বেশি এগুবার কথা মনেই পড়েনি কারো। মোতালেফের ঘরে ছিল বউ, মাজুখাতুনের ঘরে ছিল স্বামী। স্বভাবটা একটু কঠিন আর কাঠখোট্টা ধরনেরই ছিল রাজেকের। ভারি কড়া-কড়া চাঁছা-ছোলা ছিল তার কথাবার্তা। শীতের

সময় কুড়িতে কুড়িতে রসের হাঁড়ি আনত মাজুখাতুনের উঠানে আর মাজু-খাতুন সেই রস জ্বাল দিয়ে তৈরি করত পাটালি গুড়। হাতের গুণ ছিল মাজুখাতুনের। তার তৈরি গুড়ের সের দুপয়সা বেশি দরে বিক্রি হোত বাজারে। রাজেক মরে যাওয়ার পর পাড়ার বেশির ভাগ খেজুর গাছই গেছে মোতালেফের হাতে। দু' এক হাঁড়ি রস কোন বার ভদ্রতা করে তাকে খেতে দেয় মোতালেফ কিন্তু আগেকার মত হাঁড়িতে আর ভরে যায় না তার উঠান। গতবার মাসখানেক তাকে রস জ্বাল দিতে দিয়েছিল মোতালেফ, চুক্তি ছিল দু'আনা করে পয়সা দেবে প্রতি সেরে, কিন্তু মাসখানেক পরেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেফের মাজুখাতুন গুড় চুরি করে রাখছে, অন্য কাউকে দিয়ে গোপনে গোপনে বিক্রি করাচ্ছে সেই গুড়, ষোল আনা জিনিস পাচ্ছে না মোতালেফ। ফলে কথান্তর মনান্তর হয়ে সে বন্দোবস্ত ভেস্তে গিয়েছিল। কিন্তু এবার তার ঘরে রসের হাঁড়ি পাঠাবার প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেফ, মাজুখাতুনকেই নিজের ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাড়ার আধ-বুড়োদের দলের আরো করেছে দু'একজন কিন্তু মাজুখাতুন কান দেয়নি তাদের কথায়। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে যারা একটু বেশি বাড়াবাড়ি রকমের ইয়ার্কি দিতে এসেছে তাদের কান কেটে নেওয়ার ভয় দেখিয়েছে মাজুখাতুন। কিন্তু মোতালেফের প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাকে যেন তেমন ভাবে তাড়ানো যায় না। তাকে তাড়ালেও তার কথাগুলি ফিরে ফিরে আসতে থাকে মনের মধ্যে। পাড়ায় এমন চমৎকার কথা বলতে পারে না আর কেউ, অমন খাপসুরৎ মুখও কারো নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কারো মুখে।

মোতালেফকে আরো আসতে হোল দু'এক সন্ধ্যা, তারপর নীল রঙের জোলাকী শাড়ি প'রে, রঙ-বেরঙের কাঁচের চুড়ি হাতে নিয়ে মোতালেফের পিছনে পিছনে তার ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো মাজুখাতুন।

ঘরদোরের কোন শ্রী ছাঁদ নেই। ভারি অপরিষ্কার আর আগোছালো হয়ে

রয়েছে সব। কোমরে অাঁচল জড়িয়ে মাজুখাতুন লেগে গেল ঘরকন্নার কাজে। ঝাঁট দিয়ে দিয়ে জঞ্জাল দূর করল উঠানের, লেপেপুঁছে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে করে তুলল ঘরের মেঝে।

কিন্তু ঘর আর ঘরনীর দিকে তাকাবার সময় নেই মোতালেফের। সে আছে গাছে গাছে। পাড়ার আরো অনেকের—বোসেদের, বাঁড়ুজ্যেদের গাছের বন্দোবস্ত নিয়েছে মোতালেফ। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে, ভাগ করে দিচ্ছে রস। পাকাটির একখানা চালা তুলে দিয়েছে মাজুবান্থকে মোতালেফ উঠানের পশ্চিম দিকে। সারে সারে উনান কেটে তার ওপর বড় বড় মাটির জালা বসিয়ে সেই চালাঘরের মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রস জ্বাল দেয় মাজুবান্থ। জ্বালানির জন্যে মাঠ থেকে খড়ের নাড়া নিয়ে আসে মোতালেফ, জোগাড় করে আনে খেজুরের শুকনো ডাল। কিন্তু তাতে কি কুলোয়। মাজুবান্থ এর ওর বাগান থেকে জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে আনে ঝাঁকা ভরে ভরে, পলো ভরে ভরে। বিকেলে বসে বসে দা দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে শুকনো ডাল কাটে জ্বালানির জন্যে। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, খাটুনি গায়ে লাগে না, অনেকদিন পর মনের মত কাজ পেয়েছে মাজুবান্থ, মনের মত মান্থষ পেয়েছে ঘরে।

ধামা ভরে ভরে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোতালেফ, বিক্রি করে আসে চড়া দামে। বাজারের মধ্যে সেরা গুড় তার। পড়ন্ত বেলায় ফের যায় গাছে গাছে হাঁড়ি পাততে। তল্লা বাঁশের একেকটি করে চোঙা ঝুলতে থাকে গাছে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঝরার চোঙা বেঁধে দিয়ে যায় মোতালেফ। সারা দিনের ময়লা রস চোঙাগুলির মধ্যে জমে থাকে। চোঙা বদ্‌লে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতে বিকেলে এসে। চোঙার ময়লা রস ফেলা যায় না। জ্বাল দিয়ে চিটে গুড় হয় তাতে তামাক মাখবার। বাজারে তাও বিক্রি হয় পাঁচ আনা ছ' আনা সের। দু'বেলা দু'বার করে এতগুলি গাছে

উঠতে নামতে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে মোতালেফের, পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝরে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সকাল বেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিক চিক করে। পায়ের নীচে দূর্বার মধ্যে চিক চিক করে রাত্রির জমা শিশির। মোতালেফের দিকে তাকিয়ে পাড়াপড়শীরা অবাক হয়ে যায়। চিরকালই অবশ্য খাটিয়ে মানুষ মোতালেফ কিন্তু এত বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে, দিনরাত এমন কলের মত পরিশ্রম করতে এর আগে তাকে দেখা যায়নি কোনদিন। ব্যাপারটা কি? গাছ কাটা অবশ্য মনের মত কাজই মোতালেফের, কিন্তু পছন্দসই মনের মানুষ কি সত্যিই এল ঘরে?

সেরা গাছের সবচেয়ে মিষ্টি দু' হাঁড়ি রস আর সের তিনেক পাটালি গুড় নিয়ে মোতালেফ গিয়ে একদিন উপস্থিত হোল চরকান্দায় এলেম শেখের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এলেমের পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল রসের হাঁড়ি, গুড়ের সাজি, তার পর কোঁচার খুঁটের বাঁধন খুলে বের করল পাঁচখানা দশ টাকার নোট, বলল, 'আর্ধেক আগাম দিলাম মেঞাসাব।'

এলেম বলল, 'আগাম কিসের?'

মোতালেফ বলল, 'আপনার মাইয়ার—'

তাজা কড়কড়ে নোট বেছে বেছে নিয়ে এসেছে মোতালেফ। কোণায়, কিনারে চুল পরিমাণ ছিঁড়ে যায়নি কোথাও, কোন জায়গায় ছাপ লাগেনি ময়লা হাতের। নগদ পঞ্চাশ টাকা। নোটগুলির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে এলেম বলল, 'কিন্তু এখন আর টাকা আগাম নিয়া আমি কি করব মেঞা? তুমি তো শোনলাম নিকা কইরা নিছ রাজেক মেরধার কবিলারে। সতীনের ঘরে যাবে ক্যান্ আমার মাইয়া। যাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করব, মারামারি কাটাকাটি কইরা মরবে দিন রাইত।'

মোতালেফ মুচকে হাসল, বলল, 'তার জৈন্যে ভাবেন ক্যান্ মেঞাসাব। গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজুখাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ্ হইয়া যাবে উইড়া।'

এলেম শেখ জলচৌকি এগিয়ে দিল মোতালেফকে বসতে, হাতের হুঁকোটা এগিয়ে ধরল মোতালেফের দিকে, তারিফ করে বলল, 'মগজের মধ্যে তোমার সাঁচাই জিনিস আছে মেঞা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইয়া, কাম কইরা।'

ফুলবানুকেও একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোতালেফ। আড়াল থেকে দেখতে শুনতে ফুলবানুর কিছু বাকি ছিল না। তবু মোতালেফকে দেখে ঠোঁট ফুলালো ফুলবানু, 'বেসবুর কেডা হইল মেঞা? এদিকে আমি রইলাম পথ চাইয়া আর তুমি ঘরে নিয়া ঢুকাইলা আর একজনারে।' মোতালেফ জবাব দিল, 'না ঢুকায়ে করি কি।' মানের দায়ে জানের দায়ে বাধ্য হয়ে তাকে এই ফন্দি খুঁজতে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে পানি-চুনি দেয় কে, প্রাণ বাঁচে কি করে। ঘরে কেউ না থাকলে রস জাল দিয়ে গুড় তৈরি করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি করে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কি করে।

ফুলবানু বলল, 'বোঝলাম, মানও বাচাইলা, জানও বাচাইলা, কিন্তু গায়ে যে আর একজনের গন্ধ জড়াইয়া রইল তা ছাড়বা কেমনে?'

মনে এলেও মুখ ফুটে এ কথাটা বলল না মোতালেফ যে, মানুষ চলে গেলে তার গন্ধ সত্যিই আর-একজনের গায়ে জড়িয়ে থাকে না, তা যদি থাকত তা'হলে সে গন্ধ তো ফুলবানুর গা থেকেও বেরুতে পারত। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোতালেফ ঘুরিয়ে জবাব দিল, বলল, 'গন্ধের জন্যে ভাবনা কি ফুলবিবি। সোডা সাবান কিনা দেব বাজার গুনা। ঘাটের পৈঠায় পা

ঝুলাইয়া বসব তোমারে লইয়া। গতর গুনা ঘইসা ঘইসা বদ্ গন্ধ উঠাইয়া ফেইলো।'

মুখে আঁচল চাপতে চাপতে ফুলবানু বলল, 'সাঁচাই নাকি ?' মোতালেফ বলল, 'সাঁচা না কি মিছা ? শুইঙ্গা দেইখো তখন নতুন মাইন্ষের নতুন গন্ধে ভুর ভুর করবে গতর। দক্ষিণা বাতাসে চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে ভুর ভুর করবে, কেবল সবুর কইরা থাক আর দুইখান মাস।'

ফুলবানু আর একবার ভরসা দিয়ে বলল, 'বেসবুর মানুষ ভাইবো না আমারে।'

যে কথা সেই কাজ মোতালেফের, দু'মাসের বেশি সবুর করতে হোল না ফুলবানুকে। গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকার জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়াপড়শীকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাজুবিবির স্বভাব-চরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার ভারি আপত্তিকর।

মাজুখাতুন জিভ কেটে বলল, 'আউ আউ, ছি ছি! তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছল-চাতুরী তোমার মনে ? গুড়ের সময় পিপড়ার মত লাইগা ছিলা, আর গুড় যেই ফুরাইল অমনিই দূর্ দূর্ !'

কিন্তু অত কথা শোনবার সময়ই নেই মোতালেফের ; ধৈর্যও নেই।

আমের গাছ বোলে ভরে উঠল, গাবগাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুনপাতা। শীতের পরে এল বসন্ত, মাজুখাতুনের পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিশ্বাসে। পাড়াপড়শী বলল, 'এবার মানাইছে, এবার সাঁচাই বাহার খোলছে ঘরের।'

ফুর্তির অন্ত নেই মোতালেফের মনে। দিনভর কিষাণ কামলা খাটে। তার পর সন্ধ্যা হতে না হতেই এসে আঁচল ধরে ফুলবানুর, 'থুইয়া দাও তোমার রান্ধন-বাড়ন ঘর-গেরস্থালি। কাছে বস আইসা।'

ফুলবানু হাসে, 'সবুর, সবুর! এ কয়মাস কাটাইলা কি কইরা মেঞা?'

মোতালেফ জবাব দেয়, 'কাটাইলাম খাজুর গাছ লইয়া।'

নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফুলবানুর, একটু নিশ্বাস নিয়ে হেসে বলে, 'তুমি আবার সেই গাছের কাছেই ফিরা যাও। 'গাছি'র আদর গাছেই সইতে পারে।'

মোতালেফ বলে, 'কিন্তু 'গাছি'র কাছেও যে গাছের রস দুই-চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমার রসই বছরে বার মাস চোঁয়াইয়া চোঁয়াইয়া পড়ে।'

মাজুখাতুন ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়োপড়ো শণের কুঁড়েয়। ভেবেছিল আগের মতই দিন কাটবে। কিন্তু দিন যদিবা কাটে, রাত কাটে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। পাড়াপড়শীরা এসে সাড়ম্বরে সালঙ্কারে মোতালেফ আর ফুলবানুর ঘরকন্নার বর্ণনা করে, একটু বা সকৌতুক তিরস্কারের স্বরে বলে, 'নাঃ, বউ বউ কইরা পাগল হইয়াই গেল মানুষটা। যেখানেই যায় বউ ছাড়া আর কথা নাই মুখে।'

বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে মাজুখাতুনের। মনে হয় সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।

দিন কয়েক পরে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদই নিয়ে এল সম্বন্ধ। বউটার দশা দেখে ভারি মায়া হয়েছে তার। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির।

মাসখানেক আগে কলেরায় তার বউ মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কম বয়সী ছুঁড়ী-টুরিতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন-আত্তি করবে না কিছু। তাই মাজুখাতুনের মত একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থঘরের বউই তার পছন্দ। তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে।

মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'বয়স কত হবে তার?'

ওয়াহেদ জবাব দিল, 'তা আমাগো বয়সীই হবে। পঞ্চাশ, একপঞ্চাশ।'

মাজুখাতুন খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল—হঁ্যা ওইরকমই তার চাই। কম বয়সে তার আস্থা নেই, বিশ্বাস নেই যৌবনকে।

তার পর মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'গাছি না তো সে? খাজুর গাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে?'

ওয়াহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'গাছ কাটতে যাবে ক্যান্! ওসব কাম কোন কালে জানে না সে। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে। ক্যান্ বউ, 'গাছি' ছাড়া, রসের ব্যাপারী ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সাথে?'

মাজুখাতুন ঠিক উল্টো জবাব দিল। রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালে খেজুর গাছের ধারে-কাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজুখাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজুখাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।

ওয়াহেদ বলল, 'তাহ'লে কথাবার্তা কই নাদিরের সাথে? সে বেশি দেরি করতে চায় না।'

মাজুখাতুন বলল, 'দেরি কইরা কাম কি।'

দেরি বেশি হোলও না, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে

গেল। নাদিরের সঙ্গে এক মাল্লাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাজুখাতুন। পার হয়ে গেল নদী।

মোতালেফ স্ত্রীকে বলল, 'আপদ গেল। পেত্নীর মত ফাঁৎ ফাঁৎ নিশ্বাস ফেলত, চৌখের ওপর শাপমন্যি করত দিন রাইত, তার হাতগুনা তো বাচলাম, কি কও ফুলজান ?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'পেত্নীরে খুব ডরাও বুঝি মেঞা ?'

মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর ডরাই না। পেত্নী তো ছুইটাই গেল। এখন চৌখ মেললেই তো পরী। এখন ডরাই পরীরে।'

'ক্যান্, পরীরে আবার ডর কিসের তোমার ?'

'ডর নাই ? পাখা মেইলা কখন্ উরাল দেয় তার ঠিক কি !'

ফুলবানু বলল, 'না মেঞা, পরীর আর উরাল দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দসই ঘর পাইয়া গেছে। এখন ঘরের মাইন্‌ষের পছন্দ আর নজরডা বরাবর এই রকম থাকলে হয়।'

মোতালেফ বলল, 'চৌখ যদ্দিন আছে, নজরও তদ্দিন থাকব।'

দিনরাত ভারি আদরে তোয়াজে রাখল মোতালেফ বউকে। কোন্ মাছ খেতে ভালোবাসে ফুলবানু হাটে যাওয়ার আগে শুনে যায়, ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে কারো কাছ থেকে পয়সা ধার করে কেনে সেই মাছ। ডিমটা, আনাজটা, তরকারীটা যখন যা পারে হাটবাজার থেকে নিয়ে আসে মোতালেফ। ফি হাটে আনে পান সুপারি খয়ের মসলা।

ফুলবানু বলে, 'অত পান আন ক্যান্, তুমি তো বেশি ভক্ত না পানের। দিন রাইত খালি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ তামাক টানো।'

মোতালেফ বলল, 'পান আনি তোমার জৈন্যে। দিন ভইরা পান খাবা, খাইয়া খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গাবা।'

ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, 'ক্যান্, আমার ঠোঁট অ্যামনে বুঝি রাঙ্গা না যে, পান খাইয়া রাঙ্গাইতে হবে? আমি পান সাইজা দেই, তুমিই বরং দিন রাইত খাওয়া ধর। তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙ্গাইয়া নেও।'

মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষ মাইন্ষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না, আর-একজনের পানখাওয়া-ঠোঁটের রস লাগে।'

নিজের ভুঁই ক্ষেত নেই মোতালেফের। মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চষে। কিন্তু ভালো কৃষাণ বলে তেমন খ্যাতি নেই, জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ অন্য সকলের মত নয়। সিকদারদের, মুন্সীদের জমিতে কিষাণ খাটে। পাট নিড়ায়, পাট কাটে, পাট জাগ দেয়, ধোয়, মেলে। ভারি খেজমৎ খাটুনি খাটে। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায় মোতালেফের। বর্গা জমির পাট খুব বেশি ওঠে না উঠানে। সিকদাররা, মুন্সীরা নগদ টাকা দেয়। কেবল মল্লিক আর মুখুজ্যেদের বিঘেচারেক ভুঁইয়ের ভাগের ভাগ অর্ধেক জাগ-দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায় মোতালেফ। পাট ছাড়াতে ভারি উৎসাহ ফুলবানুর। কিন্তু মোতালেফ সহজে তাকে পাটে হাত দিতে দেয় না, বলে, 'কষ্ট হবে, পচা গন্ধ হবে গায়।'

ফুলবানু বলে, 'হইল তো বইয়া গেল, রউদে পুইড়া তুমি কালা কালা হইয়া গেলা, আর আমি পাট নিতে পারব না, কষ্ট হবে! কেমনতরো কথাই যে কও তুমি মেঞা!'

নিজেদের পাট তো বেশি নয়, পাকাটি খুব বেশি পাওয়া যায় না।

ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ির জাগ-দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়। সেই ছাড়ানো পাটের পাটখড়িগুলি পাওয়া যাবে তাহ'লে। কিন্তু মোতালেফ রাজী নয় তাতে। অত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।

আশ্বিনের শেষের দিকে আউশ ধান পাকে। অন্যের নৌকায় পরের জমিতে কিষাণ খাটতে যায় মোতালেফ। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ধান কাটে। আঁটিতে আঁটিতে ধান তুলতে থাকে নৌকায়। কিন্তু মোমিন, করিম, হামিদ, আজিজ—এদের সঙ্গে সমানে সমানে কাচি চলে না তার। হাত বড় 'ধীরচ' মোতালেফের, জলে ভারি কাতর মোতালেফ। একেক দিন পিঠে বগলে জোঁক লেগে থাকে। ফুলবানু তুলে ফেলতে ফেলতে বলে, 'জোঁকটাও ছাড়াইতে পার না মেঞা, হাত তো ছিল সঙ্গে ?'

মোতালেফ বলে, 'ধান কাটার হাত দুইখান সাথেই ছিল, জোঁক ফেলাবার হাত থুইয়া গেছিলাম বাড়িতে।'

যেখানে যেখানে জোঁকে মুখ দিয়েছিল সে সব জায়গায় সযত্নে চুণ লাগিয়ে দেয় ফুলবানু। আরো পাঁচজন কৃষাণের সঙ্গে ধান মলন দেয় মোতালেফ, দেউনি পায় পাঁচভাগের একভাগ। ধামায় করে পৈকায় করে ধান নিয়ে আসে। ফুলবানু ধান রোদে দেয়, কুলোয় করে চিটা ঝেড়ে ফেলে ধান থেকে। মোতালেফ একেকবার বলে, 'ভারি কষ্ট হয় বউ, না ?'

ফুলবানু বলে, 'হ, কষ্টে একেবারে মইরা গেলাম না! কার নাগাল কথা কও তুমি মেঞা। গেরস্থ ঘরের মাইয়া না আমি, না সাঁচাই আশমান গুনা নাইমা আইছি!'

বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কার্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসের দিন মোতালেফের বতরের দিন। কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশি

পেরিয়ে এসেছে। তা হোক, আরো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ। খেজুর গাছের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ে। এ কাজে নামডাক আছে মোতালেফের, এ কাজে গাঁয়ের মধ্যে সে-ই সেরা। এবারেও বাঁড়ুজ্যেদের কুড়িদেড়েক গাছ বেড়ে গেল।

গাছ কাটাবার ধুম লেগে গেছে। একটুও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতালেফের, সময় নেই তেমন ফুলবান্থর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি রঙ্গরসিকতার। ধার দেনা শোধ দিতে হবে, সারা বছরের রসদ জোগাড় করতে হবে রস বেচে, গুড় বেচে। দৈত্যের মত দিনভর খাটে মোতালেফ, আর বিছানায় গা দিতে ঘুনা দিতেই যে ভেঙে আসে চোখ। দু'হাতে ঠেলে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফুলবান্থ, কিন্তু মানুষকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ। শব্দ বেরোয় নাক থেকে, আর কোন অঙ্গ সাড়া দেয় না। মোটা কাঁথার মধ্যেও শীতে কাঁপে ফুলবান্থ। মানুষের গায়ের গরম না পেলে, এত শীত কি কাঁথায় মানে?

কেবল রস আনলেই হয় না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি চাই। এখান থেকে ওখান থেকে শুকনো তালপাতা আর খড় বয়ে বয়ে আনে মোতালেফ। ফুলবান্থকে বলে, 'রস জ্বাল দেও,—যেমন মিঠা হাত, তেমন মিঠা গুড় বানান চাই, সেরা আর সরেস জিনিস হওয়া চাই বাজারের।'

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে রসের পরিমাণ দেখে মুখ শুকিয়ে যায় ফুলবান্থর, বুক কাঁপে। দু'এক হাঁড়ি রস জ্বাল দিয়েছে সে বাপের বাড়িতে, কিন্তু এত রস এক সঙ্গে সে কোনদিন দেখেনি, কোনকালে জ্বাল দেয়নি।

মোতালেফ তার ভঙ্গি দেখে হেসে বলে, 'ভয় কি, আমি তো আছিই কাছে কাছে—আমারে পুছ কইরো, আমি কইয়া কইয়া দেব। মনের মইধ্যে যেমন টগবগ করে রস, জ্বালার মইধ্যেও তেমন করা চাই।'

কিন্তু উনানের কাছে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বসে বসে মনের রস

শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, নিবু নিবু করে উনানের আগুন, তেমন করে টগবগ করে না জালার রস। সারা দুপুর উনানের ধারে বসে বসে চোখ-মুখ শুকিয়ে আসে ফুলবানুর, রূপ ঝলসে যায়, তবু গুড় হয় না পছন্দমত। কেমন যেন নরম নরম থাকে পাটালি, কোনদিন বা পুড়ে তেতো হয়ে যায়।

মোতালেফ রুক্ষস্বরে বলে, 'কেমনতরো মাইয়ামানুষ তুমি, এত কইয়া কইয়া দেই, বুঝাইলে বোঝ না। এই কি গুড় হইছে, এই নি খইদ্দারে কেনবে পয়সা দিয়া ?'

ফুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা করে, বলে, 'কেনবে না ক্যান্। বেচতে জানলেই কেনবে।'

মোতালেফ খুশি হয় না হাসিতে, বলে, 'তাইলে তুমি যাইয়া ধামা লইয়া বইস বাজারে। তুমি আইস বেইচা। খাপসুরৎ মুখের দিকে চাইয়া যদি কেনে, গুড়ের দিকে চাইয়া কেনবে না।'

বোকা তো নয় ফুলবানু, অকেজো তো নয় একেবারে। বলতে বলতে শেখাতে শেখাতে দু'চার দিনের মধ্যেই কোন রকমে চলনসই গুড় তৈরি করতে শিখল ফুলবানু, বাজারে গুড় একেবারে অচল রইল না। কিন্তু দর ওঠে না গতবারের মত, খদ্দেররা তেমন খুশি হয় না দেখে।

পুরোন খদ্দেররা একবার গুড়ের দিকে চায় আর একবার মুখের দিকে চায় মোতালেফের, 'এ তোমার কেমনতরো গুড় হইল মেঞা ? গত হাটে নিয়া দেখলাম, গেল বছরের মত সোয়াদ পাইলাম না। গেলবারও তো গুড় খাইছি তোমার, জিহ্বায় যেন জড়াইয়া রইছে, আস্বাদ ঠোঁটে লাইগা রইছে। এবার তো তেমন হইল না। তোমার গুড়ের থিকা এবার ছদন শেখ, মদন সিক-দারের গুড়ের সোয়াদ বেশি।'

বুকের ভিতর পুড়ে যায় মোতালেফের, রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবারের মত এবার স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফের গুড়ে। কেন, সে তো কম

খাটছে না, কম পরিশ্রম করছে না গতবারের চেয়ে। তবু কেন স্বাদ হচ্ছে, না মোতালেফের গুড়ে, তবু কেন দর উঠছে না, লোকে দেখে খুশি হচ্ছে না খেয়ে খুশি হচ্ছে না, গুড়ের সুখ্যাতি করছে না তার। অত নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে কেন, কিসের জন্যে ?

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রস জাল দেওয়ার কৌশলটা আরো বার কয়েক মোতালেফ বলল ফুলবানুকে, 'হাতায় কইরা কইরা ফোটা দেইখো, ফোটা দেইখা চেনতে হয় নামাবার সময় হইল কিনা ঢালবার সময় হইল কিনা রস।'

ফুলবানু বিরক্ত বিরস মুখে বলে, 'হ হ, চিনছি। আর বক্ বক্ কইরো না, ঘুমাইতে দেও মাইন্‌ষেরে।'

হঠাৎ মোতালেফের মনে পড়ে গেল মাজুখাতুনের কথা। রাত্রে শুয়ে শুয়ে রস আর গুড়ের কত আলোচনা করেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজুখাতুন এমন করে মুখঝামটা দেয়নি, অস্বস্তি জানায়নি ঘুমের ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে সানন্দে কথা বলেছে।

পরদিন বেলা প্রায় দুপুর নাগাদ কোত্থেকে একবোঝা জ্বালানি মাথায় করে নিয়ে এল মোতালেফ, এনে রাখল সেই পাকাটির চালার দোরের কাছে ; 'কি রকম গুড় হইতেছে আইজ ফুলজান ?'

কিন্তু চালার ভিতর থেকে কোন জবাব এল না ফুলবানুর। আরো একবার ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভিতর মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু ফুলবানুকে সেখানে দেখা গেল না। কি রকম গন্ধ আসছে যেন ভিতর থেকে, জালার মধ্যে ধরে গেল নাকি গুড় ? সারে সারে গোটা পাঁচেক জালায় রস জ্বাল হচ্ছে, টগবগ করছে রস জালার মধ্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ। যা ভেবেছে ঠিক তাই। সব চেয়ে দক্ষিণ-কোণের জালাটার রস বেশি জ্বাল পেয়ে কি করে যেন ধরে গেছে একটু। পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে ভিতর থেকে। বুকের মধ্যে জ্বালাপোড়া করে

উঠল মোতালেফের, গলা চিরে চীৎকার বেরুল—'কই, কোথায় গেলি হারামজাদী ?'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফুলবানু। বেলা বেশি হয়ে যাওয়ায় দু'দিন ধরে স্নান করতে পারেনি। শীতের দিনে না নাইলে গা কেমন চড় চড় করে, ভালো লাগে না। তাই আজ একটু সোডা সাবান মেখে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান করে এসেছে। নেয়ে এসে পড়েছে নীল রঙের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাতে তাড়াতাড়ি একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল ফুলবানু, মোতালেফের চীৎকার শুনে ত্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে রইল পিঠের ওপর। একমুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুঠি করে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদী, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুনা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী, এই জৈন্যই গুড় খারাপ হয় আমার, অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে !'

ফুলবানু বলতে গেল, 'খবরদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিও না।'

'ও, হাতে মারলে মান যায় বুঝি তোমার ?' পায়ের কাছ থেকে একটা ছিটা কঞ্চি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাতে বুকে পিঠে মোতালেফ সপাসপ চালাতে লাগল ফুলবানুর সর্বাঙ্গে, বলল, 'কঞ্চিতে মারলে তো আর মান যাবে না শেখের ঝির। হাতেই দোষ, কঞ্চিতে তো আর দোষ নাই।'

ভারি বদরাগী মানুষ মোতালেফ। যেমন বেসবুর বেবুঝ তার অনুরাগ, রাগও তেমনি প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেম শেখ এল চরকান্দা থেকে। জামাইকে শাসালো, বকলো, ধমকালো, মেয়েকেও নিন্দামন্দ কম করল না।

ফুলবানু বলল, 'আমারে লইয়া যাও বা'জান তোমার সাথে—এমন গোঁয়ার মাইন্‌ষের ঘর করব না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে শুনিয়ে এলেম রেখে গেল মেয়েকে। একটু আস্কারা দিলেই ফুলবানু পেয়ে বসবে, আবার তালাক নিতে চাইবে। কিন্তু গৃহস্থঘরে বারবার অমন অদলবদল আর ঘর-বদলানো কি চলে। তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজের কাছে। একটু সবুর করলেই আবার মন নরম হয়ে আসবে মোতালেফের। দু'দণ্ড পরেই মিলমিশ হয়ে যাবে। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি। দিনে হয়, রাত্রে মেটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা।

মিটে গেলও। খানিক বাদেই আবার যেচে আপোষ করল মোতালেফ। সেধেভজে মান ভাঙাল ফুলবানুর। পরদিন ফের আবার উনানের পিঠে রস জ্বাল দিতে গিয়ে বসল ফুলবানু। দুপুরের পর ধামায় বয়ে গুড় নিয়ে চলল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল, 'এই দুইটা মাস কাইটা গেলে কোন রকমে, তোমার কষ্ট সারে ফুলজান।'

ফুলবানু বলল, 'কষ্ট আবার কি।'

কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে। সে কথার ধরন আলাদা, ধ্বনি আলাদা; তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো। বলে ও জানে, শোনে ও জানে।

হাটের পর হাট যায়, রসের বতর প্রায় শেষ হয়ে আসে; গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না; কিন্তু তা নিয়ে ফুলবানুর সঙ্গে বাড়ি এসে আর তর্কবিতর্ক করে না মোতালেফ, চুপ করে বসে বসে হুঁকোয় তামাক টানে। খেজুর গাছ থেকে নল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির

মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গত বছরের মত যেন সুখ নেই মনে, স্ফূর্তি নেই। ঘামে এবারো সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাকাটির মত খট্ খট্ করে মন, দুপুরের রোদের মত খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটাফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে ভরে যায় উঠান, রসবতী নারী ঘরের মধ্যে ঘোরাফেরা করে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয় দুনিয়া।

একদিন হাটের মধ্যে দেখা হয়ে গেল নদীর পারে নাদির শেখের সঙ্গে।

'সেলাম মেঞাসাব।'

'আলেকম আস্‌লাম্।'

মোতালেফ বলল, 'ভালো তো, সব ছাওয়ালপান ভালো তো—?'

মাজুখাতুনের কথাটা মুখে এনেও আনতে পারল না মোতালেফ। নাদির একটু হেসে বলল, 'হ মেঞা, ভালোই আছে সব। খোদার দয়ায় চইলা যাইতেছে কোন রকম সকমে।'

মোতালেফ একটু ইতস্তত করে বলল, 'ছাওয়ালপানের জৈন্যে সের দুই-তিন গুড় লইয়া যান না মেঞা। ভালো গুড়।'

নাদির হেসে বলল, 'ভালোই তো। আপনার গুড় তো কোনকালে খারাপ হয় না।'

হঠাৎ ফস্ করে কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় মোতালেফের, 'না মেঞা, সে দিনকাল আর নাই।'

অবাক হয়ে নাদির একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকে মোতালেফের দিকে। এ কেমনতরো ব্যাপারি! গুড় বেচতে এসে নিজের গুড়ের নিন্দা কি কেউ নিজে করে?

নাদির জিজ্ঞাসা করে, 'কত কইরা দিতেছেন?'

'দামের জৈন্যে কি? দুইসের গুড় দিলাম আপনার পোলাপানরে খাইতে। কয়ন জানি, চাচায় দিছে।'

নাদির ব্যস্ত হয়ে বলে, 'না না না, সে কি মেঞা, আপনার বেচবার জিনিস, দাম না দিয়া নেব ক্যান্ আমি।'

মোতালেফ বলে, 'আইচ্ছা, নিয়া তো যায়ন আইজ। খাইয়া ছাখেন। দাম না হয় সামনের হাটে দিবেন।'

বলতে বলতে কথাগুলো যেন মুখে আটকে যায় মোতালেফের। এবারেও জিনিস কাটাবার জন্যে বলতে হয় এ সব কথা, গুড়ের গুণপনার কথা ঘোষণা করতে হয় খদ্দেরের কাছে, কিন্তু মনে মনে জানে কথাগুলি কত মিথ্যা, পরের হাটে এ সব খদ্দের আর পারতপক্ষে গুড় কিনবে না তার কাছ থেকে, ভিড় করবে না তার গুড়ের ধামার সামনে।

অনেক বলা-কওয়ায় একসের গুড় কেবল বিনা দামে নিতে রাজী হয় নাদির, আর বাকি দু'সেরের পয়সা গুনে দেয় জোর করে মোতালেফের হাতের মধ্যে।

মাজুখাতুন সব শুনে আগুন হয়ে ওঠে রেগে, 'ও গুড় ছাওয়ালপানরে খাওয়াইতে চাও খাওয়াও, কিন্তু আমি ও গুড় ছোব না হাত দিয়া, তেমন বাপের বিটি না আমি।'

এক হাট যায়, নাদির আর ঘেঁষে না মোতালেফের গুড়ের কাছে। মাজুখাতুন নিষেধ করে দিয়েছে নাদিরকে, 'খবরদার, ওই মাইন্ষের সাথে যদি ফের খাতির-নাতির কর, আমি চইলা যাব ঘরগুনা। রাইত পোহাইলে আমারে আর দেখতে পাবা না।'

মনে মনে মাজুখাতুনকে ভারি ভয় করে নাদির। কাজ-কর্মে সরেশ, কথায়-বার্তায় বেশ, কিন্তু রাগলে আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বিবির।

দিন কয়েক পরে একদিন ভোরবেলায় দু'টি সেরা গাছের সবচেয়ে ভালো

দু'হাঁড়ি রস নিয়ে নদীর ঘাটে গিয়ে খেয়ানৌকায় উঠে বসল মোতালেফ। ঝাপটানো কুলগাছটার পাশ দিয়ে ঢুকল গিয়ে নাদিরের উঠানে; 'বাড়ি আছেন নাকি মেঞা ?' হুঁকো হাতে নাদির বেরিয়ে এল ঘর থেকে ; 'কেডা ? ও, আপনে ? আসেন, আসেন। আবার রস নিয়া আইছেন ক্যান্ মেঞাসাব ?'

মোতালেফকে আমন্ত্রণ জানাল বটে নাদির কিন্তু মনে মনে ভারি শঙ্কিত হয়ে উঠল মাজুখাতুনের জন্য। যে মানুষের নামগন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। না জানি, কি কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।

যা ভেবেছে নাদির, তাই। বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই স্বামীকে ঘরের ভিতর ডেকে নিল মাজুখাতুন, তারপর মোতালেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'যাইতে কও এ বাড়ি গুনা, এখনই নাইমা যাইতে কও। একটুও কি শরম ভরম নাই মনের মইধ্যে ? কোন্ মুখে উঠল আইসা এখানে ?'

নাদির ফিস ফিস করে বলল, 'আস্তে, আস্তে,—একটু গলা নামাইয়া কথা কও বিবি। শোনতে পাবে। মাইন্‌ষের বাড়ি মানুষ আইছে, অমন কইরা কথা কয় নাকি। কুকুর বিড়ালডারেও তো অমন কইরা খেদায় না মাইন্‌ষে।'

মাজুখাতুন বলল, 'তুমি বোঝবা না মেঞা, কুকুর বিড়াল থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়। পুছ কর, রস খাওয়াইতে যে আইল আমারে, একটুও কি ভয়ডর নাই মনে, একটুও কি নাজশরম নাই ?'

একটা কথাও মৃদুস্বরে বলছিল না মাজুখাতুন, তার সব কথাই কানে যাচ্ছিল মোতালেফের। কিন্তু আশ্চর্য, এত কঠিন, এত রূঢ় ভাষাও যেন তাকে ঠিক আঘাত করছিল না, বরং মনে হচ্ছিল এত নিন্দা-মন্দ, এত গালাগাল তিরস্কারের মধ্যেও কোথায় যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে ; মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নারীর অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠের

আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলের ভিতর দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রস।

দাওয়ায় উঠে রসের হাঁড়ি দু'টি হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে রেখে মোতালেফ নাদিরকে ডেকে বলল, 'মেঞাসাব, শোনবেন নি একটু?'

নাদির লজ্জিত মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'বসেন মেঞা, বসেন। ধরেন, তামাক খান।'

নাদিরের হাত থেকে হুঁকোটা হাত বাড়িয়ে নিল মোতালেফ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ লাগিয়ে টানতে শুরু করল না, হুঁকোটা হাতেই ধরে রেখে নাদিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার হইয়া একটা কথা ক'ন বিবিরে।'

নাদির বলল, 'আপনেই ক'ন না, দোষ কি তাতে।'

মোতালেফ বলল, 'না, আপনেই ক'ন, কথা কবার মুখ আমার নাই। ক'ন যে মোতালেফ মেঞা খাওয়াবার জৈন্য আনে নাই রস, সেইটুক্ বুদ্ধি তার আছে।'

নাদির কিছু বলবার আগেই মাজুখাতুন ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠল, 'তয় কিসের জৈন্য আনছে?'

নাদিরের দিকে তাকিয়ে তাকেই জবাব দিল মোতালেফ, বলল, 'কয়ন যে আনছে জ্বাল দিয়া দুই সের গুড় বানাইয়া দেওয়ার জৈন্যে। সেই গুড় ধামায় কইরা হাটে নিয়া যাবে মোতালেফ মেঞা। নিয়া বেচবে অচেনা খইদ্দারের কাছে। এ বছর এক ছটাক পছন্দসই গুড়ও তো সে হাটে বাজারে বেচতে পারে নাই। কেবল গাছ বাওয়াই সার হইছে তার।'

গলাটা যেন ধরে এল মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর-দুটি চোখ ছল্‌ছল্ করে উঠেছে। চুপ করে তাকিয়ে রইল মোতালেফ। আর কিছু বলা হোল না।

হঠাৎ যেন হুঁশ হোল নাদির শেখের, বলল, 'ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা রইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না? আগুননি নিবা গেল কইলকার?'

হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মেঞাভাই, নেবে নাই।'

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

'পথের পাঁচালী' গ্রন্থের লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানেন না, বাংলা সাহিত্যের এমন পাঠক অল্পই আছেন। ইনি প্রথমেই বলতে পারতেন, ভিনি, ভিডি, ভিসি। কী ছোটগল্প কী উপন্যাস—কথাসাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই ইনি প্রথম থেকে যে অসামান্য খ্যাতি পেয়েছেন তা পৃথিবীর যে-কোন দেশের সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। 'পথের পাঁচালী-অপরাজিত' 'আরণ্যক' 'দৃষ্টিপ্রদীপ' 'অনুবর্তন' 'দেবযান' 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' প্রত্যেকটি নূতন বিষয়বস্তু নিয়ে নূতন ধরনে লেখা। ছোটগল্পের বইগুলিও এক-একটি রসসমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত। 'মেঘমল্লার' 'যাত্রাবদল' 'নবাগত' 'অসাধারণ' 'আচার্য কৃপালনী কলোনী' প্রভৃতি তার মধ্যে সমধিক বিখ্যাত। বনগাঁর কাছে বারাকপুর গ্রামে এঁর জন্ম। বি এ পাশ করে ইনি কিছুদিন মাষ্টারি করেন, পরে পূর্ণিয়ার কাছে এক বিরাট জঙ্গল মহলে জমিদারী সেরেস্তার ম্যানেজার হয়ে যান। সেইখানেই 'পথের পাঁচালী' লেখা শুরু হয়। ঐখান থেকেই 'আরণ্যকে'র কল্পনা মাথায় আসে। জঙ্গল এবং গ্রাম—এই ছিল তাঁর প্রাণ। মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে গত ১৯৫০ সালে ঘাটশীলায় নিজের বাড়িতে মারা যান।

মেঘ-মল্লার

দশ-পারমিতার মন্দিরে সেদিন যখন সাপুড়ের খেলা দেখবার জন্য অনেক মেয়েপুরুষ মন্দির-প্রাঙ্গণে একত্র হয়েছিল, তারই মধ্যে প্রদ্যুম্ন প্রথমে লোকটিকে দেখে।

সেদিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি। চারি পাশের গ্রাম থেকে মেয়েরা এসেছিল দশ-পারমিতার পূজা দিতে। সেই উপলক্ষে অনেক সাপুড়ে, গায়ক, বাজিকর মন্দিরে একত্র হয়েছিল ; অনেক মালাকর নানা রকমের সুন্দর সুন্দর

ফুলের গহনা গড়ে মেয়েদের কাছে বেচবার জন্য এনেছিল ; একজন শ্রেষ্ঠী মগধ থেকে দামী দামী রেশমী শাড়ি বেচবার জন্য এনেছিল, তারই দোকানে ছিল সেদিন মেয়েদের খুব ভিড়। প্রদ্যুম্ন শুনেছিল, জ্যৈষ্ঠ-সংক্রান্তির উৎসব উপলক্ষে পারমিতার মন্দিরে একজন বিখ্যাত গায়ক ও বীণ্-বাজিয়ে আসবেন। সে মন্দিরে গিয়েছিল তাঁরই সন্ধানে। সমস্ত দিন ধরে খুঁজেও কিন্তু প্রদ্যুম্ন তাঁকে ভিড়ের মধ্যে থেকে বার করতে পারেনি।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে মন্দিরের উঠানে একজন সাপুড়ে অদ্ভুত-অদ্ভুত সাপের খেলা দেখাতে আরম্ভ করলে, আর তারই চারিধারে অনেকগুলি কৌতুক-প্রিয়া মেয়ে জমে গেল। ক্রমে সেখানে খুবই ভিড় হয়ে উঠল। প্রদ্যুম্নও সেখানে দাঁড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু তার মন সাপখেলার দিকে আদৌ ছিল না। সে ভিড়ের মধ্যের প্রত্যেক পুরুষমানুষকে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করছিল যদি চেহারায় ও হাবভাবে বীণ্-বাজিয়ে ধরা পড়েন। অনেকক্ষণ ধরে দেখবার পর তার চোখে পড়ল—একজন প্রৌঢ় ভিড়ের মধ্য থেকে তার দিকেই চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পরনে অতি মলিন ও জীর্ণ পরিচ্ছদ। কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের মনে হল, এই সেই গায়ক। প্রদ্যুম্ন লোক ঠেলে তাঁর কাছে যাবার উদ্যোগ করতে তিনি হাত উঁচু করে প্রদ্যুম্নকে ভিড়ের বাইরে যেতে ইঙ্গিত করলেন।

বাইরে আসতে প্রৌঢ় তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি অবন্তীর গাইয়ে সুরদাস, তুমি আমাকে খুঁজছিলে না ?

প্রদ্যুম্ন একটু আশ্চর্য হল। তার মনের কথা ইনি জানলেন কি করে ?

প্রদ্যুম্ন সসম্ভ্রমে জানালে, হ্যাঁ সে তাঁকেই খুঁজছিল বটে।

প্রৌঢ় বললেন—তুমি আমার অপরিচিত নও। তোমার পিতার সঙ্গে একসময় আমার যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল। আমি কাশী গেলেই তোমার পিতার সঙ্গে

দেখা না করে আসতাম না। তোমাকেও ছেলেবেলায় দেখেছি, তোমার বয়স তখন খুব কম।

—আপনি এখানে এসে কোথায় আছেন ?

—নদীর ধারে একটা ভাঙা মন্দির আছে, জান ?

—হ্যাঁ, জানি। ওখানে একজন সন্ন্যাসী পূর্বে থাকতেন না ?

—তিনি এখনও ওখানেই আছেন। তুমি যে-কোনো একদিন গিয়ে ওখানে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। তুমি এখানে কোথায় থাক ?

—এখানকার বিহারে পড়ি, তিন বছর আছি। আপনি মন্দিরে কতদিন থাকবেন ?

—সে তোমাকে বলব। তুমি এরই মধ্যে একদিন যেও।

প্রত্যুম্ন প্রণাম করে বিদায় নিল।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি ; মন্দিরটা যে ছোট পাহাড়ের উপর ছিল তারই দুপাশের ঢালু রাস্তা বেয়ে মেয়েরা উৎসব থেকে বাড়ি ফিরছিল। প্রত্যুম্নের চোখ যেন কার সন্ধানে একবার মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে ইতস্তত ধাবিত হল, পরেই সে আবার তাদের পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল। আচার্য শীলব্রত অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ, একেই তিনি প্রত্যুম্নের মধ্যে অন্যান্য ছাত্রদের চেয়ে বেশি চঞ্চলতা ও কৌতুকপ্রিয়তা লক্ষ্য করে তাকে একটু বেশি শাসনের মধ্যে রাখতে চেষ্টা করেন—তার উপরে সে রাত করে বিহারে ফিরলে কি আর রক্ষা থাকবে ?

বাঁক ফিরতেই বাঁ পাশের পাহাড়ে আড়ালটা সরে গেল। সেখানে সেদিকটা ছিল খোলা। প্রত্যুম্ন দেখলে দূরে নদীর ধারে মন্দিরটার চূড়া দেখা যাচ্ছে। চূড়ার মাথার উপরকার ছায়াচ্ছন্ন আকাশ বেয়ে ঝাপসা ঝাপসা

পাখীর দল ডানা মেলে বাসায় ফিরছিল। আরও দূরে একখানা সাদা মেঘের প্রান্ত পশ্চিমদিকের পড়ন্ত রোদে সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে আসছিল, চারিধারে তার পীতোজ্জ্বল মেঘের কাঁচুলি হাল্‌কা করে টানা।

হঠাৎ পিছন থেকে প্রদ্যুম্নের কাপড় ধরে কে ঈষৎ টানলে।

প্রদ্যুম্ন পিছন ফিরে চাইতেই, যে কাপড় ধরে টেনেছিল তার চোখে কৌতুকের বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে কিশোরী, তার দোলনচাঁপা-রঙের ছিপ্‌ছিপে দেহটি বেড়ে' নীল শাড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরা। নতুন কেনা একছড়া ফুলের মালা তার খোঁপাটিতে জড়ানো।

প্রদ্যুম্ন বিস্ময়ের স্বরে বলে উঠল—কখন্ তুমি এসেছিলে, সুনন্দা? আমি তোমাকে এত খুঁজলাম, কই দেখতে পেলাম না ত?

প্রথমটা কিশোরীর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, তার পর সে একটু অভিমানের স্বরে বললে—আমাকেই খুঁজতে যেন এখানে এসেছিলে আর কি। যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকরদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে ঘুরছিলে, সে আর আমি দেখিনি?

—সত্যি বলছি সুনন্দা, তোমাকেও খুঁজেছি। নামবার সময় খুঁজেছি, এর আগেও খুঁজেছি; তুমি কাদের সঙ্গে এলে?

এমন সময় দেখা গেল একদল মেয়ে পাহাড়ের উপর থেকে সেই পথে নেমে আসছে। সুনন্দার সেদিকে চোখ পড়তেই সে তখনি হঠাৎ প্রদ্যুম্নকে পিছনে ফেলে দ্রুতপদে নামতে লাগল।

পিছনেই একদল অপরিচিতা মেয়ে, এ অবস্থায় আর সুনন্দার অনুসরণ করা সঙ্গত হবে না ভেবে সে প্রথমটা খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তার পর হতাশা-মেশানো ক্রোধে ঘাড় উঁচু করে সে সদর্পে লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলতে লাগল।

সন্ধ্যার ঈষৎ-অন্ধকার কখন মিলিয়ে গিয়েছে, অন্ধকারটাই তরল হতে

তরলতর হতে হতে হঠাৎ কখন্ জ্যোৎস্নায় পরিণত হয়েছে, অন্যমনস্ক প্রত্যুম্ন তা মোটেই লক্ষ্য করেনি। যখন তার চমক ভাঙল, তখন পূর্ণিমার শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোৎস্না পথঘাট ধুইয়ে দিচ্ছিল। দূর মাঠের গাছপালা জ্যোৎস্নায় ঝাপসা দেখাচ্ছিল। পড়াশুনো তার হয় কি করে ? আচার্য পূর্ণবর্ধন ত্রিপিটকের পাঠ অনায়ত্ত দেখে তাকে ভর্ৎসনা করলেই বা কি করা যাবে ? এ রকম রাত্রে যে যুগযুগের বিরহীদের মনোবেদনা তার প্রাণের মধ্যে জমে ওঠে, তার অবাধ্য মন যে এই সব পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রে মহাকোট্ঠি বিহারের পাষাণ-অলিন্দে মানস-সুন্দরীদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায় এর জন্যে সেই কি দায়ী !

দশ-পারমিতার মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার ধ্বনি তখনো মিলিয়ে যায়নি, দূরে নদীর বাঁকের ভাঙা মন্দিরে ক্ষীণ আলো জ্বলে উঠল, উৎসব-প্রত্যাগত নরনারীর দল জ্যোৎস্না-ভরা মাঠের মধ্যে ক্রমে বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রত্যুম্নের গতি আরো দ্রুত হল।

পথের পাশে একটা গাছ। গাছের নিকট যেতে প্রত্যুম্নের মনে হল গাছের আড়ালে কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে—আর একটু এগিয়ে গাছের পাশে যেতেই তার অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠের হালকা মিষ্টি হাসির ঢেউএ সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল,—দেখলে, গাছতলায় সুনন্দা দাঁড়িয়ে আছে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চিকচিকে জ্যোৎস্নার আলো পড়ে তার সর্বাঙ্গে আলো-আঁধারের জাল বুনেছে। প্রত্যুম্ন চাইতেই সুনন্দা ঘাড় দুলিয়ে বলে উঠল—আর একটু হলেই বেশ হত ! গাছের তলা দিয়ে চলে যেতে অথচ আমায় দেখতে পেতে না !

সুনন্দাকে দেখে প্রত্যুম্ন মনে মনে ভারি খুশি হল, মুখে বললে—নাঃ, তা আর দেখব কেন ! ভারি ব্যাপারটা হয়েছে গাছতলায় লুকিয়ে। আর না দেখতে পেলেই বা কি ? আমি তোমার ওপর ভারি রাগ করেছি সুনন্দা, সত্যি বলছি।

সুনন্দা বললে—দোষ করলেন নিজে আবার রাগও করলেন নিজে। সেদিন কি কথা বলেছিলে মনে আছে? তা না, যত রাজ্যের সাপুড়ে আর বাজিকর—মাগো! ওদের কাছে যাও কি করে? এমন ময়লা কাপড় পরে! আমি ওদের ত্রিসীমানায় যাইনে।

প্রদ্যুম্ন বললে—তুমি বড়মানুষের মেয়ে, তোমার কথাই আলাদা। কিন্তু কথাটা কি ছিল বলছিলে?

সুনন্দা বললে—যাও! আর মিথ্যে ভানে দরকার নেই। কি কথা মনে করে দেখ। সেই সেদিন বললে না?

প্রদ্যুম্ন একটুখানি ভেবে বলে উঠল—বুঝতে পেরেছি, সেই বাঁশি?

সুনন্দা অভিমানের সুরে বললে—ভেবে দেখ বলেছিলে কি না। আমি দুপুর বেলা থেকে মন্দিরে এসে বসে আছি! একে ত এলেন বেলা করে, তার ওপর—যাও!

প্রদ্যুম্ন এবার হেসে উঠল। বললে—আচ্ছা সুনন্দা, যদি তুমি আমায় দেখতেই পেয়েছিল ত আমায় ডাকলে না কেন?

সুনন্দা বললে—আমি কি একা ছিলাম? দুপুর বেলায় আমি একা এসেছিলাম বটে, কিন্তু তখন ত আর তুমি আসনি? তার পর আমাদের গাঁয়ের মেয়েরা সব যে এল। কি করে ডাকব?

প্রদ্যুম্ন বললে—আচ্ছা ধরে নিলাম আমার দোষ হয়েছে, তবে তুমি যে বার বার সাপুড়ে আর বাজিকরদের কথা বলছ সুনন্দা, সাপুড়ে আর বাজিকরদের আমি খুঁজিনি। শুনেছিলাম অবন্তী থেকে একজন বড় বীণ্-বাজিয়ে আসবেন; তুমি ত জানো, আমার অনেক দিন থেকে বীণ্ শেখবার বড় ইচ্ছা। তাই তাঁর সন্ধানে ঘুরছিলাম, তাঁর দেখাও পেয়েছি। তিনি এখানকার নদীর ধারের দেউলে থাকেন। ভালো কথা—তোমার বাবা কোথায়?

সুনন্দা বললে—বাবা তিন চার দিন হল কৌশাম্বী গিয়েছেন মহারাজের ডাকে।

প্রদ্যুম্ন হঠাৎ খুব উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বললে—ওহো, তাই! নইলে আমি ভাবছি এত রাত পর্যন্ত সুনন্দা কি—

সুনন্দা তাড়াতাড়ি প্রদ্যুম্নের মুখে নিজের হাতদুটি চাপা দিয়ে লজ্জিত মুখে বললে—চুপ চুপ, তোমার কি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? এখুনি যে সব আরতি দেখে লোক ফিরবে!

প্রদ্যুম্ন হাসি থামিয়ে বললে—এবার কিন্তু তোমার বাবা এলে বলে দেব নিশ্চয়—

সুনন্দা রাগের সুরে বললে—দিও বলে। এমনি আমি মন্দিরে আরতি পর্যন্ত থাকি, তিনি জানেন।

প্রদ্যুম্ন সুনন্দার সুগঠিত পুষ্পপেলব দক্ষিণ বাহুটি নিজের হাতের মধ্যে বেষ্টন করে নিলে, তার পর বললে—আচ্ছা থাক্, বলে দেব না। চল সুনন্দা তোমায় বাঁশি শোনাই, আমার সঙ্গেই আছে—সত্যি বলছি তোমায় শোনাবার জন্যেই এসেছিলাম। তবে ওঁকে খুঁজছিলাম বীণ্‌টা ভাল করে শিখব বলে।

নদীর ধারে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্ন বড় নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। সে বাঁশি বাজালে বটে কিন্তু সে যেন ভাসা-ভাসা। সুরের সঙ্গে তাতে তার প্রাণের কোনো যোগ রইল না। আরও কতবার তারা দুজনে নির্জনে কতবার বসেছে, প্রদ্যুম্নের বাঁশি শুনতে সুনন্দা ভালবাসত বলে প্রদ্যুম্ন যখনই বিহার থেকে বাইরে আসত, বাঁশিটি সঙ্গে আনত। প্রদ্যুম্নের বাঁশির অলস স্বপ্নময় সুরের মধ্যে দিয়ে কতদিন উভয়ের অজ্ঞাতে রোদভরা মধ্যাহ্ন গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে, কিন্তু দুজনে এক হলে প্রদ্যুম্নের এ রকম নিরুৎসাহ ভাব তো সুনন্দা আর কখনো লক্ষ্য করেনি।

কি জানি কেন প্রদ্যুম্নের বার বার মনে আসছিল সেই জীর্ণপরিচ্ছদপরা অদ্ভুতদর্শন গায়ক সুরদাসের কথা। তাদের বিহারের কলাবিৎ ভিক্ষু বসুব্রতের আঁকা জরার চিত্রের মতই লোকটা কেমন কুশ্রী লোলচর্ম শীর্ণদর্শন। পুরাতন পুঁথির ভূর্জপত্রের মত ওর পরিচ্ছদের কেমন একটা অপ্রীতিকর মেটে লাল রঙ!

তার পরদিন সকালে প্রদ্যুম্ন নদীর ধারের ভাঙা মন্দিরে গেল। সেটার দেব-মূর্তি বহুদিন অন্তর্হিত। সমস্ত গায়ে বড় বড় ফাটল, সাপখোপের বাসা। নিকটবর্তী গ্রামবাসীরা সেদিকে বড়-একটা কেউ আসত না। একজন আজীবক সন্ন্যাসী আজ প্রায় সাত আট মাস হল সেখানে বাস করছেন। তাঁরই দু'চারজন অনুগত ভক্ত মাঝে মাঝে আসত যেত বলে মন্দিরের পথ আজকাল অপেক্ষাকৃত ভালো আছে।

অর্ধ-অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রদ্যুম্নের সঙ্গে সুরদাসের সাক্ষাৎ হল। সুরদাস প্রদ্যুম্নকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন, তার পর বললেন—চল বাইরে গিয়ে বসি, এখানে বড় অন্ধকার।

বাইরে গিয়ে সুরদাস আলোতে প্রদ্যুম্নের মুখ ভালো করে দেখলেন, তার পর যেন আপন মনে বলতে লাগলেন—হবে, তোমার দ্বারাই হবে! আমি তা জানতাম।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসে মূর্তি দূর থেকে ভেবে যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেছিল, তাঁর নিকটে এসে কিন্তু প্রদ্যুম্নের সে ভাব কেটে গেল। সে লক্ষ্য করলে সুরদাসের মুখশ্রী একটু কুদর্শন হলেও প্রতিভাব্যঞ্জক।

সুরদাস বললেন—আমি ভাবছিলাম তুমি আজ আসবে।—হাঁ, তোমার পিতা ত একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন, তুমি নিজে কিছু শিখেছ?

প্রদ্যুম্ন লজ্জিত-মুখে উত্তর দিলে—একটু-আধটু বাঁশি বাজাতে পারি।

সুরদাস উৎসাহের সুরে বললেন—পারা ত উচিত। তোমার বাবাকে জানত না এমন লোক এদেশে খুব কম আছে। প্রতি উৎসবেই কৌশাম্বী থেকে তোমার বাবার নিমন্ত্রণপত্র আসত।—হাঁ, আমি শুনেছি তুমি নাকি বাঁশিতে বেশ মেঘ-মল্লার আলাপ করতে পার।

প্রদ্যুম্ন বিনীতভাবে উত্তর দিলে—বিশেষ যে কিছু জানি তা নয়, যা মনে আসে তাই বাজাই, তবে মেঘ-মল্লার মাঝে মাঝে বাজিয়েছি।

সুরদাস বললেন—কই, দেখি তুমি কেমন শিখেছ?

বাঁশি সব সময়েই প্রদ্যুম্নের কাছে থাকত। কখন্ কোন্ সময় সুনন্দার সঙ্গে দেখা হয়ে পড়ে বলা ত যায় না।

প্রদ্যুম্ন বাঁশি বাজাতে লাগল। তার পিতা তাকে বাল্যকালে যত্ন করে রাগিণী শেখাতেন, তা ছাড়া সঙ্গীতে প্রদ্যুম্নে একটা স্বাভাবিক ক্ষমতাও ছিল। তার আলাপ অতি মধুর হল। লতাপাতা ফুলফলের মাঝখান বেয়ে উদার নীল আকাশ, আর জ্যোৎস্নারাতের মর্ম ফেটে যে রসধারা বিশ্বে সব সময় ঝরে পড়ছে, তার বাঁশির গানে সে রস যেন মূর্ত হয়ে উঠল; সুরদাস বোধ হয় এতটা আশা করেননি, তিনি প্রদ্যুম্নকে আলিঙ্গন করে বললেন—ইন্দ্রদ্যুম্নের ছেলে যে এমন হবে, সেটা বেশি কথা নয়। বুঝতে পেরেছি, তুমিই পারবে, এ আমি আগেও জানতাম।

নিজের প্রশংসাবাদে প্রদ্যুম্নের তরুণ সুন্দর মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

অন্যান্য দু'এক কথার পর, প্রদ্যুম্ন বিদায় নিতে উদ্যত হলে, সুরদাস তাকে বললেন—শোন প্রদ্যুম্ন, একটা গোপনীয় কথা তোমার সঙ্গে আছে। তোমাকে একথা বলব বলে পূর্বেও তোমাকে খোঁজ করেছিলাম; তোমাকে পেয়ে খুব ভালোই হয়েছে। কথাটা তোমাকে বলি, কিন্তু তার আগে

তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, একথা তুমি কারুর কাছে প্রকাশ করবে না।

প্রদ্যুম্ন অত্যন্ত বিস্মিত হল। এই প্রৌঢ়ের সঙ্গে তার মোটে এক দিনের আলাপ, এমন কি গোপনীয় কথা তিনি তাকে বলবেন?

সে বললে—কি কথা না শুনে কি করে—

সুরদাস বললেন—তুমি ভেবো না, কোন অনিষ্টজনক ব্যাপার হলে আমি তোমাকে বলতাম না।

কি কথা জানবার জন্যে প্রদ্যুম্নের অত্যন্ত কৌতূহলও হল, সে প্রতিজ্ঞা করলে সুরদাসের কথা কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

সুরদাস গলার স্বর নামিয়ে বলতে লাগলেন—নদীর ঐ বড় বাঁকে যে ঢিবিটা আছে জানো যার সামনেই বড় মাঠ? ওই ঢিবিটায় বহু প্রাচীন কালে সরস্বতী দেবীর মন্দির ছিল; শুনেছি এদেশের যত বড় বড় গায়ক ছিলেন, শিক্ষা শেষ করে সকলেই ওই মন্দিরে আগে এসে দেবীর পূজা দিয়ে তুষ্ট না করে ব্যবসা আরম্ভ করতেন না। সে অনেক দিনের কথা; তার পর মন্দির ভেঙেচুরে ওই ঢিবিতে দাঁড়িয়েছে। ঐ ঢিবিতে বসে আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে মেঘ-মল্লার নিখুঁতভাবে আলাপ করলে সরস্বতী দেবী স্বয়ং গায়কের কাছে আবির্ভূতা হন। এ সংবাদ এদেশে কেউ জানে না। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র এই তিন মাসের তিন পূর্ণিমায় প্রতিবার যদি তাঁকে আনতে পারা যায়, তবে তাঁর বরে গায়ক সঙ্গীতে সিদ্ধ হয়। তাঁর বরে সঙ্গীত-সংক্রান্ত কোনো বিষয় তখন গায়কের কাছে অজ্ঞাত থাকে না। তবে একটা কথা আছে, যে গায়ক বর প্রার্থনা করবে সে অবিবাহিত হওয়া চাই। তা, আমি বলছিলাম, সামনের পূর্ণিমায় তুমি আর আমি এই বিষয়টা চেষ্টা করে দেখব, তুমি কি বল?

সুরদাসের কথা শুনে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গেল। তা কি করে হয়? আচার্য বসুব্রত কলাবিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে দিতে অনেকবার যে বলেছেন.

কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর যে মূর্তি হিন্দুরা কল্পনা করেন সেটা নিছক কল্পনাই, তার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই। সত্য সত্য তাঁকে দেখতে পাওয়া—এ কি সম্ভব ?

প্রত্যুম্ন চুপ করে রইল।

সুরদাস একটু ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—এতে কি তোমার অমত আছে ?

প্রত্যুম্ন বললে—সে জন্যে না। কিন্তু আমি ভাবছিলাম এটা কি করে সম্ভব যে—

সুরদাস বললেন—সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এর সত্যতা তুমি নিজের চোখে দেখো। তোমার অমত না থাকলে আমি সামনের পূর্ণিমায় সব ব্যবস্থা ঠিক করে রাখি।

সুরদাসের কথার পর থেকেই প্রত্যুম্ন অত্যন্ত বিস্ময় ও কৌতূহলে কেমন একরকম হয়ে গিয়েছিল। সে ঘাড় নেড়ে বললে—আচ্ছা রাখবেন, আমি আসব।

সুরদাস বললেন—বেশ, বড় আনন্দিত হলাম। তুমি মাঝে মাঝে একবার ক'রে এখানে এসো, তোমাকেও তৈরী হতে হলে দু-একটা কাজ করতে হবে, সে বলে দেব।

প্রত্যুম্ন আর একবার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়বার পর সুরদাসের কাছে বিদায় চাইলে।

তার পর চিন্তিতভাবে বিহারের পথ ধরলে।

তার মনে হচ্ছিল—দেবী সরস্বতী স্বয়ং! শ্বেতপদ্মের মত নাকি রঙটি তাঁর, না জানি কত সুন্দর তাঁর মুখশ্রী! আচার্য বসুব্রত বলেন বটে…

ভদ্রাবতী নদীর ধারে শাল-পিয়াল-নক্তমাল বনে সে-বার ঘনঘোর বর্ষা নামল। সারা আকাশ জুড়ে কোন্ বিরহিণী সুরসুন্দরীর অযত্নবিন্যস্ত মেঘবরণ চুলের রাশ এলিয়ে দেওয়া,—প্রাবৃট-রজনীর ঘনান্ধকার তার প্রিয়হীন প্রাণের নিবিড় নির্জনতা, দূর বনের ঝ'ড়ো হাওয়ায় তার আকুল দীর্ঘশ্বাস, তারই প্রতীক্ষাশ্রান্ত আঁখি-দুটির অশ্রুভারে ঝরঝর অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণ, মেঘমেদুর আকাশের বুকে বিদ্যুৎচমক তার হতাশ প্রাণে ক্ষণিক আশার মেঘদূত!

আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে প্রদ্যুম্ন সুরদাসের সঙ্গে নদীর মাঠে গেল। তারা যখন সেখানে পৌঁছল, তখন মেঘ নেমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, চারিদিক তরল অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

প্রদ্যুম্ন সুরদাসের কথামত নদী থেকে স্নান করে এসে বস্ত্র পরিবর্তন করলে। সঙ্গীর ক্রিয়াকলাপে প্রদ্যুম্ন বুঝতে পারলে তিনি একজন তান্ত্রিক। তাদের বিহারে একজন ভিক্ষু ছিলেন, তিনি যোগাচার্য পদ্মসম্ভবের শিষ্য। সেই ভিক্ষুর কাছে তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের কথা কিছু কিছু সে শুনেছিল। সুরদাস অনেকগুলো রক্তজবার মালা সঙ্গে করে এনেছিলেন, তার মধ্যে কতকগুলো তিনি নিজে পরলেন, কতকগুলো প্রদ্যুম্নকে পরতে বললেন। ছোট মড়ার মাথার খুলিতে তেল সল্‌তে দিয়ে প্রদীপ জ্বাললেন। তাঁর পূজার আয়োজনে সাহায্য করতে করতে প্রদ্যুম্ন হাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাপারটার শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় দেখবার জন্যে তার মনে এত কৌতূহল হচ্ছিল যে, অন্ধকার রাতে একজন প্রায়-অপরিচিত তান্ত্রিকের সঙ্গে একা থাকবার ভয়ের দিকটা তার একেবারেই চোখে পড়ল না। অনেক রাত্রে হোম শেষ হল।

সুরদাস বললেন—প্রদ্যুম্ন, তুমি এবার তোমার কাজ আরম্ভ করো, আমার কাজ শেষ হয়েছে। খুব সাবধান, তোমার কৃতিত্বের ওপর এর সাফল্য নির্ভর করছে।

তাঁর চোখের কেমন একটা ক্ষুধিত দৃষ্টি যেন প্রদ্যুম্নের ভালো লাগল না।

তার পর সে বসে একমনে বাঁশিতে মেঘ-মল্লার আলাপ আরম্ভ করলে।

তখন আকাশ বাতাস নীরব। অন্ধকারে সামনের মাঠটায় কিছু দেখবার উপায় নেই। শাল-বনের ডালপালায় বাতাস লেগে এক রকম অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। বড় মাঠের পারে শালবনের কাছে দিক্‌চক্রবালের ধারে নৈশ প্রকৃতি পৃথিবীর বুকের অন্ধকার শষ্পশয্যায় তার অঞ্চল বিছিয়েছে। শুধু বিশ্রাম ছিল না ভদ্রাবতীর, সে কোন্ অনন্তের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দেবার আকুল আগ্রহে একটানা বয়ে চলেছে, মৃদু গুঞ্জনে আনন্দসঙ্গীত গাইতে গাইতে, কূলে তাল দিতে দিতে।

হঠাৎ সামনের মাঠটা থেকে সমস্ত অন্ধকার কেটে গিয়ে সারা মাঠটা তরল আলোকে প্লাবিত হয়ে গেল! প্রদ্যুম্ন সবিস্ময়ে দেখলে—মাঠের মাঝখানে শত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত অপরূপ আলোর মণ্ডলে কে এক জ্যোৎস্নাবরণী অনিন্দ্য-সুন্দরী মহিমময়ী তরুণী! তাঁর নিবিড় কৃষ্ণ কেশরাজি অযত্নবিন্যস্ত ভাবে তাঁর অপূর্ব গ্রীবাদেশের পাশ দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁর তুষারধবল বাহুবল্লী দিব্য পুষ্পাভরণে মণ্ডিত, তাঁর ক্ষীণ কটি নীল বসনের মধ্যে অর্ধ-লুক্কায়িত মণিমেখলায় দীপ্তিমান, তাঁর রক্তকমলের মত পা দুটিকে বুক পেতে নেবার জন্যে মাটিতে বাসন্তী পুষ্পের দল ফুটে উঠেছে···হাঁ, এই তো দেবী বাণী! এঁর বীণার মঙ্গল-ঝঙ্কারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌন্দর্যতৃষ্ণা সৃষ্টিমুখী হয়ে উঠেছে, এঁর আশীর্বাদে দিকে দিকে সত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এঁরই প্রাণের ভাণ্ডারে বিশ্বের সৌন্দর্যসম্ভার নিত্য অফুরন্ত রয়েছে, শাশ্বত এঁর মহিমা, অক্ষয় এঁর দান, চিরনূতন এঁর বাণী।

প্রদ্যুম্ন চেয়ে থাকতে থাকতে দেবীর মূর্তি অল্পে অল্পে মিলিয়ে গেল। জ্যোৎস্না আবার ম্লান হয়ে পড়ল, বাতাস আবার নিস্তেজ হয়ে বইতে লাগল।

অনেকক্ষণ প্রদ্যুম্নের কেমন একটা মোহের ভাব দূর হল না। সে যা দেখলে এ স্বপ্ন না সত্য? অবশেষে সুরদাসের কথায় তার চমক ভাঙল।

স্বরদাস বললেন—আমার এখনো কাজ আছে, তুমি ইচ্ছা করলে যেতে পার —কেমন, আমার কথা মিথ্যা নয় দেখলে ত ?

স্বরদাসের কথা কেমন অসংলগ্ন হতে লাগল, তাঁর মুখের দিকে চেয়ে প্রদ্যুম্ন দেখলে তাঁর চোখ দুটো অর্ধ-অন্ধকারের মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে যখন বিহারের দিকে রওনা হল, পূর্ণিমার চাঁদকে তখন মেঘে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। একটু একটু জ্যোৎস্না যা আছে, তা কেমন হলদে রঙের ; গ্রহণের সময় জ্যোৎস্নার এ রকম রঙ সে কয়েকবার দেখেছে।

মাঠ খুব বড়, পার হতে অনেকটা সময় লাগল। তার পর মাঠ ছাড়িয়ে বড় বনটা আরম্ভ হল। খুব ঘন বন, শাল দেবদারু গাছের ডালপালা নিবিড় হয়ে জড়াজড়ি করে আছে, মধ্যে অন্ধকারও খুব। পাছে রাত ভোর হয়ে যায়, এই ভয়ে সে খুব দ্রুতপদে যাচ্ছিল। যেতে যেতে তার চোখে পড়ল বনের মধ্যে এক স্থান দিয়ে যেন খানিকটা আলো বেরুচ্ছে। প্রথমে সে ভাবলে, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়ে থাকবে, কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখে সে বুঝলে যে, সে আলো জ্যোৎস্নার আলোর মতন নয়, বরং···কৌতূহল অত্যন্ত প্রবল হওয়াতে পথ ছেড়ে সে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। যে পিপ্পল গাছের সারির ফাঁক দিয়ে আলো আসছিল, তার কাছে গিয়ে গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে অবাক হয়ে প্রদ্যুম্ন দাঁড়িয়ে রইল।

একি ! এঁকেই ত সে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে, এই সেই অপরূপ সুন্দরী নারী ত !

অদ্ভুত ! সে দেখলে, যাঁকে এইমাত্র মাঠের মধ্যে দেখেছে সেই অপরূপ দ্যুতিশালিনী নারী বনের মধ্যে চারিধারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ; জোনাকি-

পোকার হুল থেকে যেমন আলো বার হয় তাঁর সমস্ত অঙ্গ দিয়ে তেমনি একরকম স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো বেরুচ্ছে, অনেকদূর পর্যন্ত বন সে আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; আর একটু নিকটে গিয়ে সে লক্ষ্য করলে, তাঁর আয়ত চক্ষু দুটি অর্ধ-নিমীলিত, যেন কেমন নেশার ঘোরে তিনি চারিপাশে হাতড়ে পার হবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কিন্তু তা না পেয়ে পিপ্পল গাছগুলোর চারিধারে চক্রাকারে ঘুরছেন, তাঁর মুখশ্রী অত্যন্ত বিপন্নার মত।

প্রদ্যুম্নের হঠাৎ বড় ভয় হল ! সে ভাবলে, মাঠে সরস্বতী দেবীর দর্শন থেকে আর এ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া ভৌতিক, এই নিশীথরাত্রে শালের বনে নইলে একি কাণ্ড !

সে আর সেখানে মোটেই দাঁড়াল না। বন থেকে বার হয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে যখন সে বিহারের উদ্যানে এসে পৌছল, ম্লান চাঁদ তখন কুমারশ্রেণীর পাহাড়ের পিছনে অস্ত যাচ্ছে।

ভোর রাত্রে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সে স্বপ্ন দেখলে ভদ্রাবতীর গভীর কালো জলের তলায় রাতের অন্ধকারে কে এক দেবী পথ হারিয়ে ফেলেছেন ; তিনি যতই উপরে ওঠবার চেষ্টা পাচ্ছেন, জলের ঢেউ তাঁকে ততই বাধা দিচ্ছে, নদীর জলে তাঁর অঙ্গের জ্যোতি ততই নিবে আসছে, অন্ধকার ততই তাঁর চারিপাশে গাঢ় হয়ে আসছে, নদীর মাছগুলো তাঁর কোমল পা দুখানি ঠুক্‌রে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে···ব্যথিতদেহা, বিপন্না, বেপথুমতী দেবীর দুঃখ দেখে একটা বড় মাছ দাঁত বার করে হিংস্র হাসি হাসছে, মাছটার মুখ গায়ক স্থরদাসের মত।

প্রদ্যুম্ন ভোরে উঠেই আচার্য পূর্ণবর্ধনের কাছে গিয়ে স্থরদাসের সঙ্গে প্রথম দেখার দিন থেকে বড় রাত্রি পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে। আচার্য

পূর্ণবর্ধন বৌদ্ধ দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন, মঠের ভিক্ষুকদের মধ্যে তিনিই ছিলেন প্রাচীন ও বিজ্ঞ, এজন্য সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। তিনি সব শুনে বিস্মিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করলেন—একথা আগে জানাওনি কেন?

—তিনি নিষেধ করেছিলেন। আমি তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা—

—বুঝেছি। তবে এখন বলতে এসেছ কেন?

—এখন আমার মনে হচ্ছে আমি কার যেন কি অনিষ্ট করেছি।

পূর্ণবর্ধন একটুখানি কি ভাবলেন, তার পর বললেন—এই রকম একটা কিছু ঘটবে তা জানতাম। পদ্মসম্ভব আর তার কতকগুলো কাণ্ডজ্ঞানহীন তান্ত্রিক শিষ্য দেশের ধর্মকর্ম লোপ করতে বসেছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে এরা না করতে পারে এমন কোনো কাজই নেই,—আর আমি বেশ দেখছি প্রত্যুম্ন, যে, তোমার এই অবাধ্যতা ও অযথা কৌতুকপ্রিয়তাই তোমার সর্বনাশের মূল হবে। তুমি কাল রাত্রে অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছ, তুমি দেবী সরস্বতীকে বন্দিনী করবার সহায়তা করেছ।

এবার প্রত্যুম্নের বিস্মিত হবার পালা। তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বার হল না। পূর্ণবর্ধন বললেন—এই সব কুসংসর্গ থেকে দূরে রাখবার জন্যেই আমি বিহারের কোনো ছাত্রকে বিহারের বাইরে যাবার অনুমতি দিইনে। কিন্তু যাক্, তুমি ছেলেমানুষ, তোমারই বা দোষ কি। আচ্ছা, এই সুরদাসকে দেখতে কি রকম বল দেখি?

প্রত্যুম্ন সুরদাসের আকৃতি বর্ণনা করলে।

পূর্ণবর্ধন বললেন—আমি জানি। তুমি যাকে সুরদাস বলছ, তার নাম সুরদাসও নয় বা তার বাড়ি অবন্তীতেও নয়। সে হচ্ছে প্রসিদ্ধ কাপালিক গুণাঢ্য। কার্যসিদ্ধির জন্যে তোমার কাছে মিথ্যা নাম বলেছে।

প্রত্যুম্ন অধীরভাবে বলে উঠল—কিন্তু আপনি যে বলেছেন—

পূর্ণবর্ধন বললেন—সে ইতিহাস বলছি শোন। নদীর ধারে যে সরস্বতী-মন্দিরের ভগ্নস্তূপ আছে, ওটা হিন্দুদের একটা অত্যন্ত বিখ্যাত তীর্থস্থান। প্রায় দু' শত বৎসর পূর্বে একজন তরুণ গায়ক ওখানে থাকত, তখন মন্দিরের খুব সমৃদ্ধির অবস্থা ছিল না। কিন্তু প্রবাদ এই যে, সে গায়কটি মেঘ-মল্লারে এমন সিদ্ধ ছিল যে, আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাতে তার আলাপে মুগ্ধা হয়ে দেবী সরস্বতী স্বয়ং তার কাছে আবির্ভূতা হতেন। সেই থেকে ওই মন্দির এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। সে গায়ক মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধ গায়কে মল্লার আলাপ করলেই দেবী যেন কোন্ টানে তার কাছে এসে পড়েন। এই গুণাঢ্য একবার অবন্তীর প্রসিদ্ধ গায়ক সুরদাসের সঙ্গে ওই ঢিবিতে উপস্থিত ছিল। সুরদাস মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ ছিলেন তাঁর গানে নাকি সরস্বতী দেবী তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা হয়ে তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। সুরদাস প্রার্থনা করেন, তিনি যেন দেশের সঙ্গীততজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হন। সরস্বতী দেবী তাঁকে সেই বরই দেন। তার পর দেবী যখন গুণাঢ্যকে বর প্রার্থনার কথা বলেন, তখন সে দেবীর রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁকেই প্রার্থনা করে বসে। সরস্বতী দেবী বলেছিলেন, তাঁকে পাওয়া নির্গুণের কাজ নয়, সে নামে গুণাঢ্য হলেও কার্যত তার এমন কোনো কলাতেই নিপুণতা নেই যে তাঁকে পেতে পারে, কিন্তু সেজন্য অনেক জীবন ধরে সাধনার প্রয়োজন। সরস্বতী দেবী অন্তর্হিতা হবার পর মূর্খ গুণাঢ্যের মোহ আরো বেড়ে যায় আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দেবীর উপর তার অত্যন্ত রাগ হয়। সে তন্ত্রোক্ত মন্ত্রবলে দেবীকে বন্দিনী করবার জন্যে উপযুক্ত তান্ত্রিক গুরু খুঁজতে থাকে। আমি জানি সে এক সন্ন্যাসীর কাছে তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ নিত। সন্ন্যাসী কিছুদিন পরে তার তন্ত্রসাধনার হীন উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তাকে দূর করে দেন। এসব কথা এদেশের সকল প্রাচীন লোকেও জানেন। আমি অনেকদিন তার পর গুণাঢ্যের আর কোনো সংবাদ জানতাম না।

ভেবেছিলাম সে এদেশ থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু এখন তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে কাল রাত্রে সে কৃতকার্য হয়েছে বোধ হয়। এতদিন ঐ উদ্দেশ্যেই সে কোথাও তন্ত্রসাধনা করছিল। যাক্, তুমি এখনি গিয়ে সন্ধান করো মন্দিরে সে আছে কি না, থাকে যদি আমায় সংবাদ দিও।

প্রদ্যুম্ন সেখানে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। সে ছুটে গিয়ে বিহারের উদ্যানে পড়ল। তখন রোদ বেশ ফুটে উঠেছে, বিহারের পাঠার্থীদের সমবেত কণ্ঠের স্তোত্রগান তার কানে আসছিল—

যো ধম্মা হেতুপ্‌পভবা
তেসং হেতুং তথাগতো আহ,
তেসঞ্চ যে নিরোধো
এবং বদী মহাসমনো।

যেতে যেতে সে দেখলে—উদ্যানের এক প্রান্তে একটা বড় জামগাছের ছায়ায় চিত্রকর ভিক্ষু বসুব্রত হরিণচর্মের আসনে বসে বোধ হয় কি আঁকছেন, কিন্তু তাঁর মুখে অতৃপ্তি ও অসাফল্যের একটা চিহ্ন আঁকা।

প্রদ্যুম্ন যা ভেবেছিল তাই ঘটল। মন্দিরে গিয়ে সে দেখলে—সেখানে কেউ নেই, গুণাঢ্য তো নেইই, সেই আজীবক-সন্ন্যাসী পর্যন্তও নেই! দু'-একটা যবাগূপানের ঘট, আগুন জ্বালাবার জন্য সংগৃহীত কিছু শুক্‌নো কাঠ মন্দিরের মধ্যে এদিকে ওদিকে ছড়ানো পড়ে আছে।

সেইদিন গভীর রাত্রে প্রদ্যুম্ন কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি বিহার পরিত্যাগ করলে।

তার পর এক বৎসর কেটে গিয়েছে।

বিহার পরিত্যাগ করবার পর প্রদ্যুম্ন একবার কেবল সুনন্দার সঙ্গে

সাক্ষাৎ করে বলেছিল সে বিশেষ কোনো কাজে বিদেশ যাচ্ছে, শীঘ্রই ফিরে আসবে। এই এক বৎসর সে কাশী, উত্তর কোশল ও মগধের সমস্ত স্থান খুঁজেছে, কোথাও গুণাঢ্যের সন্ধান পায়নি।

তবে বেড়াতে বেড়াতে কতকগুলি কৌতূহলজনক কথা তার কানে গিয়েছে।

মগধের প্রসিদ্ধ ভাস্কর মিহিরগুপ্ত রাজার আদেশ মত ভগবান্ তথাগতের মূর্তি তৈরি করতে আদিষ্ট হয়েছিলেন। এক বৎসর পরিশ্রম করে তিনি যে মূর্তি গড়ে তুলেছেন, তার মুখশ্রী এমন রূঢ় ও ভাবহীন হয়েছে যে তা বুদ্ধের মূর্তি কি মগধের দুর্দান্ত দস্যু দমনকের মূর্তি, তা সেদেশের লোক ঠিক বুঝতে পারছে না।

তক্ষশিলার বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত যমুনাচার্য মীমাংসা-দর্শনের ভাষ্য প্রণয়ন করতে নিযুক্ত ছিলেন, হঠাৎ তাঁর নাকি এমন দুর্দশা ঘটেছে যে তিনি আর সূত্রের অর্থ করে উঠতে না পেরে আবার বৈদিক ব্যাকরণের সুবন্ত প্রকরণ থেকে পড়তে আরম্ভ করেছেন।

মহাকোট্‌ঠি বিহারের চিত্রবিদ্যা-শিক্ষক ভিক্ষু বসুব্রত 'বুদ্ধ ও সুজাতা' নামক তাঁর চিত্রখানা বৎসরাবধি চেষ্টা করেও মনের মত করে এঁকে উঠতে না পেরে বিরক্ত হয়ে ওদিক একেবারে ছেড়ে দিয়ে সম্প্রতি নাকি শাকুন-শাস্ত্রের চর্চায় অত্যন্ত উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

একদিন প্রদ্যুম্ন সন্ধান পেলে উরুবিল্ব গ্রামের কাছে একটা নির্জন স্থানে একজন গো-চিকিৎসক এসে বাস করছেন। তাঁর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে সুরদাসের আকৃতির অনেকটা মিল হল। তখনি সে গ্রামে গিয়ে অনেককে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু গো-চিকিৎসকের সন্ধান কেউ দিতে পারলে না।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে অবসন্ন অবস্থায় উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তে একটা বড় বটগাছের ছায়ায় সে বসেছে। সন্ধ্যা তখনো নামেনি, ঝিরঝিরে বাতাসে

গাছের পাতাগুলো নাচছে, পাশের মাঠে পাকা শস্যের শীষগুলো সোনার মত চিক্‌মিক্ করছে, একটু দূরে একটা ডোবার মত জলাশয়ে বিস্তর কুমুদ ফুল ফুটে আছে, অনেক বন্যহংস তার জলে খেলা করছে।

সামনে একটু দূরে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরনা। পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় ঝরনার জল খানিকটা আটকে গিয়ে ওই ডোবার মত জলশয়টা তৈরি করেছে। প্রদ্যুম্নের হঠাৎ চোখে পড়ল পাহাড়ের গা বেয়ে ধাপে ধাপে ঘটকক্ষে এক স্ত্রীলোক নেমে আসছেন।

দেখে' তার মনে কেমন সন্দেহ হওয়াতে সে এগিয়ে গেল। ডোবার এদিকের উঁচু পাড়ে গিয়ে দেখে' তার মাথাটা যেন ঘুরে উঠল—এই ত! এই ত তিনি! ভদ্রাবতীর তীরের শালবনে ইনিই ত পথ হারিয়ে ঘুরছিলেন, মাঠের মধ্যে জ্যোৎস্নারাতে এঁকেই ত সে দেখেছিল—তবে তাঁর অঙ্গের সে জ্যোতির এক কণাও আর নেই, পরনে অতি মলিন এক বস্ত্র। কিন্তু সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সুন্দর গঠন!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে' তার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, এই তিনি। তার মনের মধ্যে গোলমাল বেধে গেল। সে উত্তেজনার মাথায় বিহার ছেড়ে সুরদাসের খোঁজ করে বেড়াচ্ছিল বটে, কিন্তু দেখা পেলে কি করবে তা সে ভাবেনি। কাজেই সে একরকম লুকিয়েই সেখান থেকে চলে এল।

রোজ রোজ সন্ধ্যায় প্রদ্যুম্ন এসে বটগাছটার তলায় বসে। রোজ সন্ধ্যার আগে দেবী পাহাড়ের গায়ের পথ বেয়ে নেমে আসেন আবার সন্ধ্যার সময় ঘটকক্ষে ধাপে ধাপে উঠে চলে যান—সে রোজ বসে দেখে।

এই রকম কিছুদিন কেটে গেল। একদিন প্রদ্যুম্ন মাঠের গাছতলায় চুপ করে বসে আছে, সেই সময়ে দেবী জলাশয়ে নামলেন। সেও কি ভেবে

ডোবার এদিকের পাড়ের দিকে দাঁড়াল—দেখলে দেবী ঘট নামিয়ে রেখে কুমুদ ফুল সংগ্রহে বড় ব্যস্ত। একটা বড় ফুল জলাশয়ের এপারের দিকে এগিয়ে বেশি জলে ফুটেছিল, তিনি সেটা সংগ্রহের জন্যে খানিকটা বৃথা চেষ্টা করবার পর চোখ তুলে অপর পারে প্রদ্যুম্নকে দেখতে পেয়ে হঠাৎ একটু অপ্রতিভের হাসি হাসলেন—তার পর হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে বললেন—ফুলটা আমায় তুলে দেবে?

—দিই, যদি আপনি এক কাজ করেন।

—কি, বলো?

—আমায় কিছু খেতে দেবেন? আমি সমস্ত দিন কিছু খাইনি।

দেবীর মুখে ব্যথার চিহ্ন দেখা দিল। বললেন—আহা! তা এতক্ষণ বলনি কেন?—এপারে এস, থাক্‌গে ফুল।

প্রদ্যুম্ন জলে নেমে ফুলটা সংগ্রহ করে ওপারে গেল।

দেবী বললেন—তুমি মাঠের মাঝের ওই বড় গাছটার তলায় রোজ বসে থাক, না?

প্রদ্যুম্ন তাঁর হাতে ফুলটা দিয়ে বললে—হ্যাঁ, আমিও দেখি আপনি সন্ধ্যার সময় রোজই জল নিতে আসেন।

দেবী হাসিমুখে বললেন—ওই পাহাড়ের ওপরই আমাদের ঘর—এস তুমি আমার সঙ্গে—তোমায় খেতে দিইগে।

হঠাৎ দেবী যেন কেমন একপ্রকার বিহ্বল-চোখে চারিদিকে চাইলেন। তার পর পাহাড়ের গায়ের কাটা ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলেন, প্রদ্যুম্ন পিছনে পিছনে চলল। পাহাড়ের উপর উঠে গিয়ে—একটু দূরে বুনো বাঁশঝাড়ের আড়ালে একটা ছোট কুটীর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেবী বন্ধ দুয়ার খুলে ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রদ্যুম্নকে বললেন—এস।

প্রদ্যুম্ন দেখলে কুটিরে কেউ নেই, জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি এখানে

একা থাকেন ?

দেবী বললেন—না। এক সন্ন্যাসী আমায় এখানে সঙ্গে করে এনেছেন, তিনি কি করেন জানিনে, কিন্তু মাঝে মাঝে এখান থেকে চলে যান, পাঁচ ছ'দিন পরে আসেন। তুমি এখানে ব'সো।

দেবী মাটির ঘট পূর্ণ করে তাকে যবাগূ্ পান করিতে দিলেন, স্বাদ অমৃতের মত ; এমন সুস্বাদু যবাগূ্ সে পূর্বে কখনো পান করেনি।

প্রত্যুম্নের মনে হল যদি আচার্য পূর্ণবর্ধনের কথা সত্য হয়, আর যদি সে স্বচক্ষে যা দেখেছে তা ইন্দ্রজাল না হয়, তবে এই ত দেবী সরস্বতী তার সামনে। তার জানবার কৌতূহল হল ইনি নিজের সম্বন্ধে কি বলেন।

সে জিজ্ঞাসা করলে—আপনারা এর আগে কোথায় ছিলেন ? আপনার দেশ কোথা ?

দেবী কাঠের বড় পাত্রে সযত্নে সূপ ও অন্ন পরিবেষণে ব্যস্ত ছিলেন, প্রশ্ন শুনে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি প্রত্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—আমার কথা বলছ ? আমার দেশ কোথায় জানিনে। আমি নাকি বিদিশার পথের ধারে এক ভাঙা মন্দিরে অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলাম, সন্ন্যাসী আমায় এখানে উঠিয়ে এনেছেন। সেই থেকে এখানেই আছি—তার আগে কোথায় ছিলাম তা আমার মনে পড়ে না।

তিনি অন্যমনস্কভাবে বাইরে সাঁঝের রক্তিম আকাশে, যেখানে উরুবিল্ব গ্রামের প্রান্তরে বনরেখার মাথায় সূর্য হেলে পড়েছেন, সেই দিকে চেয়ে রইলেন—চেয়ে চেয়ে কি মনে আনবার চেষ্টা করলেন, বোধ হয় মনে এল না। হঠাৎ কি ভেবে তাঁর পদ্মের পাপড়ির মত চোখ দুটি বেয়ে ঝর্‌ঝর্ করে জল ঝরে পড়ল।

তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছে তিনি প্রত্যুম্নের সামনে অন্নে-পূর্ণ কাঠের থালা রাখলেন। বললেন—খাবার জিনিস কিছুই নেই। তুমি রাত্রে এখানে

থাকো, আমি পদ্মের বীজ শুকিয়ে রেখেছি, তাই দিয়ে রাত্রে পায়স তৈরি করে খেতে দেব। সকালে যেও।

প্রদ্যুম্নের চোখে জল আসছিল ;...ওগো বিশ্বের আত্মবিস্মৃতা সৌন্দর্যলক্ষ্মী, বিদিশার মহারাজের আর মহাশ্রেষ্ঠীর সমবেত রত্নভাণ্ডার তোমার পায়ের এককণা ধূলারও যোগ্য নয়, সে-দেশের পথের ধূলো এমন কি পুণ্য করেছে মা যে, তুমি সেখানে পড়ে থাকতে যাবে ?

খাওয়া শেষ হলে প্রদ্যুম্ন বিদায় চাইলে।

দেবীর চোখে হতাশার দৃষ্টি ফুটে উঠল, বললেন—থাকো না কেন রাত্রে! আমি রাত্রে পায়স রেঁধে দেব।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—আপনার এখানে একা রাত্রে থাকতে ভয় করে না ?

—খুব ভয় করে। ওই বেতের বনে অন্ধকারে কি যেন নড়ে, ভয়ে আমি দোর খুলতে পারিনে। ঘুম হয় না, সমস্ত রাত বসেই থাকি।

প্রদ্যুম্নের হাসি পেল, ভাবলে, রাত্রে একা থাকতে ভয় করে বলে পায়সের লোভ দেখিয়ে দেবী তাকে সঙ্গে রাখতে চান। সে বললে- আচ্ছা, রাত্রে থাকব।

দেবীর মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হল।

সমস্ত রাত সে কুটীরের বাইরে খোলা হাওয়ায় বসে কাটালে। দেবীও কাছে বসে রইলেন। বললেন—এমন জ্যোৎস্না, আমি কিন্তু ভয়ে বাইরে আসতে পারিনে, ঘরের মধ্যে বসে রাত কাটাই।

দেবীর ব্যাপার দেখে প্রদ্যুম্ন অবাক হয়ে গিয়েছিল। হলেই বা মন্ত্রশক্তি, কিন্তু এতটা আত্মবিস্মৃত হওয়া, এ যে তার কল্পনার বাইরের জিনিস।

নানা গল্পে সমস্ত রাত কাটল, ভোর হলে সে বিদায় চাইলে।

দেবী বলে দিলেন—সন্ন্যাসী এলে একদিন আবার এস।

সেইদিন থেকে প্রতিরাত্রে সে দেবীর অলক্ষিতে পাহাড়ের নীচে বসে কুটীরের দিকে চেয়ে পাহারা রাখত। তার তরুণ বীর হৃদয় এক ভীরু নারীকে একা বনের মধ্যে ফেলে রাখার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ তুলেছিল।

দশ-পনের দিন কেটে গেল।

এক-একদিন প্রদ্যুম্ন শুনত, দেবী অনেক রাত্রে একা গান করছেন—সে গান পৃথিবীর মানুষের গান নয়, সে গান প্রাণ-ধারার আদিম ঝরনার গান, সৃষ্টিমুখী নীহারিকাদের গান, অনন্ত আকাশে দিক্‌হারা কোন্ পথিক তারার গান।

একদিন দুপুরবেলা কে তাকে বললে—তুমি যে গো-বৈদ্যের কথা বলছিলে, তাকে এইমাত্র দেখে এলাম, পথের ধারে পুকুরে স্নান করছে।

শুনে ছুটতে ছুটতে গিয়ে সে পুকুরের ধারে উপস্থিত হল। দেখলে, সত্যই গুণাঢ্য পুকুরের ধারে বস্ত্রাদির পুঁটুলি নামিয়ে রেখে পুকুরে স্নান করতে নেমেছেন! সে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরে গুণাঢ্য বস্ত্র পরিবর্তন করে উপরে উঠে প্রদ্যুম্নকে দেখে কেমন যেন হয়ে গেলেন। বললেন—তুমি এখানে?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমি এখানে কেন তা বুঝতে পারেননি?

গুণাঢ্য বললেন—তুমি এখন বলছ বলে নয় প্রদ্যুম্ন, আমি একাজ করবার পর যথেষ্ট অনুতপ্ত আছি। প্রতি রাত্রে ভয়ানক স্বপ্ন দেখি—কারা যেন বলছে, তুই যে কাজ করেছিস এর শাস্তি অনন্ত নরক। আমি এইজন্যেই আজ এক পক্ষের ওপর আমার গুরু সেই আজীবক সন্ন্যাসীর কাছে গিয়েছিলাম। তাঁরই কাছে এ বশীকরণ-মন্ত্র আমি শিক্ষা করি; এর এমনি শক্তি যে, ইচ্ছা করলে আমি যাকে ইচ্ছা বাঁধতে পারি, কিন্তু আনতে পারিনে। মন্ত্রের বন্ধনের শক্তি

থাকলেও আকর্ষণী শক্তি নেই। এইজন্য আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়েছিলুম; আমি নিজে সঙ্গীতের কিছুই জানিনে যে তা নয়, কিন্তু আমি জানতাম যে তুমি মেঘ-মল্লারে সিদ্ধ, তোমার গানে দেবী ওখানে আসবেনই, এলে তার পর মন্ত্রে বাঁধব। এর আগে আমার বিশ্বাসই ছিল না যে এমন একটা ব্যাপার হওয়া সম্ভব। অনেকটা মন্ত্রের গুণ পরীক্ষা করবার কৌতূহলেই আমি এ কাজ করি।

প্রদ্যুম্ন বললে—এখন ?

গুণাঢ্য বললেন—এখন আমার গুরুর কাছ থেকেই আসছি। তিনি সব শুনে একটা মন্ত্র শিক্ষা দিয়েছেন, এটা পূর্ব মন্ত্রের বিরোধী শক্তি সম্পন্ন। সেই মন্ত্রপূত জল দেবীর গায়ে ছড়িয়ে দিলে তিনি আবার মুক্ত হবেন বটে, কিন্তু তার কোনো উপায় নেই।

প্রদ্যুম্ন জিজ্ঞাসা করলে—উপায় নেই কেন ?

—যে ছিটিয়ে দেবে, সে চিরকালের জন্য পাষাণ হয়ে যাবে। আমার পক্ষে দু'দিকই যখন সমান, তখন তাঁকে বন্দিনী রাখাই আমার ভালো। রাগ কোরো না প্রদ্যুম্ন, ভেবে দেখ মৃত্যুর পর হয়ত পরজগৎ আছে কিন্তু পাষাণ হওয়ার পর ?—তা আমি পারব না।

আত্মবিস্মৃতা বন্দিনী দেবীর চোখ দুটির করুণ অসহায় দৃষ্টি প্রদ্যুম্নের মনে এল। যদি তা না হয় তা হলে তাঁকে যে চিরদিন বন্দিনী থাকতে হবে!

যুগে যুগে যে উদার উচ্চ প্রেরণা আগে এসে তরুণদের নির্মল প্রাণে পৌঁছয়, আজও প্রদ্যুম্নের প্রাণের বেলায় তার ঢেউ এসে লাগল। সে ভাবলে —একটা জীবন তুচ্ছ, তাঁর রাঙা পা দুখানিতে একটা কাঁটা ফুটলে তা তুলে দেবার জন্যে আমি শতবার জীবন দিতে প্রস্তুত।

হঠাৎ গুণাঢ্যের দিকে চেয়ে সে বললে—চলুন আপনার সঙ্গে যাব। আমায় সে মন্ত্রপূত জল দেবেন।

গুণাঢ্য বিস্ময়ে প্রদ্যুম্নের দিকে চেয়ে বললেন—বেশ করে ভেবে দেখ। এ ছেলেখেলা নয়। এ কাজ—

প্রদ্যুম্ন বললে—চলুন আপনি।

তারা যখন কুটীরের নিকটবর্তী হল তখন গুণাঢ্য বললেন—প্রদ্যুম্ন, আর একবার ভালো করে ভেবে দেখ, কোনো মিথ্যা আশায় ভুলো না। এ থেকে তোমায় উদ্ধার করবার ক্ষমতা কারুর হবে না—দেবীরও না। মন্ত্রবলে তোমার প্রাণশক্তি চিরকালের জন্য জড় হয়ে যাবে; বেশ বুঝে দেখ। মন্ত্রশক্তি নির্মম আমোঘ, কাউকে রেহাই দেবে না।

প্রদ্যুম্ন বললে—আপনি কি ভাবেন আমি কিছু গ্রাহ্য করি?—কিছু না, চলুন।

কুটীরে তারা যখন গিয়ে উপস্থিত হল তখন রোদ বেশ পড়ে এসেছে। দেবী কুটীরের বাইরে ঘাসের উপর অন্যমনস্কভাবে চুপ করে বসে ছিলেন—প্রদ্যুম্নকে আসতে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, হাসিমুখে বললেন—এস, এস। আমি তোমার কথা প্রায়ই ভাবি। তোমায় সেদিন কিছু খেতে দিতে না পেরে আমার মন খুবই খারাপ হয়েছিল। এখন তুমি এখানে কিছু-দিন থাকো। তার পর তিনি দু'জনকে খেতে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে কুটীরের মধ্যে চলে গেলেন।

প্রদ্যুম্ন বললে—কই, আমার সে মন্ত্রপূত জল দিন্ তবে?

গুণাঢ্য বললেন—সত্যই তা হলে তুমি এতে প্রস্তুত?

প্রদ্যুম্ন বললে—আমায় আর কিছু বলবেন না, জল দিন্।

দেবী কুটীরের মধ্যে আহারের স্থান করে দু'জনকে খেতে দিলেন—আহারাদি যখন শেষ হল, তখন সন্ধ্যার আর বেশি দেরী নেই। বেতসবনে ছায়া নেমে আসছে, রাঙা সূর্য আবার উরুবিল্ব গ্রামের উপর ঝুলে পড়েছে।

গোধূলির আলোয় দেবীর মুখপদ্মে অপরূপ শ্রী ফুটে উঠল।

তার পর তিনি ঘট-কক্ষে প্রতিদিনের মত নীচের ঝরনায় জল আনতে নেমে গেলেন।

গুণাঢ্য বললেন—আমি এখান থেকে আগে চলে যাই, তার পর এই ঘটপূর্ণ জল দেবীর গায়ে ছিটিয়ে দিও।

তাঁর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হল। আবেগভরে তিনি প্রত্যুম্নকে আলিঙ্গন করে বললেন—আমি কাপুরুষ, আমার সে সাহস নেই, নইলে—

তিনি কুটীর-মধ্যে তাঁর দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে নিলেন। তার পর সরু পথ বেয়ে বেত-বনের ধার দিয়ে পাহাড়ের অপর পারে চলে গেলেন, তারই নীচে একটু দূরে মগধ থেকে বিদিশা যাওয়ার রাজবর্ত্ম।

প্রত্যুম্ন চারিদিক চেয়ে বসে বসে ভাবলে—ঐ নীল আকাশের তলে বিশ বৎসর আগে সে মায়ের কোলে জন্মেছিল, তার সে মা বারাণসীতে তাদের গৃহটিতে বসে বাতায়ন-পথে সন্ধ্যার আকাশের দিকে চেয়ে হয়ত প্রবাসী পুত্রের কথা ভাবছেন—মায়ের মুখখানি একবারটি শেষবারের জন্যে দেখতে তার প্রাণ আকুল হয়ে উঠল। ঐ পূব আকাশে নবমীর চাঁদ কেন উজ্জ্বল হয়েছে? মগধ যাবার রাজপথের গাছের সারির মাথায় একটা তারা ফুটে উঠল, বেত-বনের বেতডাঁটাগুলো তরল অন্ধকারে আর ভালো দেখা যায় না।

প্রত্যুম্নের চোখ হঠাৎ অশ্রুপূর্ণ হল।

সেই সময় সে দেখলে—দেবী জল নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠে আসছেন। মন্ত্রপূত জলপূর্ণ ঘট সে মাটিতে নামিয়ে রেখেছিল; দেবীকে আসতে দেখে সে তা হাতে তুলে নিলে।

দেবী কুটীরের সামনে এলেন, তাঁর হাতে অনেকগুলো আধফোটা কুমুদ ফুল।

প্রত্যুম্নকে জিজ্ঞাসা করলেন—সন্ন্যাসী কোথায়?

প্রত্যুম্ন বললে—তিনি আবার কোথায় চলে গেলেন। আজ আর আসবেন না।

তার পর সে গিয়ে দেবীর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললে—মা, না জেনে তোমার ওপর অত্যন্ত অন্যায় আমি করেছিলাম, আজ তারই শাস্তি আমাকে নিতে হবে। কিন্তু আমি তার জন্য এতটুকু দুঃখিত নই। যতক্ষণ জ্ঞান লুপ্ত না হয়ে যায়, ততক্ষণ এই ভেবে আমার সুখ যে, বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে অন্যায় বাঁধন থেকে মুক্ত করার অধিকার আমি পেয়েছি।

দেবী বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রত্যুম্নের দিকে চেয়ে রইলেন।

প্রত্যুম্ন বললে—শুনুন, আপনি বেশ করে মনে করে দেখুন দেখি, আপনি কোথা থেকে এসেছিলেন?

দেবী বললেন—কেন, আমি ত বিদিশার পথের ধারে—

প্রত্যুম্ন এক অঞ্জলি জল তাঁর সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিলে।

সদ্যোনিদ্রোত্থিতের মত দেবী যেন চমকে উঠলেন…

প্রত্যুম্ন দৃঢ় হস্তে আর-এক অঞ্জলি জল দেবীর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিলে। নিমেষের জন্যে তার চোখের সামনে বাতাসে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ প্রসন্ন হিল্লোল বয়ে গেল। তার সারা দেহমন আনন্দে শিউরে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে তার মনে এল—বারাণসীতে তাদের গৃহে সন্ধ্যার আকাশে বদ্ধ-আঁখি বাতায়নপথ-বর্তিনী তার মা!

কুমারশ্রেণীর বিহারে আচার্য শীলব্রতের কাছে একটি মেয়ে অল্প বয়সে দীক্ষা গ্রহণ করে। তার নাম সুনন্দা, সে হিরণ্যনগরের ধনবান্ শ্রেষ্ঠী সুমন্ত-দাসের মেয়ে। পিতামাতার অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মেয়েটি নাকি বিবাহ করতে সম্মত হয়নি। অত্যন্ত তরুণ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় সে বিহারের

সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে উঠেছিল। সেখানে কিন্তু কারো সঙ্গে সে তেমন মিশত না, সর্বদাই নিজের কাজে সময় কাটাত আর সর্বদাই কেমন অন্যমনস্ক থাকত।

জ্যোৎস্নারাত্রে বিহারের নির্জন পাষাণ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আপন মনে প্রায়ই কি ভাবত, মাঠের জ্যোৎস্নাজাল কাটিয়ে অনেক রাতে কাউকে বিহারের দিকে আসতে দেখলে সে একদৃষ্টে সেদিকে চেয়ে থাকত, যেন কতদিন আগে তার প্রিয় আবার আসবে বলে চলে গিয়েছিল, তারই আসবার দিন গুনে গুনে এ শ্রান্ত শান্ত ধীর পথ-চাওয়া···প্রতি সকালে সে কার প্রতীক্ষায় উন্মুখী হয়ে রইত, সকাল কেটে গেলে ভাবত বিকালে আসবে, বিকাল কেটে গেলে ভাবত সন্ধ্যায় আসবে—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এ রকম কত সকাল-সন্ধ্যা কেটে গেল—কেউ এল না···তবু মেয়েটি ভাবত আসবে···আসবে, কাল আসবে···পাতার শব্দে চমকে উঠে চেয়ে দেখত—এতদিনে বুঝি এল!

এক এক রাত্রে সে বড় অদ্ভুত স্বপ্ন দেখত। কোথাকার যেন কোন্ এক পাহাড়ের ঘন বেতের জঙ্গল আর বাঁশের বনের মধ্যে লুকানো এক অর্ধভগ্ন পাষাণমূর্তি। নিঝুম রাতে সে পাহাড়ের বেতগাছ হাওয়ায় দুলছে, বাঁশবনে শির্‌শির্ শব্দ হচ্ছে, দীর্ঘ দীর্ঘ বেতডাঁটার ছায়ায় পাষাণমূর্তিটার মুখ ঢাকা পড়ে গেছে। সে অন্ধকার অর্ধরাত্রে জনহীন পাহাড়টার বাঁশগুলোর মধ্যে ঝোড়ো হাওয়া ঢুকে কেবলই বাজছে মেঘ-মল্লার!···

ভোরে উঠে রাতের স্বপ্ন দেখে আশ্চর্য হয়ে যেত—কোথায় পাহাড়, কোথায় বেতবন, কার ভাঙা মূর্তি, কিসের এসব অর্থহীন দুঃস্বপ্ন!···

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মাত্র কয়েক বৎসর আগে কোনো একটি সাময়িক পত্রে যখন 'উপনিবেশ' বেরোতে শুরু হয় তখন সহসা বাঙালী পাঠক সচেতন হয়ে উঠে লেখকের নামটি লক্ষ্য করেন। নারায়ণ-বাবু বরিশালে বাল্যকাল কাটিয়ে অধ্যাপক হয়ে যান জলপাইগুড়িতে।—এই দুটি স্থানের অপূর্ব ভূমিপ্রকৃতি এঁর অধিকাংশ কাহিনীর পটভূমিকা হয়ে আছে। প্রধানত এঁর সাবলীল অথচ বলিষ্ঠ ভাষাই এঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। বীতংস, স্বর্ণসীতা, সূর্যসারথি, জন্মান্তর, উপনিবেশ প্রভৃতি এঁর গ্রন্থের মধ্যে সমধিক বিখ্যাত। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। বয়সে তরুণ, মিষ্টভাষী ও প্রিয়দর্শন এই লেখকটি অল্পদিনেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিজের একটি স্থান করে নিয়েছেন।

একটি শত্রুর কাহিনী

বড় পাদ্রী ডোনাল্ড্‌স্‌ বুড়ো হয়ে গেছেন। চুল পেকেছে, দাড়ির রঙ হয়েছে ধবধবে সাদা। আগে তিরিশ মাইল টাট্টু হাঁকাতেও কষ্ট হত না, আজকাল দু'পা হাঁটলেই হাঁপিয়ে পড়েন। একবার শহরে গিয়ে সিভিল্‌ সার্জনকেও দেখিয়ে এসেছেন। ডাক্তার বলেছেন, ব্লাড প্রেশারের লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, সুতরাং সতর্ক হওয়া দরকার।

সতর্ক হওয়া দরকার তো বটে, কিন্তু সুযোগ কই? এ দেশটাই যে সৃষ্টি-ছাড়া। দশ মাইলের ভেতরে রেল লাইনের কোনো বালাই নেই। আর শুধু রেল লাইন কেন, পথঘাটের অবস্থাও তথৈবচ। মাইল আষ্টেক দূর দিয়ে জেলাবোর্ডের একটা রাস্তা চলে গেছে; বোধ হয় ইংরেজ শাসনের প্রথম পত্তনের যুগে ওই রাস্তা তৈরি করা হয়েছিল, তার পরে ওর গায়ে কেউ আর

হাত দেয়নি। দু'পাশ দিয়ে রাস্তা ভেঙে নেমে গেছে, গোরুর গাড়ির অনুগ্রহে একেবারে সহস্রদীর্ণ। গরমের সময় চলতে গেলে পায়ে পায়ে হোঁচট লাগে, ধূলোয় একেবারে কোমর অবধি গেরুয়া রঙ ধরে যায়; আর বর্ষাকালে মহাপঙ্ক —হাতীর পা ডুবলে টেনে তুলতে পারে না।

তা ছাড়া মাঠ আর মাঠ। দু এক ফালি ফসলের ক্ষেত, বাকি সবটাই বন্ধ্যা—অহল্যা পৃথিবীতে লাঙলের আঁচড় পড়ে না—পাষাণমূর্তি পড়ে আছে হতচেতন হয়ে। তারি ভেতরে পায়ে পায়ে কতকগুলো লিক্‌লিকে পথের রেখা পড়েছে—এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে কি পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই মাধ্যাকর্ষণ।

অথচ এই সব পথ ভেঙেই যাতায়াত করতে হবে। ভৌগোলিক শৃঙ্খলার কোনো বালাই নেই এ অঞ্চলে—টুকরো টুকরো এক একটা গ্রামের মধ্যে অসঙ্গত ব্যবধান; সেই ব্যবধানকে আরো দুর্গম করেছে এবড়ো-খেবড়ো জমি, টিলা, বিল, জলা, জঙ্গল আর অজস্র বিষাক্ত সাপ।

কিন্তু জ্ঞানের আলোয় অন্তর যার বিভাসিত হয়ে গেছে, এবং এই জ্ঞানের পুণ্য কিরণ বিতরণ করাই যার ব্রত, তার এসবকে কিছুমাত্র পরোয়া করলে চলে না। এতকাল ডোনাল্ড্‌স্‌ও করেন নি। তখন মুখের চাপদাড়ির রঙ ছিল কুচকুচে কালো; মেরুদণ্ডটা ছিল লোহার ডাণ্ডার মতো, ওজন ছিল দুশো পাউণ্ডের ওপরে, ধৈর্য ছিল অমানুষিক এবং গলার জোর ছিল অসাধারণ। হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন তিনি সুরু করতেন, "এই যে মহাপ্রলয় আসিল, পৃথিবী জলে ডুবিয়া গেল, ঘন ঘন বজ্র পড়িল ও সর্বনাশ হইল", তখন সে কণ্ঠস্বরে হাটের বিপুল হট্টগোল পর্যন্ত চাপা পড়ে যেত। মুহূর্তে তাঁর চারিদিকে ভিড় জমে উঠত, নগদ এক পয়সা মূল্যে মথি ও লুক লিখিত সুসমাচার কেনবার জন্যে হুড়োহুড়ি লেগে যেত তাঁর ক্রেতাদের ভেতরে।

সে ডোনাল্ড্‌স্‌ এখন অতীত বস্তু। এই কুড়ি বছরে গরম দেশের গরম

বাতাস আর রুক্ষ রাঙা মাটি তাঁর বয়স চল্লিশ বছর বাড়িয়ে দিয়েছে। এখন দু পা হাঁটলেই তাঁর বুক ধড়ফড় করে—হাটে হাটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে অবিশ্বাসীদের আলোর রাজ্যের দিকে আকৃষ্ট করা আর তাঁর সাধ্যায়ত্ত নয়। তা ছাড়া ব্লাড প্রেশারের আতঙ্কটা মনের মধ্যে সারাক্ষণ সজাগ হয়ে আছে, ওই অদৃশ্য শত্রুটির অলক্ষ্য মৃত্যুবাণের কথা ডোনাল্ড্‌স্‌ কোনো মুহূর্তেই ভুলতে পারেন না।

সুতরাং ঘটনাস্থলে হ্যান্‌সের আবির্ভাব হল।

জাতে জার্মান। সোনালি চুল, নিবিড় নীল চোখ ; দৈর্ঘ্যটা খাঁটি আর্য-জাতির পক্ষেও একটু অতিরিক্ত, তাই খানিকটা কুঁজো বলে মনে হয়, বয়েস তেইশ থেকে ছাব্বিশের মধ্যে, চঞ্চল, চটপটে, উৎসাহী। দেখলে পাদ্রী বলে ভাবতে ইচ্ছে করে না, মনে হয় ইউনিভার্সিটি ব্লু, খেলার মাঠ থেকে ধরে এনে পাদ্রী সাজিয়ে তাকে এই অজগর-বিজেবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সন্ন্যাসীর পোশাকটা তার একটা ছদ্মবেশ মাত্র, যে কোনো মুহূর্তে ওটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পরমানন্দে হো হো করে হেসে উঠতে পারে।

ডোনাল্ড্‌স্‌ তবু খুশি হলেন। বললেন, ইয়ং ম্যান, তোমাকে দিয়ে অনেক কাজ হবে বলে মনে হয়।

হ্যান্‌স্‌ অসংকোচে জবাব দিলে, আমারও তাই বিশ্বাস।

—তাই নাকি!—ডোনাল্ড্‌স্‌ হাসলেন : খুশি হলুম। তা দ্যাখো, এই পেগান আর হিদেনগুলোকে ম্যানেজ করা বড্ড শক্ত ব্যাপার। এই কুড়ি বছর চেষ্টা করেও আমি এগুলোকে মানুষ করতে পারলুম না। এবার তুমি চেষ্টা করো।

—সব ঠিক হয়ে যাবে, কিছু ভাববেন না—সোৎসাহে হ্যান্‌স্‌ উত্তর দিলে।

এতবড় মাঠের ভেতরে বেশির ভাগই মরা জমি। মাটিতে রাশি রাশি

কাঁকর। বর্ষায় প্রায় সমস্ত মাঠ ভেসে যায়, দু চারটে উঁচু ডাঙা আর তাদের কোনো কোনোটার ওপরে আধখানা সিকিখানা গ্রাম কচ্ছপের পিঠের মতো জেগে থাকে। দুর্গম এই খেয়ালী পৃথিবীর বেশির ভাগ বাসিন্দা হচ্ছে তুরী, মুণ্ডা, আর সাঁওতাল। যাযাবরের দল এসে মরা মাটিকে দখল করেছে—গড়েছে ছোট ছোট ক্ষেত-খামার আর নগণ্য সব লোকালয়। তাদেরই প্রেম-ধর্মে দীক্ষিত করবার জন্যে এখানে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের আবির্ভাব।

এই কুড়ি বছরে অবশ্য তাদের সকলেরই অন্ধকার থেকে আলোকে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। প্রথমত সকলের আত্মা থেকে শয়তানকে তাড়ানো সম্ভব নয়; দ্বিতীয়ত এই চালচুলোবিহীন লোকগুলোর মতিগতি বোঝা প্রেমময় পিতারও অসাধ্য, আজ এখানে আছে, কাল দল বেঁধে মাদলে ঘা দিয়ে বাঁশি বাজিয়ে কোথায় কে অদৃশ্য হল কেউ বলতে পারে না; আর তৃতীয়ত আজকে ব্যাপ্‌টাইজড্‌ হয়ে কালকেই পরমোল্লাসে বোঙ্গার পূজো করতে এদের নীতিজ্ঞান আর্তনাদ করে ওঠে না। তাই কাজের কখনোই বিরাম নেই।

তাছাড়া মরা মাটি বলেই মানুষের স্রোত মরা নয়। সে স্রোত অবিরাম গতিতে বয়ে চলেছে। তাই, আজ তিনঘর বাসিন্দা বাড়ি ভেঙে উধাও হয়ে গেল তো কালকেই পাঁচঘর নতুন পত্তনি করে বসল। খাজনার লোভে জমিদার হাত বাড়ালে একদিন এরাও হয়ত অদৃশ্য হয়ে যাবে, কিন্তু নতুনের আসবার বিরাম থাকবে না এবং কাজেও ছেদ পড়বে না কোনোদিন। সুতরাং কুড়ি বছর ধরে ডোনাল্ড্‌স্‌ নিত্য নতুন কর্মক্ষেত্র পেয়েছেন তাঁর—মরা জমিতে জীবন্ত মানুষের তরঙ্গ তাঁর চারদিকে প্রত্যেকদিন নতুন করে প্রতিহত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে এ জলের গায়ে ঘা দেবার মতো, একটুখানি ঢেউ উঠবে বটে, কিন্তু দাগ থাকবে না, এ চেষ্টার কোনো মূল্য নেই। আজ পর্যন্ত পঞ্চাশটির বেশি ছেলেকে আলোকমন্ত্রে দীক্ষিত করে

তিনি তাদের শহরের ইস্কুলে পাঠাতে পারেননি ; কিন্তু মিশনারীর ধৈর্যচ্যুত হতে নেই, অপেক্ষা করো সুফল ফলবেই এ তাঁদের মূলমন্ত্র।

তোমার পতাকা যারে দাও—। ডোনাল্ড্সের অসমাপ্ত কাজের বোঝা সুতরাং হ্যান্স্কে ঘাড়ে তুলে নিতে হল। তারপর যথানিয়মে একদিন তেঠেঙে টাট্টুতে আরোহণ করে হ্যান্স্ বেরুল ধর্মপ্রচার করতে। তার পথিপ্রদর্শক হল ভূতপূর্ব ডোঙা সাঁওতাল, বর্তমানে জোসেফ ইম্যানুয়েল এবং লোকের কাছে জোসেফ ডোঙা। অবশ্য ডোঙা নামের লেজুড়টা জোসেফ ইম্যানুয়েলের পছন্দ হয় না, এবং পছন্দ হয় না বলেই লোকে তাকে কিছুতেই ওটা ভুলতে দিচ্ছে না। দূর থেকে ছোট ছোট ছেলেপুলেরা ডোঙা সাহেব বলে চীৎকার করে এবং মুহূর্তে ডান-গাল বাঁ-গালের নীতিবাক্যটা ভুলে গিয়ে জোসেফ তাদের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। বলা বাহুল্য তাদের ধরতে পারা যায় না এবং রোষ কষায়িত নেত্রে ফিরে আসতে আসতে জোসেফ ইম্যানুয়েল স্মরণ করতে থাকে ঃ প্রভু, এদের ক্ষমা করিয়ো কারণ এরা জানে না এরা কী করিতেছে।

তেঠেঙে টাট্টুতে চড়ল হ্যান্স্ এবং তার সঙ্গে চলল জোসেফ। গন্তব্যস্থল রামগোপালপুরের হাট। শীতের মাঝামাঝি। মাঠের যে অংশটুকুতে ফসল ধরে তা রবিশস্যে আকীর্ণ হয়ে গেছে—সোনালি উজ্জ্বল পুষ্পস্তবকে আলো করে দিয়েছে চারদিক—শীতের রোদের মতোই তার রঙ। সমতল টিলা জমির ভেতর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে চলেছে টাট্টু ; সে চলা একটানা, থামা আর চলার মাঝামাঝি যে অবস্থাটা সেই বিলম্বিত লয়ে তার যাত্রা। সুতরাং সঙ্গে চলতে জোসেফের কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না।

ভারি খুশি মনে পৃথিবীটাকে পর্যবেক্ষণ করছিল হ্যান্স্। নতুন জগৎ—নতুন পরিবেশ। শহরে থেকে ভারতবর্ষকে একরকম চেনা যায়, কিন্তু এর রূপ আলাদা! এই ঢেউ খেলানো জমি, এই অবিচ্ছিন্ন নির্জনতা আর ঠাণ্ডা

বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ—এর সঙ্গে কোথায় যেন ইউরোপের সমুদ্রের একটা সংযোগ রয়েছে। হ্যান্‌স্‌ আনন্দিত কণ্ঠে বললে, মিস্টার জোসেফ, তোমার দেশটা ভারি চমৎকার।

জোসেফের মনে কাব্য নেই। এদেশের চমৎকারিত্বটাও তাকে যে খুব রোমাঞ্চিত করে তোলে তাও নয়। তবু স্বাভাবিক সৌজন্য রক্ষার জন্য জোসেফ ইংরেজী ভাষায় জবাব দিলে, ইয়াশ্‌।

—ম্যাক্সমুলারের বই পড়ে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ভারি মোহ ছিল আমার, এখন দেখছি ঠকিনি।

জোসেফ আবার বললে, ইয়াশ্‌ শার্‌।

কিন্তু কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে জোসেফের কান খাড়া হয়ে উঠেছে, বদলে যাচ্ছে মুখের রঙ। মাঠের ওদিকটাতে যেখানে বিলের জল মরে গিয়ে এক কোমর কাদা আর আধহাত ঘোলা জল থক থক করছে আর যেখানে একদল কালো কালো নেংটিপরা ছেলে জিওলমাছের সন্ধানে দাপাদাপি করছে, ওখান থেকে একটা সন্দেহজনক শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শিকারী কুকুরের মতো উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ালো জোসেফ। হ্যাঁ—কোনো ভুল নেই, এ ব্যাপারে ভুল হতেই পারে না। পরিষ্কার নির্ভুলভাবে চীৎকার উঠছে: ডোঙা ডোঙা, ঠোঙা ঠোঙা—ইঞ্জিরি মিঞ্জিরি!

ঠোঙাটা হচ্ছে ডোঙার সঙ্গে মিলিয়ে কাব্যরচনার প্রয়াস, আর ইঞ্জিরি মিঞ্জিরি ডোঙা সাহেবের ইংরেজী বিদ্যার প্রতি কটাক্ষপাত! মুহূর্তে জোসেফের মুখের পেশীগুলি শক্ত হয়ে গেল, বিড় বিড় করে অশ্রাব্য এবং অখ্রীষ্টানোচিত গালিগালাজ বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

—কী হল মিস্টার জোসেফ?

—নাথিং শার্‌।

—ওরা ওখানে চীৎকার করছে কেন?

—গ্রামের সব ত্যাঁদোড় ছেলে শার্। মাছ ধরছে।

—মাছ্ ধরছে? ওঃ লাভ্‌লি! চলো, মাছ ধরা দেখব।

মনে মনে জোসেফ শিউরে উঠল। তবে একমাত্র ভরসা সাহেবের বাংলা জ্ঞানটা টনটনে নয়, তা ছাড়া ডোঙা শব্দের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটা উপলব্ধি করাও সম্ভব নয় তার পক্ষে।

তবু ডোঙা সাহেব শেষ চেষ্টা করলে একবার।

—ও দেখবার কিছু নেই শার্, নোংরা ব্যাপার।

—নোংরা! নোংরা কেন? নেভার মাইণ্ড, চলো।

সাহেবের গোঁ আর বুনো শুয়োরের গোঁ—এদের মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই, এতদিনে সে অভিজ্ঞতাটা আয়ত্ত হয়েছে ডোঙা সাহেবের। কিন্তু ওদিক থেকে সমানে সোল্লাস চীৎকার আসছেঃ ডোঙা ডোঙা, ঠোঙা ঠোঙা—এস্‌পার কিংবা ওস্‌পার। মনটাকে বহু কষ্টে আয়ত্ত করে নিয়ে জোসেফ বললে, চলুন—

কিন্তু ওরা সেদিকে এগোতেই ছেলের দল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে সুরু করে দিলে।

—কী ব্যাপার জোসেফ, ওরা পালালো কেন?

—জানি না শার্।

—বোধ হয় ভয় পেয়েছে, তাই নয়?

—ইয়াশ্ শার্।

—কিন্তু, কেন? আমরা বাঘ না ভালুক? ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রচার করতে হলে আগে তো ওদের ভয় ভাঙানোটা দরকার—কী বলো?

জোসেফ বললে, সে পরে হবে শার্। এখন চলুন, নইলে হাটে পৌঁছুতে বেলা ডুবে যাবে।

—নেভার মাইণ্ড।—বলেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল হ্যান্‌স্

বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে পড়ল তেঠেঙে টাট্টু থেকে, তার পর ছেলের পালকে লক্ষ্য করে ঊর্ধ্বশ্বাসে মাঠের ভেতরে ছুটতে সুরু করে দিল।

—ওকি হচ্ছে শার্!

কিন্তু জবাব দেবার সময় নেই হ্যান্‌সের। ততক্ষণে সে প্রাণপণে ছুটেছে মাঠের ভেতর দিয়ে। ছেলেরা পরিত্রাহি চীৎকার করে পালাবার চেষ্টা করছে এদিক ওদিক আর হ্যান্‌স্ তাদের অনুসরণ করছে। টাট্টুর লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে অভিভূতভাবে জোসেফ ঘটনাটা লক্ষ্য করতে লাগল।

পাঁচহাত লম্বা মানুষ, সেই অনুপাতে লম্বা লম্বা তার ঠ্যাং; তা ছাড়া লাইপজীগ ইউনিভার্সিটির ব্লু, দৌড়ে তাকে হারানো অসম্ভব। সুতরাং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাহেব দুহাতে দুটো ছেলেকে ধরে ফেললে। ছেলেদুটো আর্তনাদ করে উঠল।

সান্ত্বনা দিয়ে হ্যান্‌স্ বলল, ভয় পাচ্ছ কেন? আমি শ্বেত জাতি— ইউরোপ হইতে আসিয়াছি। আমি ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ হইতে আসি নাই, নরমাংস খাই না।

ছেলেদুটো কথাটা বুঝতে পারল না, কিন্তু চোখের ভাষা বুঝতে পারল। তার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বদলে গেল সমস্ত। দেখতে দেখতে ছেলেরা এসে হ্যান্‌সের চারিদিকে জড়ো হয়ে গেল।

নিজের চোখকে কি বিশ্বাস করতে পারে জোসেফ? বিশ্বাস না করার অবস্থাই বটে। এ দেশের লোকের সঙ্গে মেশাটা মিশনারীদের কাছে নতুন কথা নয়, বরং তাদের পক্ষে সেটা যথেষ্ট স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। তাই বলে এতটার জন্যে কেউই প্রস্তুত থাকতে পারে না, জোসেফও নয়।

গায়ের সাদা সারপ্লিস্‌টা খুলে ফেলেছে হ্যান্‌স্, খুলেছে জুতো মোজা। তার পর পায়জামাটাকে হাঁটু অবধি গুটিয়ে নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে পরমোল্লাসে সেই এককোমর কাদায় মাছ ধরতে নেমে পড়ছে। পোশাকের অবস্থা তার

অবর্ণনীয়, সর্বাঙ্গে কাদার ছিটে—এমন কি গালে মুখে পর্যন্ত ছোপ লেগেছে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই হ্যান্সের—একটা সৃষ্টিছাড়া আনন্দে সে মশগুল হয়ে গেছে।

টাট্টু ঘোড়ার লাগাম ধরে ডোঙা সাহেব কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ; একটা রেভারেণ্ড ফাদারের এই ব্যবহার ! এমন করলে কি সম্মান থাকবে, না লোকেই কদর করতে চাইবে ! মুড়িমিছরি রামাশ্যামার সঙ্গে সাহেব যে একদর হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত !

সাহেব যখন উঠে এল মাঠের ওপর দিয়ে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। পেছনে ছেলের দল চীৎকার করছে, ও সাহেব, কাল আসবে তো ?

সাহেব সোৎসাহে সাড়া দিয়ে বললে, হাঁ, আসিব।

এতক্ষণ পরে গম্ভীর থমথমে গলায় কথা বললে জোসেফ : সন্ধ্যা হয়ে গেল—আজ আর যাওয়া যাবে না।

—আমি বাস্তবিক ভারি দুঃখিত—লজ্জিত স্বরে হ্যান্‌স্ জবাব দিলে, লোভ সামলাতে পারলাম না। ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় কাদার ভেতরে বল নিয়ে আমরাও রাগবী খেলেছি। তার পর বিশপদের কাছে গিয়েই ওসব ছেড়ে দিতে হল। কিন্তু ওদের দেখে আমার পুরানো দিনগুলির কথা মনে পড়ে গেল—

—ইয়াশ্‌ শার—তেমনি জলদগম্ভীর গলায় জোসেফ বললে, এবার ঘোড়ায় উঠুন, রাত হয়ে গেল। মাঠের রাস্তাঘাট বড় খারাপ, ভয়ংকর সাপের ভয়।

—সাপ ? ওঃ—লাভ্‌লি ! আই অ্যাম্ ভেরি ফণ্ড্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়ান স্নেক্‌স্—

মনে মনে দাঁত খিঁচিয়ে মাতৃভাষা সাঁওতালীতে বিড়বিড় করে ডোঙা সাহেব বললে, একবার কামড়ালেই বুঝতে পারবে।

জোসেফের মুখে সব শুনে ডোনাল্ড্‌স একটু হাসলেন মাত্র।

—এখনো বয়েস অল্প, তাই—

—ইয়াশ্‌ শার, কিন্তু আপনি বুঝছেন না—এরা সব ছোটলোক, ব্ল্যাক্‌ প্যাগান্‌—

ডোনাল্ডসের হাসিটা আরো একটু বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ল, অপাঙ্গদৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল জোসেফের ওপর ; ট্যান করা চামড়ার ওপরে ঘোর কালো রঙের বার্নিশ লাগানো, পুরু পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ানো নিগ্রয়েড্‌ চুল। মোটা আর আড়ষ্ট জিভে অশুদ্ধ ইংরিজী উচ্চারণ। তবু দু বছরের মধ্যেই কী প্রচণ্ড উন্নতি হয়েছে জোসেফের। 'ব্ল্যাক্‌ প্যাগান'দের সঙ্গে তার নিজের সীমা-রেখাটা একান্ত সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, ঘৃণা করতে শিখেছে ছোটলোকদের। ক্রিশ্চিয়ানিটির মহিমা আছে—বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে বিষয়ে।

—আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলব এখন।

—ইয়েশ্‌ শার্‌। উনি তো নতুন লোক, কিছুই জানেন না—

জোসেফ চলে গেল, ডোনাল্ড্‌স্‌ চুপ করে বসে রইলেন। হ্যান্‌সের উদ্দামতা তাঁকে উৎকণ্ঠিত করে তোলেনি, চিন্তিতও না। মনের দিক থেকে একটা বিচিত্র প্রশান্তির মধ্যে তলিয়ে গেছেন ডোনাল্ড্‌স্‌। এক একটা শান্ত সন্ধ্যায় বসে বাইবেল পড়তে পড়তে এই শূন্য দিগন্তবিসারী মাঠটা তাঁর মনকে আশ্চর্যভাবে আবিষ্ট করে তোলে। আবছায়া অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে দিগন্তটা, উঁচু উঁচু টিলা, এলোমেলো জঙ্গল নিরবয়ব হয়ে আসছে ক্রমশ, তার ভেতরে চোখে পড়ছে দূরে কতকগুলি অস্পষ্ট মূর্তি—দেহাতী মানুষগুলো দিনান্তে তাদের ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

তখনি মনে হয়। মনে হয় : এমনি অস্পষ্ট অন্ধকারেরর ভেতর দিয়ে, এমনি সংশয়বন্ধুর কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছেন

মানবপুত্র। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে আরো তেরোজন শিষ্য, তাদের একজন জুডাস্ ইস্ক্যারিয়ট। সঙ্গে তাঁদের অস্ত্র নেই, জয়বাদ্য নেই। চারিদিকের অন্ধকারে ইহুদীদের কুটিল হিংসা সরীসৃপের মতো তাঁকে ছোবল মারবার সুযোগ খুঁজছে। কিন্তু সত্যের আলো তাঁর মন থেকে মুছে নিয়েছে সমস্ত সংশয়, নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে অণুতম বিন্দুটুকুকেও। তিনি এগিয়ে চলেছেন, মাথার ওপরে তাঁকে পথ দেখাচ্ছে বেথেলহেমের শিয়রে জাগ্রৎ সেই উজ্জ্বল নক্ষত্রটি।

ডোনাল্ড্সের মনে হয় এ প্রচার অর্থহীন, এই উপদেশের ঝুলি কাঁধে বয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানোর সত্য মূল্য নেই কণামাত্র। এই মন্ত্র যিনি প্রচার করেছিলেন তূরী ভেরী পটহ্ তাঁর ছিল না, পাদ্রীর দল ছিল না। তাঁর অন্তরের মধ্যে যে সূর্য উঠেছিল, তার কিরণ আপনা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল; তাঁর কণ্টকজর্জরিত দেহের প্রতিটি রক্তকণা ঘোষণা করেছিল তাঁর বাণী। আজ এই অন্ধকারে এই যে ছায়ামূর্তি মানুষেরা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে চলেছে, একদিন নিজের প্রয়োজনেই ঐ দরিদ্র—ওই নির্বাকের মধ্যে তাঁর পুনরুত্থান ঘটবে। এই অজ্ঞাত অনাদৃত গ্রামগুলির মধ্যে কোন্‌টি যে নতুন কালের বেথেলহেম সে কথা কে বলতে পারে। যিনি আসবার নিজের প্রয়োজনেই তিনি আসবেন, অনর্থক কেন আর—

কিন্তু সৌভাগ্য এই যে, মনোভাবটা তাঁর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। নিজেকে মধ্যে মধ্যে প্রবলভাবে ধম্‌কে দেন ডোনাল্ড্স্। এ অন্যায়, এমন ভাবে চিন্তা করাটা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ। ভারতবর্ষের জলমাটি তাঁর রক্তের মধ্যেও দুর্বলতা প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে নাকি? নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে, নিরুৎসাহ আর অদৃষ্টবাদী করে দিচ্ছে এ দেশের ইন্‌ফিডেলদের মতো? চুপ করে বসে থাকলে চলবে না, তাঁরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে না রাখলে ঈশ্বরপুত্রের রিসারেক্‌শন হবে কেমন করে, কেমন করে সার্থক হবে মিলেনিয়ামের ভবিষ্যদ্বাণী?

—শুভ সন্ধ্যা, ফাদার !

—শুভ সন্ধ্যা—মুখ ফিরিয়ে ডোনাল্ড্‌স্‌ তাকালেন : এসো বোসো।

হ্যান্‌স্‌ এসে নিঃশব্দে পাশের চেয়ারটাতে বসল।

—কেমন লাগছে এখানে ?

—চমৎকার। এ একটা আশ্চর্য দেশ।

—প্রথম প্রথম তাই মনে হবে—ডোনাল্ড্‌স্‌ স্নিগ্ধভাবে বললেন : কিন্তু তার পরেই মত বদলে যাবে তোমার।

—আমার তা মনে হয় না—জোরের সঙ্গে জবাব এল।

—বেশ, তাহলেই ভালো। ডোনাল্ড্‌স্‌ আর কথা বাড়ালেন না, বললেন; বিস্তর কাজ আছে, এতদিনে আমরা বিশেষ কিছুই করতে পারিনি। তোমাকে ভালো করে এর দায়িত্ব নিতে হবে।

—তা নেব, কিন্তু—হ্যান্‌স্‌ হঠাৎ থেমে গেল।

—কী বলছিলে ?

—মাপ করবেন ফাদার, একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল।

—কী কথা ?

—জবাব দেবার আগে খানিকক্ষণ কী ভাবলে হ্যান্‌স্‌। অন্যমনস্ক ভাবে কামড়াতে লাগল বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা।

—এর কি সত্যিই কোনো দরকার আছে ?

—কিসের ?

—এই প্রিচিঙের ?

ডোনাল্ড্‌সের দৃষ্টি শঙ্কিত হয়ে উঠল।

—হঠাৎ একথা বলছ কেন ?

—আমার মনে হয়—একটু থেমে হ্যান্‌স্‌ বলে চলল—আমার মনে হয়, আমরা চেষ্টা করে কারুকে ভালো করতে পারি না। প্রত্যেকেই নিজের মতো

করে ভালো হতে পারে, আর সেইটেই সব চাইতে ভালো।

তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু চোখ হ্যান্‌সের মুখের ওপর ফেলে ডোনাল্ড্‌স্‌ বললেন, তোমার কথাটা বুঝতে পারছি না।

—আমি বলছিলাম—হ্যান্‌স্‌ আবার আঙুলটা কামড়ে নিলে : জোসেফ ইয়্যান্নুয়েলের মতো কতকগুলো জীব তৈরি করে ক্রিশ্চিয়ানিটির মর্যাদা বাড়ানো যায় না। ওরা যেমন আছে তেম্‌নি থাকলেই ওদের মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ পাবে।

—এসব কী বলছ তুমি! ডোনাল্ড্‌স্‌ আর্তনাদ করে উঠলেন : এই তো আমাদের কাজ! অন্ধকারের মানুষকে আলোর পথ তো আমাদেরই দেখাতে হবে। তুমি কি বলতে চাও এই পৌত্তলিক হিদেনগুলো চিরকাল শয়তানের শিকার হয়ে থাকুক?

—ঠিক বুঝতে পারছি না—

আলোচনাটায় আকস্মিক একটা ছেদ টেনে দিয়ে হ্যান্‌স্‌ উঠে দাঁড়ালো। কোথায় যেন অনিশ্চিত একটা অস্থিরতা পীড়ন করছে তাকে। তার পর সোজা সম্মুখের প্রায়ান্ধকার মাঠটার ভেতরে সে গিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

পাকা ভ্রূ জোড়াকে একটা সেকেণ্ড ব্র্যাকেটের মতো একত্র করে ডোনাল্ড্‌স্‌ তাকিয়ে রইলেন। নতুন এ পথে এসেছে, এখনো ফিলানথ্রপি আছে খানিকটা। কিন্তু ডোনাল্ড্‌স্‌ হাসলেন : বেশিদিন এসব থাকবে না। আস্তে আস্তে রোমান্স কেটে যাবে—যেমন করে ডোনাল্ড্‌সের একদিন কেটেছিল।

কিন্তু জার্মান জাতির রক্তে কোথায় উদ্দামতা আছে একটা, নিহিত আছে একটা উন্মাদ প্রাণচাঞ্চল্য। ইংরেজের মতো রক্ষণশীলতার স্থিরবিন্দুর চারপাশে সে আবর্তিত হয় না। হয়তো এটা ভালো, হয়তো এটা পরিপূর্ণ জীবনের লক্ষণ। কিন্তু আঁদাড়ে-পাঁদাড়ে জীবের কল্যাণের জন্য যাকে গলা ফাটিয়ে

বাইবেল আওড়াতে হবে আর বুক অব জন্ ব্যাখ্যা করতে হবে, তার পক্ষে এটা শুধু অসুবিধাজনক নয়, রীতিমত বিপজ্জনকও বটে।

সুতরাং ডোনাল্ড্‌স্ প্রচণ্ড একটা অশান্তি বোধ করতে লাগলেন।

ঘটনা যতটুকু তার বিবরণী ছত্রিশগুণ লম্বাচওড়া হয়ে এসে পৌঁছতে লাগল ডোনাল্ড্‌সের কানে। সব চাইতে যে বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠল সে জোসেফ ইম্যানুয়েল। তার মনে হতে লাগল এই নতুন পাদ্রীটির আবির্ভাবে ক্রিশ্চিয়ানিটির মহিমা বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

হাটে হাটে প্রচাব করতে যাওয়া হয় বটে, কিন্তু যা হয় তাকে প্রচার বলা চলে না। তেঠেঙে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে হ্যান্‌স্ হয়তো খাবারের দোকানে তেলে-ভাজা জিলিপি খেতে বসে যায়। খুশি হয়ে বলে, হাউ নাইস্ দিজ্ ইণ্ডিয়ান সুইট্‌স!

কিংবা হয়তো কারো হাত থেকে থাবা দিয়ে তুলে নেয় হুঁকোটা। কড়া দা-কাটা তামাকে টান দিয়ে খক্‌খক্ করে কাস্‌তে সুরু করে, রাঙা হয়ে ওঠে চোখ মুখ। তার পর হুঁকো ফিরিয়ে দিযে বলে, একটু কড়া। তা হোক, ইণ্ডিয়ান টোবাকো ভার্জিনিয়ার চাইতেও ভালো।

ওদিকে নিজের আভিজাত্য বজায় রেখে দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে ডোঙা সাহেব, দাঁড়িয়ে থাকে দাঁতে দাঁত চেপে। একটা প্রচণ্ড হিংস্রতায় শরীরের ভেতরে যেন জ্বলে যায় তার। এ কী হচ্ছে—এর নাম প্রচার! রাজার জাতির যে সগৌরব অধিকার এতকাল তারা ভোগ করে আসছিল হ্যান্‌স্ যেন সে অধিকারের অমর্যাদা করছে, এতকালের সম্মানটাকে টেনে নামিয়ে দিচ্ছে পথের নোংরা ধুলোতে। এ বাড়াবাড়ি, এতটা কিছুতেই সহ্য করা যাবে না।

কিন্তু লাভ নেই—বলে কোনো ফল হবে না। ইণ্ডিয়ান বলে নিজের পরিচয়টাকে ডোঙা সাহেব ভুলে যেতে চায়; তার কাছে এ পরিচয় চরম অগৌরবের, পরম লজ্জার। কিন্তু কি আশ্চর্য—সেই ইণ্ডিয়ার প্রতি একটা

অহেতুক প্রীতি আর অনুরাগ জেগে উঠছে এই সাদা সাহেবের মনে। এই হতভাগা দেশ—এই উঁচুনীচু টিলা জমি, এখানকার অশিক্ষিত বর্বর মানুষ, এই ভারতবর্ষকে সে ভালোবেসে ফেলেছে। মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ এ'কেই বলে!

ডোনাল্ড্‌সের কাছে নালিশ করে ফল হয়নি। বুড়ো পাদ্রীও যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছেন। বেশি কথা বলেন না, শুধু আস্তে আস্তে মাথা নাড়েন। তার পর শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করেন, এখনো ছেলেমানুষ, পরে ঠিক হয়ে যাবে।

অভ্যস্ত নিয়মে পুরু পুরু ঠোঁট দুটো আলোড়িত করে একটা বিচিত্র প্রতিধ্বনি করে জোসেফ: ইয়াশ্‌ শার্, আর মনে মনে মাতৃভাষায় বলে, তোমার মুণ্ডু হবে।

স্বগতোক্তিটা কখনো কখনো একটু সরব হয়ে ওঠে। কানের ওপর একটা হাত দিয়ে বুড়ো ডোনাল্ড্‌স্‌ জিজ্ঞাসা করেন, বেগ ইয়োর পার্ডন?

—নাথিং শার্—

কিন্তু মানুষের ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে।

দিব্যি নিরিবিলি পথ, বকুল গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঢাকা। নিজের মনেই একটা প্রার্থনাস্তোত্র আওড়াতে আওড়াতে নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানের মতো পথ চলেছে জোসেফ আর মাঝে মাঝে বিরক্ত আড়চোখে পায়ের ঝকঝকে পালিশ করা জুতোটার দিকে তাকাচ্ছে, দেখছে কেমন করে নোংরা ইণ্ডিয়ার ধুলোতে তার জুতোটা বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। নাঃ—এদেশে আর নয়। বড় পাদ্রীর তোয়াজ করে যে ভাবেই হোক এবার তার মাতৃভূমি ইয়োরোপে যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করে ফেলতেই হবে। ভারতবর্ষ তার সুকোমল পরিচ্ছন্ন সভ্যতাকে আহত আর মলিন করে তুলেছে।

—ডোণ্ডা ডোণ্ডা, ঠোণ্ডা ঠোণ্ডা—

যেন আকাশবাণী! কিন্তু প্রতিক্রিয়াটা ঘটল বোধ হয় এক সেকেণ্ডের

একশো ভাগের এক ভাগের মধ্যে। মুখ থেকে উপে গেল হোলি বাইবেল, সমস্ত শরীরটা শক্ত করে দাঁড়িয়ে গেল জোসেফ সাহেব। দুহাতের রগগুলো কোনো অদৃশ্য শত্রুকে আঘাত করবার জন্যে একেবারে টান টান হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে।

কিন্তু কোথায় কে! নির্জন নিরিবিলি পথ, জনমানুষের চিহ্নও নেই কোনোখানে। তবে কি এ ভৌতিক ব্যাপার নাকি?

—ডোঙা ডোঙা, ঠোঙা ঠোঙা—

তারপরেই কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার! আরে, শুধু ঘাস খেয়েই তো ডোঙা সাঁওতাল জোসেফ সাহেব হয়নি। ঘটে কিছু কিছু বুদ্ধিও সে রাখে বই কি! দৃষ্টিটা ঠিক চলে গেল ওপরের দিকে। হ্যাঁ, যা ভেবেছ ঠিক তাই। গাছের মাথায় একদল কালো কালো ছেলে—একদল ডার্টি প্যাগান!

—ন্যাস্টি ইম্‌পস্ (Nasty Imps)!

ডান-গাল বাঁ-গালের সারগর্ভ তত্ত্ব ব্যাখ্যাটা ভোজবাজীর মতো মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে গেল জোসেফ ইম্যানুয়েলের রাজকীয় আভিজাত্যবোধটা। আদি এবং অকৃত্রিম ডোঙা সাঁওতাল জেগে উঠল, পায়ের জুতোটা খুলে ফেলে তড়াক করে গাছে উঠে পড়ল সে।

কিন্তু ছেলেরা অনেক বেশি চালাক। চক্ষের পলকে ঝুপ ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ছে গাছ থেকে, তার পর ইম্যানুয়েল তাদের তাড়া করবার আগেই মাঠের মধ্য দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। দিগন্ত থেকে একটা রেশ তখনো পাওয়া যাচ্ছে: ইঙ্গিরি—মিঙ্গিরি—

খানিকটা এলোপাথাড়ি দৌড়ে জোসেফ ফিরে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। আর ফিরে এসে দেখল, এই ফাঁকে গাছের তলা থেকে তার জুতো জোড়া বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে!

—উঃ, ডেভিল্‌স্ চিলড্রেন—

রাগে ফুলতে ফুলতে খালি পায়ে খানিকটা এগিয়েছে জোসেফ, এমন সময় চমকে উঠল একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে। একটু দূরেই রাস্তার পাশে কোমরে হাত দিয়ে ছোট পাদ্রী হ্যান্‌স্‌ দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে হাসির একটা মৃদু রেখা, চোখে কৌতুক পিট পিট করছে।

—কী ব্যাপার, অমন করে ছুটছিলে কেন ?

একটা কুটিল সন্দেহে জোসেফের মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। হ্যান্‌সের চোখে মুখে কিসের একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ ব্যাপারে তারও কিছু যোগাযোগ আছে নাকি ? অসম্ভব নয়।

তবু অভ্যস্ত স্বর বেরুল : ইয়াশ্‌ শার্‌—নাথিং শার্‌।

—আমার বড় ভালো লাগল। ইয়োর রানিং ইজ্‌ ভেরি ইণ্টারেস্টিং মিস্টার ঠোঙা !

ঠোঙা ! তা হলে সন্দেহের আর অবকাশ নেই। সঙ্গে সঙ্গে খুন চড়ে গেল জোসেফের মাথায়, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটোতে ঝকমক করে উঠল নর-হত্যার অনুপ্রেরণা। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেই। তার পর কোনোদিকে দৃক্‌-পাত না করে সে সোজা হন্‌হন্‌ করে হেঁটে চলে গেল।

দিনের পর দিন এমন অবস্থা দাঁড়াতে লাগল যে শান্ত নির্বিরোধ বুড়ো পাদ্রীরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল।

তা ছাড়া একথা সত্যি যে, কাজ কিছুই হচ্ছে না। শুধু জোসেফের মুখে নয়, নানা ভাবেই ডোনাল্ড্‌স্‌ খবর পাচ্ছিলেন যে, এই খামখেয়ালী জার্মান ছেলেটা বড্ড বেশি বাড়িয়ে তুলছে। আজকাল জোর করে ঠেলে-ঠুলেও তাকে প্রচারে পাঠানো যায় না, তাই মাঝে মাঝে বাধ্য হয়ে বুড়ো ডোনাল্ড্‌স্‌কেই বেরুতে হচ্ছে। আবার বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে তেমনি করে চ্যাঁচাতে হচ্ছে :

"আইস, তোমরা আলোকে আইস। আমরা মেষের দল, মেষপালক স্বর্গীয় পিতা আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইবেন।" কিন্তু ভাঙা গলায় ধর্মপ্রচারটা তেমন জমে ওঠে না, ডোনাল্ড্‌স্‌ বেশ বুঝতে পারেন এ নিতান্তই পণ্ডশ্রম হচ্ছে।

সুতরাং ডোনাল্ড্‌সের মেজাজ বিগড়ে গেছে। কোনো কাজই যদি না হবে তা হলে এ ছোকরাকে আমদানি করা কেন? দু দণ্ড যে ঘরে বসে থাকবে তাও নয়। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরে কে জানে। এর বাড়িতে তামাক খায়, ওর বাড়িতে মুড়ি চিবোয়, ছেলেদের সঙ্গে ভিড়ে জলায় নেমে সর্বাঙ্গে কাদা মাথামাখি করে। তার পর সন্ধ্যার পরে ফিরে এসে বলে, ইণ্ডিয়া ইজ্‌ এ বিউটি। আই লাইক ইণ্ডিয়া—আই লাভ্‌ ইণ্ডিয়া।

পাদ্রীরা বিশ্বপ্রেমিক বটে, কিন্তু এতটা বিশ্বপ্রেম হজম করা তাদের পক্ষেও শক্ত!

সেদিন সন্ধ্যার দিকে একটু জ্বর এসেছিল ডোনাল্ড্‌সের। ভারতবর্ষে প্রেমের ধর্মপ্রচার করতে এসে এইটি নগদ লাভ হয়েছে—এই ম্যালেরিয়া। বিস্তর কুইনাইন, বহু ইন্‌জেকশন—কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। মাঝে মাঝে জ্বর আসে। কপালের শিরাগুলো দপ দপ করতে থাকে, মাথার ভেতর অনুভব করা যায় রক্তের একটা অশান্ত চাঞ্চল্য। আর শান্ত নিরীহ বুড়ো পাদ্রীর মেজাজের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে একটা। বিশ্রী পিট্‌পিটে—ভারতবর্ষের প্রতি অমানুষিক একটা ঘৃণা যেন সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দেয়। স্বপ্নের মতো মনে পড়ে ইংলিশ চ্যানেলের নীল জল, চক হিল, মর্মরিত পপলারবীথি, স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে সমুজ্জ্বল ইংল্যাণ্ড। মনে হয় এ নির্বাসন—একটা অসহ্য অনিচ্ছাকৃত নির্বাসন। আর এর জন্যে দায়ী এই ইণ্ডিয়ানেরা—এই ডর্টি আইডোলেটারের দল।

ডেক চেয়ারে একটা রেজাই দিয়ে পা পর্যন্ত ঢেকে ডোনাল্ড্‌স্‌ চুপ করে

শুয়ে ছিলেন। পাশেই বসে ছিল জোসেফ ইম্যানুয়েল। তার কালো মুখ আজ আলকাতরার চাইতেও কালো।

অর্থাৎ নতুন একটা কবিতা শ্রুতিগোচর হয়েছে। প্রাদেশিক ভাষাটা সংশোধন করলে মোটামুটি সেটা দাঁড়ায় এই রকম :

বুড়ো পাদ্রী নেহাৎ পাগল,
ঢোঙা সাহেব আদত ছাগল।

ছড়াটা শুনে ডোনাল্ড্‌স্‌ বললেন, হুঁ !

জোসেফ বললে, আপনাকে অনেকবার বলেছি শার্, সব ওই ছোট সাহেবের দোষ। ওঁরই জন্যে লোকগুলো এতটা প্রশ্রয় পেয়েছে! ঘরের লোকই যদি এ ভাবে শত্রু হয়ে ওঠে শার্. তা হলে এসব বৃথা চেষ্টা করে আর লাভ কি ? সোজা জেরুজালেমেই চলে যাওয়া ভালো।

ডোনাল্ড্‌স্‌ আবার বললেন, হুঁ।

নিঃশব্দে সময় কাটতে লাগল। হঠাৎ বাতাস-থেমে-যাওয়া উষ্ণতার মতো একটা চাপা গরম যেন চারিদিকে আবর্ত্তিত হতে লাগল। ডোনাল্ড্‌সের মনের কাছে ইংলিশ-চ্যানেলের সফেন-কাকলি বার বার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ইণ্ডিয়ার মশার অভিশপ্ত গুঞ্জনে। আর জোসেফের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা প্রবল বিরক্তিতে জ্বলে যেতে লাগলেন ডোনাল্ড্‌স্‌, ইচ্ছে করতে লাগল একটা নোংরা কুকুরের মতো এই নিগারটাকে লাথি মেরে দূরে ছিটকে ফেলে দেন তিনি।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। সামনের রাস্তায় শোনা গেল দ্রুত জুতোর আওয়াজ আর পুলকিত শিসের শব্দ। হ্যান্‌স্‌ ফিরে আসছে। জোসেফ একটু নড়ে চড়ে স্থির হয়ে বসল।

আনন্দোচ্ছল স্বরে হ্যান্‌স্‌ বললে, কী হয়েছে ফাদার, সব এমন চুপচাপ কেন ?

কারো কোনো সাড়া এল না।

হ্যান্‌স্‌ বললে, দেখুন ফাদার, কী চমৎকার একটা মুর্গী এনেছি। ইণ্ডিয়ান হেন্‌স্‌ আর লাভলি—

হ্যান্‌সের হাতের মুর্গীটার দিকে তাকালেন ডোনাল্ড্‌স্‌ঃ কোথায় পেলে ওটা ?

—ওরা কী যেন পূজো করছিল, তারই বলি। আমাকে এটা প্রেজেণ্ট করলে। রিয়্যালি—আই লাভ্‌—

—ড্যাম্‌ড আইডোলেটরি!—সমস্ত সংযমের মুখোশ হারিয়ে কদর্যভাবে গর্জে উঠলেন ডোনাল্ড্‌স্‌ঃ হ্যান্‌স্‌, আমি খুব দুঃখিত। তোমার আর এখানে থাকবার দরকার নেই, কালই তুমি এখান থেকে চলে যাবে।

দু চোখ বিস্ফারিত করে হ্যান্‌স্‌ বললে, ব্যাপার কি ?

—কিছু না।—তিক্ত তীব্র স্বরে ডোনাল্ড্‌স্‌ বললেন, চার্চ তোমার জন্যে নয়। ইউ ট্রাই ইয়োরসেল্‌ফ এল্‌স্‌হোয়্যার।

জোসেফ নিশ্চিন্তে বসে বসে হাঁটু দোলাচ্ছে—যেন অনাসক্ত কোনো তৃতীয় পক্ষ। তার দিকে একটা বক্রদৃষ্টি ফেলে হ্যান্‌স্‌ বললে, বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয়ই এই ডোঙা চ্যাপ্‌—

ডোঙা চ্যাপ্‌! সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক ক্রিয়াটা ঘটে গেল জোসেফের শরীরে। তীরের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল সেঃ আই ওয়ার্ন ইউ শার্—আই অ্যাম নো ডোঙা!

শব্দ করে হ্যান্‌স্‌ হেসে উঠল—তার গভীর স্বচ্ছ হাসি লহরে লহরে মুখরিত করে তুলল তরল অন্ধকারকে।

—নিশ্চয় ডোঙা! শুধু ডোঙা নয়, ঠোঙা ঠোঙা—

পরের ঘটনাটা ঘটল চক্ষের পলক ফেলবার আগেই। বুনো একটা রক্তলোলুপ জানোয়ারের মতো ভয়াবহ হুঙ্কার করে জোসেফ ঝাঁপ দিয়ে পড়ল

হ্যান্‌সের ওপরে। কিন্তু লাইপ্‌জীগ ইউনিভার্সিটির ব্লু সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক একটা সরীসৃপের মতো পিছলে বেরিয়ে গেল ; তার পর পুরু একতাল লোহার মতো প্রচণ্ড একটা স্ট্রেট্ কাটের আঘাত এসে নামল জোসেফের চোয়ালে। ঠিকরে একটা দেওয়ালে গিয়ে লাগল জোসেফ, সেখান থেকে কুমড়োর মতো ধপাৎ করে পড়ল মাটিতে।

ক্রোধে, জরের উত্তেজনায় যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ডোনাল্ড্‌স্। অমানুষিক কণ্ঠে চীৎকার করে বললেন, বেরিয়ে যাও এখান থেকে—ইউ বোথ! এটা চার্চ—গুণ্ডামির জায়গা নয়।

—সত্যিই চলে যাবো ফাদার ?

—হ্যাঁ—এই মুহূর্তে। ক্রিশ্চিয়ানিটি ডিস্‌ওনস্ ইউ। বেরিয়ে যাও—

নিজের চীৎকারে নিজের মাথাটা বোঁ করে পাক খেয়ে গেল ডোনাল্ড্‌সের। ছহাতে মুখ ঢেকে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বসে পড়লেন চেয়ারে—শিরা-গুলোতে ব্লাড-প্রেশারের রক্ত যেন টগবগ করে ফুটে উঠছে তাঁর। অনেকক্ষণ পরে যখন চোখ তুলে তাকাবার মতো স্বাভাবিক অবস্থাটা ফিরে এল, তখন দেখলেন পায়ের কাছে পোষা কুকুরের মতো বসে আছে জোসেফ ; পুরু ঠোঁট ফেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে তার, আর সেই রক্তাক্ত মুখে একটা বিগলিত হাসির রেখা! এ অবস্থায় হাসা শুধু ইণ্ডিয়ানের পক্ষেই সম্ভব!

কিন্তু হ্যান্‌স্ ? তার চিহ্নমাত্রও নেই। শুধু অভিশপ্ত ভারতবর্ষের বুকের ওপরে খাঁ-খাঁ করছে অমাবস্যা রাত্রির নিকষ অন্ধকার। সে অন্ধকারে এতটুকুও দৃষ্টি চলে না!

... ...

ছ মাস পরে—পনেরো মাইল দূরের হাটখোলায়।

ঝুরি-নামা বুড়ো বটগাছের তলায় লোকে লোকারণ্য। ঢোল আর কাঁসরের শব্দে কান পাতা যাচ্ছে না। শিবের গাজন চলছে ওখানে।

"বুড়া শিবের নাচ নাগিলে
নাচ নাগিলে ভোলানাথের—"

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে চলছে ভোলানাথের নৃত্য। মাথায় লাল চুলের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে পাকানো পাটের জটা। রঙ দিয়ে আঁকা বাঘছাল শিবের শরীরে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহ শিবের আনন্দ-নৃত্যের তালে পরমোল্লাসে ঢোল আর কাঁসর সঙ্গতি রক্ষা করে চলেছে।

"প্যাটেতে ভাত নাই ও শিব,
গোলাতে নাই ধান,
কী দিয়া বাঁচাব ও শিব
ছেল্যা পিল্যার জান।
ও বুড়া শিব, দয়া করো—"

নাচতে নাচতে শিবের চোখে জল এল। পেটে ভাত নেই, গোলায় ধান নেই। একবিন্দু অতিরঞ্জন নেই এর ভেতরে—এই ছ মাসেই নিজের চোখেই সে তা পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে। ভারতবর্ষকে দেখতে চেয়েছিল সে—জানতে চেয়েছিল। কিন্তু যা দেখলে তা না দেখলেই ভালো হত। শিব ভাবতে লাগল। এই অভাব—এই রিক্ততার সঙ্গে কোথায় যেন যোগ আছে বুড়ো পাদ্রী ডোনাল্ড্সের আর যোগ আছে পবিত্র ক্রিশ্চিয়ানিটির। সে যোগসূত্রের রেখাটা ক্ষীণ, কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া—

—ও শিব, নাচের তাল কাটল যে!

অপ্রতিভ হয়ে শিব আবার নাচতে সুরু করল। কিন্তু কানের কাছে ক্রমাগত গুন্ গুন্ করছে 'প্যাটেতে ভাত নাই, গোলাতে নাই ধান।' ভারতবর্ষকে দেখতে না চাওয়াই ভালো। প্রেমধর্মের দোহাই দিয়ে বিবেককে নিষ্কণ্টক করা সহজ; আর সহজ মনুষ্যত্বকে অন্ধ করে রাখা—

আচমকা শিবের ঘোর ভেঙে গেল। বাজনা বন্ধ হয়ে গেছে, উঠেছে

একটা ভয়ার্ত কলরব। আর ডোঙা সাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে : এই যে শার্—কাণ্ডটা একবার দেখুন। লোকটা নির্ঘাৎ পাগল হয়ে গেছে! ছিঃ —ছিঃ —ছিঃ—

জোসেফের দৃষ্টি অন্ধকারেও ভুল করেনি। এদিককার অন্ধিসন্ধি তার চাইতে ভালো করে আর কে জানে। তাই খোঁজ করে করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর তাঁর ফৌজকে সে এখানে এনে ফেলেছে।

শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিস্ট্রেটের মুখ ক্রোধে আর বিরক্তিতে বিবর্ণ হয়ে উঠল। পেছনেই পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ডোনাল্ড্স্, ম্যাজিস্ট্রেট তার দিকে একবার তাকালেন।

ঘৃণাভরে মুখ ফিরিয়ে নিলেন ডোনাল্ড্স্—শব্দ করে থুথু ফেললেন মাটিতে। স্বগতোক্তির মতো শোনা গেল : ইনফিডেল! এ নিউ জুডাস টু ক্রিশ্চিয়ানিটি!

—ইনফিডেল—জুডাস!—মাজিস্ট্রেটও প্রতিধ্বনি করলেন। তার পর শিবের বুকের ওপরে বাগিয়ে ধরলেন রিভলবারের একটা কালো নল : তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল।

আশ্চর্য, এই ছ মাসের মধ্যে হ্যান্স্ একখানা খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়েনি নাকি! না, ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে শিবের নাচ নেচে সে সাড়ে ষোলো আনাই বর্বর হয়ে গেছে। জোসেফ পর্যন্ত কৌতূহল বোধ করল। বড় বড় সরল চোখ মেলে হ্যান্স্ জিজ্ঞাসা করলে, অপরাধ? ইনফিডেল্?

আগুন-ঝরা গলায় ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, শেম্! তোমার লজ্জা করল না? ক্রিশ্চিয়ানিটি আর ইউরোপের সমস্ত মর্যাদা তুমি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছ। সেজন্যেই তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল—বাট দ্য ল ইজ টু লিবারল!—রিভলভারটাকে তেমনি বাগিয়ে রেখে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, কিন্তু সেজন্য তোমাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। তুমি শত্রু।

—শত্রু ? কার ? এই ডোভার ?—হ্যান্স্ হেসে উঠল।

—না, ইণ্ডিয়ার। ইণ্ডিয়া ইজ নাউ অ্যাট্ ওয়ার উইথ্ জার্মানি। চলো, দেরি কোরো না।

—আমি ভারতের শত্রু! হাউ লাভ্লি!—হ্যান্স্ বিষণ্ণ হাসি হাসল : থ্যাঙ্ক ইউ। চলো—

শিবের বেশেই হ্যান্স্ মোটরে এসে উঠল। ঘৃণায় অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থুথু ফেললেন ডোনাল্ড্স্। একটা বিচিত্র পিচ্ছিল হাসি খেলে যেতে লাগল জোসেফের পুরু পুরু কালো ঠোঁট দুটোতে।

অন্নহীন দরিদ্র ভারতবর্ষ তাকিয়ে রইল বিলীয়মান গাড়িটার দিকে—নির্বাক বেদনায় তার দৃষ্টি অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।

লোকটার সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। নইলে পথে যেতে এমন একটা কাণ্ড করে বসতে পারে!

অপরাধের মধ্যে পথে গাড়িটা এক জায়গায় থেমেছিল। সেখানে খুব ঘটা করে কালীপূজো হচ্ছে। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত গাড়ি থেকে নেমে পূজামণ্ডপের দিকে এগিয়ে গেলেন, ভক্তিভরে দাঁড়ালেন সেখানে।

হ্যান্স্ জিজ্ঞাসা করলে, এ কী ?

পাশের সশস্ত্র গুর্খাটি বুঝিয়ে দিলে, যুদ্ধজয়ের কামনাতে এখানে কালী-পূজো করা হচ্ছে। টাকা দিয়েছেন গবর্ণমেণ্ট—ম্যাজিস্ট্রেট নিজে এর একজন প্রধান উদ্যোক্তা।

—তাই নাকি ? লাভ্লি।—হ্যান্সের নীল চোখদুটো একবার ঝকঝক করে উঠল : তোমার জলের বোতলটা দাও তো, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে।

সরলমনে গুর্খা তার ফ্ল্যাস্কটা তুলে দিলে হ্যান্সের হাতে। কিন্তু জল খেলো না হ্যান্স্, তার বদলে একটা কেলেঙ্কারি করে বসল। বোঁ করে তার হাত থেকে উড়ে গেল ফ্ল্যাস্কটা—একবারে অব্যর্থ লক্ষ্য। বিশ্রী শব্দ করে

কালীমূর্তিটার মাথাটা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ল মাটিতে, ঘটে গেল একটা খণ্ড প্রলয়।

নিমিষের মধ্যে একটা উল্‌কার মতো মোটর থেকে মাটিতে যেন উড়ে পড়ল হ্যান্‌স্‌। উন্মাদ ছন্দে শিবের গাজন নাচতে লাগল ঃ নাউ আই অ্যাম এ ট্রু এনিমি অ্যাণ্ড এ ট্রু ইয়োরোপীয়ান। অ্যাম আই নট ?

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

কল্লোল-যুগের যে ক'জন লেখক অকস্মাৎ নিজেদের প্রতিভার বিদ্যুদ্দীপ্তিতে পাঠকদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আজ একেবারেই সাহিত্যজগতের বাইরে চলে গেছেন—কেউ কেউ মারাও গেছেন। কিন্তু যাঁরা আজও নতুন নতুন সৃষ্টির দ্বারা নিজেদের অফুরন্ত সৃজনীশক্তির পরিচয় দিচ্ছেন অচিন্ত্যকুমার তাঁদেরই অন্যতম। ইনি ও প্রেমেন্দ্র মিত্র সহপাঠী ছিলেন—সে যোগাযোগ সত্যিই বিস্ময়কর। আইন পাশ করে কিছুদিন বসে থাকবার পর মুন্সেফি শুরু করেন, এখন ইনি জেলা হাকিমের পদে অধিষ্ঠিত। এই বিশেষ হাকিমি যে তাঁকে নতুন করে কথাসাহিত্যে প্রেরণা জুগিয়েছে একথা বললে খুব ভুল হবে না। এঁর 'বেদে' 'প্রথম প্রেম' 'ঊর্ণনাভ' 'ডবল ডেকার' 'চাষাভুষা' 'কাঠ-খড়-কেরোসিন' 'কল্লোল-যুগ' 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' প্রভৃতি বই বিখ্যাত।

খেলাওয়ালী

খোঁস-পাঁচড়া দাদ-চুলকানি হাজা-খুজলি—' বাদিয়ানীর দল ঝাঁকবাঁধা পাখির মত কলকলিয়ে উঠল : 'বাঁজা আর মড়াছেঁয়ে, বেরামী আর হামিলা। কই গো মা-জানরা! দেশ-বিদেশে কত নাম তোমাদের। নাম শুনেই এসেছি তোমাদের দুয়ারে—'

ভুঁইয়া-সাহেবের বাড়ি। খাস জমিই প্রায় দু'শো কানি। তার পর পত্তন-পাট্টায় কত বলতে হলে ফর্দ লাগে। পঞ্চাশের আকালে ধান বেচে মোটা হয়েছে। কিন্তু সেই হাড়-কিপ্পিন। গায়ে নিমা, কাঁধে গামছা, পরনে খাটো লুঙ্গি, পায়ে দেশী মুচির বাদামী চটি। মাথায় তালের আঁশের তৈরী গোল টুপি, মাথার তেলে আদ্ধেকটাই কালো। এত টাকায়ও দরাজ হয়নি তার মন-দিল।

'কই গো মা-জানরা, একটু পান-শুপারি সাদা তামাক দাও। খালের ঝাঁড়ির মুখে নৌকো আমাদের। রোদ্দুরে আসছি অনেক হেঁটে-হুঁটে—'

ফাল্গুন মাস। ধান-চাল উঠে গেছে ঘরে ঘরে। বেচা-বিক্রি সুরু হয়ে গেছে। কাঠ-কুটা জোগাড় হয়েছে গৃহস্থের। মেয়েরা নাইয়র এসেছে, কর্তারা গলায় চাদর ঝুলিয়ে চলেছে বেয়াই-বাড়ি। পথে-ঘাটে জল-কাদা নেই। গ্রামের হালট খটখট করছে। হাটে-বন্দরে বেড়ে গেছে চলাচল। সেই সঙ্গে দিকে-দিকে বেরিয়ে পড়েছে ফেরিওয়ালা, মুদিওয়ালা, মনোহারীওয়ালা, বেরিয়ে পড়েছে বেবাজিয়া বাদিয়ানীর দল।

'কই গো চাচীজান ভাবীজানরা! পান-তামুক না দিলে খেলা দেখাব কী তোমাদের! গান ধরব কোন্ গলায়!'

দেশদেশী লোক নয়, বেজানা স্বরে কথা কয়, ঝুড়ি-চুপড়ির মধ্যে সাপ নিয়ে এসেছে বুঝি, ভুঁইয়া-বাড়ির উঠোন ভরে গেল মেয়ে-পুরুষে।

একটা বুড়ি আর দুটো মেয়ে। কাঞ্চনী আর তরী। একটা ফলপাকাস্ত, অন্যটা ডাঁসা।

মাথার ঝাঁকা নামিয়ে বসল তারা উঠোনে। বুড়ি তার থলের ভিতর থেকে হর-জিনিস বের করতে লাগল: ছোট-ছোট কাঠের খেলনা, দাবার বোড়ে, গেঁটে কড়ি ফলের আঁটি, পাখির ঠোঁট, গোরুর শিং, মানুষের হাড়। বিছিয়ে রাখল একটা পুরোনো ময়লা ন্যাকড়ার উপর। বললে, 'নে, আগে গাব ধর্।'

হাতের উপর গাল কাত করে তরী গান ধরল:

রে বিধির কি হইল।

আইস আইস কামার ভাই রে, খাও রে বাটার পান,
ভাল কইরা গইড়া দিও লোহার বাসরথান।
সোনার থালে পান ওরে রুপার থালে চুন,
মাইয়া-লোকের প্রথম যৌবন, ও যে জ্বলন্ত আগুন।

রে বিধির কি হইল।

বাড়ি-ঘর ভেঙে বেরিয়ে এল সাহেবানীরা। বেরিয়ে এল বাড়ির ধারের পড়শী। সবাই বললে, মিশশিকারী এসেছে। চল, চল, সাপ নাচাবে, বেউলা-লখাইর গান গাইবে, ব্যারাম নামাবে শিঙা টেনে।

কার কি ব্যামো-পীড়া? কোমরে বাত? তলপেটে ব্যথা? অবিয়ন্ত আছে না কি কেউ বউরা? আমাদের ঠেঙে কোনো শরম নেই। আমরা মালবন্থি। বিষ নামাই। ভূত ঝাড়ি। মন্তর-তন্তর জানি। ভোজবাজি দেখাই। ফকিরালি করি। বাঁজা ডাঙায় ফসল ফলাই। বিষবন্থি আমরা।

ছোট একটা লোহার শলা বুড়ি তার ডান চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বাঁ চোখের কোণ থেকে বার করে ফেলল। ভাঙা কাচ চিবিয়ে-চিবিয়ে খেয়ে ফেললে শুপুরির মত। ছোট একটা কাপড়ের থলের মধ্যে রাখলে তিনটে দাবার বোড়ে, একটা পাওয়া গেল বড় বিবির কোলের মধ্যে, দ্বিতীয়টা পাওয়া গেল মেজ বিবির আঁচলে বাঁধা, তৃতীয়টা ছোট বিবির খোঁপায় গোঁজা।

ভুঁইয়া-সাহেবের তিন বিবি। বড় বিবির কোমরে দরদ, মেজ বিবির সন্তান টেঁকে না, ছোট বিবির উপরে দেও-ভূতের দৃষ্টি পড়েছে, এরি মধ্যেই ভুঁইয়া-সাহেবের মন প্রায় চল-বিচল হবার জোগাড়।

'সব বাতাস। বাতাসের কারবার।' বুড়ি বললে ঘাড় দোলাতে দোলাতে, 'সব নিষ্পত্তি করে দিচ্ছি। কই পান আনো, তামুক আনো, মন্তর-পড়ার চাল আনো।'

ডালায় করে পান এল, এক কলকি-বোঝাই তামুক। তিনটে সাদা পাতা। তিন মালসা চাল।

এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল বুড়ি। কি যেন খুঁজছে আতি-পাতি করে। বললে, 'কি গো, পুরুষ-পোলা কেউ নেই বাড়িতে?'

বা, ইয়াসিনই তো আছে। ভুঁইয়া-সাহেবের বড় ছেলে। বয়েস কুড়ি-বাইশ। বাংলা-মতে লেখাপড়া জানে কিছু। প্যাঁচ না হয়ে খাড়া-খাড়া লেখা

হলে পড়তে পারে থেমে থেমে। দু-দুটো বিয়ে দিয়েছে বাপ। দু-দুটোকে ছাড়ান দিয়েছে। একটার নাকি চলন-ফিরন ভাল নয়, আরেকটা নাকি কাজ-কর্ম জানে না। দুটোই রোগা কাঠি, গোলসান চেহারা হল না কিছুতেই। পাশ-গাঁয়ে ভুঁইয়া-সাহেব গিয়েছে ছেলের জন্যে তেসরা বউয়ের তালাস করতে।

'আর আপনার বুঝি মাথাধরা?' বুড়ি একনজর তাকিয়ে বললে, 'ও আমি চোখ-মুখের চেহারা দেখে বলে দিতে পারি। আর এ মাথাধরা ঝাড়তে তিন শিকড় লাগবে। তাও নায়ে বসে। নায়ের দিব্যি-কোঠায়। আর দিন তিনেক আমরা আছি।' পরে আপন মনে ঝাপসা গলায় বললে, 'বড় কঠিন ব্যামো। ব্যামোর মধ্যে ছিনে জোঁক।'

'আমার মাথাধরা ঝাড়তে হবে না।' বিরক্ত মুখে বললে ইয়াসিন: 'গান ধরো তো শুনি।'

তরী গান ধরল:

বিয়া কইরা যান লখাই লোহার বাসর ঘরে,
পিদ্দিমেরি সইল্‌তাখানার বুক থরথর করে।
সোনার খাটে শুইছেন লখাই রুপার খাটে পা,
পাখা হাতে বাতাস করেন উদাস বেহুলা।
রে বিবির কি হইল!

যেন কোকিলা গাইছে। ইয়াসিন তাকাল তরীর দিকে, তাকাল ভরা চোখে। এক থালা জলের মত যৌবন তার সারা গায়ে যেন টলটল করছে, কাঁধার ছাপিয়ে পড়বে বুঝি উপচে। গায়ে আঁট একটা আঙিয়া, শাড়িটাতেও টান পড়েছে। দুটোই জায়গায়-জায়গায় ছেঁড়া। ছেঁড়াগুলো চোখ চেয়ে আছে নিরাশ্রয় অসহায়ের মত।

'ওকে আর দেখছ কি? নামাজ-টামাজ পড়তে শিখছে, কিন্তু একখানা

ওর সাফ কাপড় নেই। পরদা-পসিদা মত থাকতে পারে না। সব সময়ে মুখ কালো করে থাকে। চাল-ডাল তো তবু সময়ে-অসময়ে পাওয়া যায়। কিন্তু শাড়িজামা পাই কোথা ? দাও না কিছু ঘরের জিনিস। সাত পুরুষের গা ঢাকবে তোমাদের।'

'হাসছিস কেন ?' শাসনের স্বরে কাঞ্চনী হিস-হিস করে ওঠে।

'শরম লাগে।' দু' হাঁটুর মধ্যে তরী মুখ লুকোয়।

'নইলে কাপড়-জামা হবে না। নে, উঠে দাঁড়া। উঠে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে গান ধরলেই শরম-ভরম চলে যাবে।'

তরী গলা ছেড়ে গান ধরল :

আমার বড় খিদা পাইছে বেহুলা সুন্দরী,
পার কিছু আইন্যা দেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা হরি।
এত রাতে কি আনিমু বেউলা বইস্যা কাঁদে,
শেষকালেতে বরণ-কুলার চাউলে ভাত রাঁধে।
রে বিধির কি হইল !

বড় বিবির কোমরে শিং লাগিয়ে ফুঁ দিয়ে ব্যথা নামানো হল। পাটাপুতা এনে শিকড় বেটে খেতে দিল মেজ বিবিকে। তাগা বাঁধা হল ছোট গিন্নির বাজুতে।

'এনার সাদি হয়নি ?'

'হয়েছিল দু নম্বর। মনজাইমত হয়নি। বিয়ে ছুটে গেছে। দাও না ওকে একটা তাবিজ-কবচ। যাতে মিল-মানান ঠিক থাকে। উলফৎ থাকে চিরকাল।'

তরীর সঙ্গে ইয়াসিনের চোখোচোখি হয়।

'যাবেন আমাদের নায়ে।' বুড়ি মন্তর-পড়া গলায় বললে, 'ফাঁড়ির মুখে অশথ গাছের তলায় আমাদের বহর বাঁধা। খাঁটি পলার জ্যান্ত কবচ দেব।

এবার এমন বিয়ে দেব অসতন্তর হয়ে থাকতে হবে না। হাঁড়ির মুখে সরার মত লেগে থাকবে।'

তরীর দিকে চেয়ে কাঞ্চনী চোখের কালোতে সাপের মণির ঝিলিক মারে। তরীর যেন বুঝজ্ঞান নেই, সারা গায়ে ঝিমকিনি লাগে। দেহের সরোবরে যৌবনের জল থমথম করে। এইবার বসে বসেই গান ধরে তরী :

কি অন্ন খাওয়াইলা বেউলা কি অপূর্ব লাগে,
এমন অন্ন খাইনি কভু মাতৃঘরে আগে।
এই যে অন্ন শেষ অন্ন অন্যে কেবা জানে,
ভাত খাইয়া তাকায় লখাই রাত-উপাসীর পানে।
রে বিধির কি হইল!

বড় বিবি পাঁচ টাকা বকশিস দিল। দিল সাত সের চাল, তিনটে ঝুনো নারকেল, এক সাজি গুপুরি। এক গোছা সাদা পাতা। এক গোল্লা মাখা তামাক।

কাঞ্চনী কেঠো গলায় বললে, 'কিছু কাঠ দাও না গো—'

'এ বাড়ির মুরগিগুলি তো বেশ তাজা।' তরী বললে গোলালো গলায় : 'পেট ভরে ধান-চাল খায় বুঝি। তাই একটা চেয়ে নাও না বুবু।'

'কেন, তুই চাইতে পারিস না বড় মিয়ার কাছে?' কাঞ্চনী ঝামটা দিয়ে ওঠে।

ঝুড়ি-চুপড়ি নিয়ে উঠে পড়ে বাদিয়ানীর দল। এত জিনিস বয়ে নেবে কি করে? তরী বললে, 'আমি নিচ্ছি কাঠের বোঝা।'

'না, না, তা কি হয়? নয়া বয়সের ভারই তুমি বইতে পার না, তুমি হবে কাঠের বোঝারি!' ইয়াসিন সেকেন্দরকে ডাকলে। সেকেন্দর বাড়ির হালিয়া, মাস-ঠিকায় কাজ করে। তার মাথায় চাপিয়ে দিলে কাঠ, চালের ঝুড়ি, হাতে ঝুলিয়ে দিলে পা-বাঁধা মুরগি এক জোড়া। 'তাড়াতাড়ি করে দিয়ে আয়

পৌছে। মুনিব বাড়ি ফেরার পথে যদি দেখতে পায় এই কাণ্ড, তার খেসারৎ তুলতে গিয়ে আগেই তোকে খুন করবে।'

হংসগমনে চলেছে তরী। দেমাকে ঠমক দিয়ে। তার পিছু ধরেছে ইয়াসিন। হাতে তার একটা কাপড়ের বোঁচকা।

বললে, 'কাপড়-জামা আছে এর মধ্যে। কাঁচুলি, আর সায়া।'

তরী চোখ বড় করে রইল। বললে, 'আপনার বিবিজানেরটা বুঝি ?'

'বিবি কই ? সে সব কবে ঝুট হয়ে গেছে। ঝুটা জরি ছেড়ে এখন আসল জহরতের তালাস করছি।'

কাঞ্চনী তরীর কানে বললে ফিসফিসিয়ে, 'নৌকোতে আসতে বলিস সাঁজের বেলা।'

'নৌকোয় আসবেন। ফাঁড়ির মুখে বহর বাঁধা আমাদের।'

ইয়াসিন ইতি-উতি চাইল। উসি-পিসি করতে লাগল। চলে এল বাড়ি ফিরে ; বললে, না, নৌকোয় কেন ? চল আমার বাড়িতে। আমার শান বাঁধানো টিনের ঘরের বাসিন্দা হয়ে।

কত রাজ্যের জল ঠেলে-ঠেলে ভাসছে তারা—বাদিয়ানীরা। বাড়ি-ঘর নেই, জায়গা-জমি নেই, সীমানা-সরহদ্দ নেই। কেবল অফুরন্ত জল। নৌকোয়ই তাদের ঘর-সংসার, বিয়ে-সাদি, ইষ্ট-কুটুম। নৌকোই তাদের সমাজ। ওটা মামার বাড়ি, ওটা শ্বশুর-বাড়ি, ওটা বান্ধবের বাড়ি। শুধু মরবার পর সাড়ে তিন হাত মাটির দরকার। মাটির সঙ্গে শুধু এইটুকু তাদের কায়েমী সম্পর্ক। আমল-দখল নেই, স্বত্ব-স্বামিত্ব নেই। নেই স্থান-স্থিতি। তারা সব দেশেই বিদেশী। তারা ভবঘুরে।

এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে যায়। একেকটা বহর। একেকটা

জামাত। একেক মরশুমে একেক এলেকা। সাপ ধরে, দাওয়াই দেয়, খেলা দেখায়, গান বাঁধে, লোক ঠকায়। হাত-সাফাই করে। জলে আঁক কাটে। জল দিয়ে মুছে দেয় জলের দাগ।

না, জল আর ভাল লাগে না তরীর। তার ইচ্ছে করে বেড়া-ঘেরা ঘরে গৃহস্থ হয়ে স্থিতু হয়ে যায়। মাঠ-মাটির কাজ করে। ধান ভানে, চাল কাঁড়ে, ঢেঁকিতে পাড় দেয়। গোবর দিয়ে উঠোন-ভরতি ধান রোদে শুকায়। তার উপরে হেঁটে-হেঁটে পা দিয়ে ওলটায়-পালটায়।

ইচ্ছে করে মাটিতে একটা বীজ পোঁতে নিজের হাতে। দেখে, কেমন করে জলজ্যান্ত গাছ হয়ে ওঠে একটা।

মাটির জন্যে এত মন পোড়ে তরীর। হাসিল-পতিত, ভিটা-বাস্ত, দীঘি-পুকুর, বাগ-বাগান, ইট-ইমারত, বৃক্ষ-লতা, পাখি-পাখালি। জলে আর সুখ নেই।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে ইয়াসিন চলে আসে নৌ-বহরের সীমানায়। নৌকো ঢেকে তাঁবুর মত ছই, ছইর উপর বসে কাঞ্চনী আর তরী ছিপ ফেলে মাছ ধরছে।

'বড় মিয়া এসেছে!' তরী বললে ডগমগ হয়ে।

'আসতে দে।' কাঞ্চনী বললে ভারিক্কি গলায়।

প্রথমে দিশ পায়নি ইয়াসিন। কুড়ি-বাইশখানা নৌকা গায়ে গা লাগিয়ে বাঁধা। খালের পারে জাল বিছানো—ঝাকি জাল, খেটে জাল, ধর্মজাল। কাঠ রয়েছে ভুর করা। মুরগি বোঝাই খাঁচা। তিন ইটের উনুন। হাঁড়ি-কুঁড়ি। পোড়া আর আপোড়া।

অনেক কণ্ঠের কলকল।

সাধারণ শাড়ি-জামা পরা বলে তরীকে প্রথমে ঠাহর হয়নি। যেন অষ্ট-প্রহরের গৃহস্থ-বৌ মনে হচ্ছে।

'প্রথমে চিনতে পারিনি। আমার দেওয়া সেই জামা-কাপড় পরনি কেন?'

'ও বাবা! অত ভাল জিনিস কি আমরা পরতে পারি?'

কাঞ্চনী ভুরু টান করে বললে, 'ও আমরা তুলে রেখেছি প্যাঁটরায়। আটপৌরে যা আছে তাই পরে আছি কোনোমতে।'

আটপৌরেও তা হলে আছে দু'-একখানা। বেশ আস্ত-মস্তই আছে। যেগুলো ছেঁড়াখোঁড়া সেগুলোই বুঝি পোশাকী। খেলা-দেখানোর সাজ।

'কি, মাথা ঝাড়াবেন না?'

'তাই তো এসেছি। বুড়ি কোথায়?'

'আমাদের মা? সে গেছে বন্দরে। বাজার করতে।'

বাজার করতে মানে কাপড়-জামা বিক্রি করতে। চাল নারকেল বিক্রি করতে। আর যদি পারে কিছু চুরি করতে হাতের কায়দায়।

নৌকোর মধ্যে মাথা গলিয়ে ঢুকে পড়ল ইয়াসিন। নৌকোর মধ্যে ছোটখাট একখানা সংসার সাজানো। রান্না-ঘর। শোবার ঘর। বাসন-কোসন, বিছানা-বালিশ, চুলা-লণ্ঠন, সব-কিছু সরঞ্জাম।

'তোমাদের মা আসা পর্যন্ত বসতে হবে?' ভয়ে ভয়ে বললে ইয়াসিন।

'কেন, তা কেন? আমরা কি আর মন্তর-তন্তর শিখিনি কিছু? যা তরী, দিব্যির কোঠায় নিয়ে যা। আমি শিকড় নিয়ে আসি।'

'দিব্যির কোঠায়?'

'হ্যাঁ, দিব্যির কোঠায়।' কঠিন গলায় বললে কাঞ্চনী।

গলুইয়ের দিকে ছোট্ট একটি কোঠা। হ্যাঁ, এটাই দিব্যির ঘর। আর-সব ঘর সংসারী ঘর। সে সব ঘরে শোওয়া-বসা খাওয়া-দাওয়া, সাধারণ জীবনযাত্রা। দিব্যির ঘরটা দুর্গের মত, দেবালয়ের মত। নৌকোপথ বড় বিপদের পথ। লুঠেরা-ডাকাত তো আছেই, ঘরের পুরুষই তো কত অত্যাচার

করতে চায়। কত মারপিট, কত খুনজখম। তখন অবলা মেয়ে এই দিব্যির ঘরে এসে আশ্রয় নেয়। এখানে একবার ঢুকলে গায়ে আর হাত তোলা যায় না, মেয়েমানুষ তখন চলে যায় একেবারে ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।

লম্বা একটা জংলা ঘাস নিয়ে এল কাঞ্চনী। দাঁত দিয়ে খুঁটে সাদা শাঁস বের করে দিলে তা তরীর হাতে। পাঁচ টাকা মজুরি নিয়ে চলে গেল।

সেই দিব্যির কোঠায় জড়সড় হয়ে শোয় ইয়াসিন। আলগোছে তার শিয়রে বসে তরী তার কপালে সেই ঘাসের শাঁস বুলিয়ে দেয়। আল্লা-রসুলের নাম করে। নাম করে মেহের-কালির, কামরূপ-কামাখ্যার—ফাঁকে-ফাঁকে বলে তার দুঃখের কথা। এই একঘেয়ে জল আর ভাল লাগে না। ঘর বেঁধে সংসারি করতে সাধ যায়।

'নায়ে তোমাদের পুরুষ কই?' জিগ্‌গেস করে ইয়াসিন।

'মেনাজদ্দি ছিল অনেক দিন। জঙ্গলে সেবার বেকায়দায় সাপ ধরতে গিয়ে ঘা খেল কাঁধের উপর। সেই থেকে কাঞ্চনীর ঘর খালি।'

'নৌকা বায় কে?'

'আমরাই দু বোন। দাঁড় টানি, মাছ ধরি, কাঠ কাটি। মাকে বলি, পুরুষ না পাও চাকর রাখ একজন। মা বলে, যে পুরুষ সেই চাকর। এবার তোকে বিয়ে দিয়েই পুরুষ আনব নৌকোয়। মানিক সাইকে ডাকি, কোথায় কে। আমার মন আর বসে না বড় মিয়া, ভেসে-ভেসে বেড়ায়।'

ধরা-ছোঁওয়া যাবে না, কিন্তু গান শুনতে দোষ কি!

'গলা শুনতে পেলে কাঞ্চনী আরো টাকা চাইবে।'

'দেব টাকা।'

'আমাকে কিছু দেবে না উপরি? ও সব তো ওরা নেবে। আমি তবে কী পেলাম?'

'দেব। না যদি দিই তোমাকে, আমিই বা তবে পাব কী!'

তরী গান ধরল :

খনে জাগা খনে নেবা বাতি টিপটিপ করে,
গহীর রাতে ঘুমের ভাবে বেউলা ঢইল্যা পড়ে।
খাট ছাইডা কেশের বোঝা মাটির উপর লোটে,
শেষ রাতে কালনাগিনী কেশ বাহিয়া ওঠে।
রে বিধির কি হইল!

ইয়াসিনের মনে হল, যেন নৌকো ছেড়ে দিয়েছে। খাল ছেড়ে চলে এসেছে গাঙের ভরা জোয়ারে। এ মুলুক ছেড়ে চলেছে অন্য কোনো বেনামী মুলুকে। সারি-সারি নৌকো। সে আর ক্ষেতের মানুষ নয়, নৌকোর মানুষ। যেন সে আর দিব্যির কোঠায় শুয়ে নেই। চলে এসেছে সংসারী কোঠায়। জলের উপর সংসার। সমস্ত সংসার-সৃষ্টিই জল।

লখিন্দর আর বেহুলা। জুলেখা আর ইউসুফ।

বুড়ি ফিরেছে বাজার থেকে। জিগগেস করলে, 'এসছিল ভুঁইয়ার পো?'

'এসেছিল। পনরো টাকা আদায় করেছি।' কাঞ্চনী বললে।

'মোটে?'

'মাথাঝাড়া পাঁচ, গান পাঁচ, আর আমার দারোয়ানি পাঁচ। আবার আসবে বলেছে। মাথাব্যথা একদিনে সারবার নয়।'

'না, আরো বেশি করে আদায় করা দরকার। ঘড়া-ঘড়া টাকা ওই ভুঁইয়ার, শুনে এলাম পাকাপাকি। কী ছাই খেলা দেখাতে পারলি তবে?' বুড়ি ঝাঁজিয়ে উঠল : 'কি, দিব্যিব ঘরে ছিল তো?'

'দিব্যির ঘর না হলে টিপে-টিপে বের করতে পারব কেন?' হাসতে-হাসতে বলল এবার তরী : 'এই দেখ আরো দশ টাকা। লুকিয়ে আদায় করে নিয়েছি বকশিস।' হাতের মুঠ খুলে তরী টাকা দেখাল।

আহ্লাদে উথলে উঠল বুড়ি। বললে, 'এই তো আমার আসল খেলা-ওয়ালী!' টাকা পঁচিশটা প্যাটরার মধ্যে রাখতে-রাখতে বললে, 'কালকে আরো বেশি চাই। পঞ্চাশ টাকা।'

তরী মার জন্য তামাক সাজে আর গুন্‌গুনিয়ে গান গায়:

কালনাগিনী সাক্ষী রাখে দেব দানব সব,
কি দোষে দংশিব আমি এমন মানব।
এখানে ওখানে কালি ঘুরে ঘুরে দেখে,
দোষ না দেখিয়া কালি বিড় পাকাইয়া থাকে।
রে বিধির কি হইল!

মাছশিকারী বাদিয়ানীকে সাদি করবে এমন প্রস্তাবে রাজি হবে না ভুঁইয়া সাহেব। কোথাকার কে এক খলিফার মেয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করে এনেছে। সেইখানেই রাজি হবে ইয়াসিন? কখনো না। কিন্তু মুখ ফুটে বলে এমন সাধ্য কি। দরকার নেই বলে-কয়ে, নৌকোয় সে ভেসে পড়বে। নোট বোঝাই করে কলসী পুঁতেছে সে শান খুঁড়ে। শান খুঁড়েই বের করবে সে একটা।

তাই পরদিন মাথা ঝাড়াবার সময় ইয়াসিন মিনতি করল: 'চল আজ সংসারী ঘরে।'

ঘাসের ডগা বুলুতে বুলুতে তরী বললে, 'আমাকে নিয়ে চল তোমাদের ঘরে। সেই আমার সংসারী ঘর। নৌকোয় কি ঘর হয়? ছইকে কি ছাদ বলে?'

নতুন জোয়ারের কুলকুল শুনতে-শুনতে তরী গান ধরল:

পিরদিমখানা নিবু নিবু মিটমিটিয়া জ্বলে,
বেউলা বাড়ায় সইল্‌তাটিরে কনিষ্ঠ অঙ্গুলে।
সেই যে তৈল মোছে বেউলা সিঁথির উপরে,
কালনাগিনী বলে এবার দোষ পেয়েছি ওরে।
রে বিধির কি হইল!

গান শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি ইয়াসিন। ঘাসের শাঁস ফেলে তরী ইয়াসিনের মুখে-কপালে আঙুল বুলুতে লাগল। চোখের পাতায়, চুলের মধ্যে।

এই হচ্ছে দ্বিতীয় কৌশল। দিব্যির কোঠায় ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছে এই বলে আঁৎকে উঠবে তরী আর দারোয়ানী কাঞ্চনী ছোঁ মেরে আদায় করে নেবে জরিমানা। ব্যামো সারাতে এসে এ-সব কী কেলেংকারি। দিব্যির ঘরকে অশুদ্ধ করে তোলা!

কিন্তু, কই, তরী আজ আর শব্দ করে না কেন?

ইয়াসিনের মাথাটা তরী অতি নিঃশব্দে তার কোলের মধ্যে তুলে নিল। প্রায় তার নিশ্বাসের কাছাকাছি।

তন্দ্রা ভেঙে গিয়েছে ইয়াসিনের। এই কি জল না মাটি! ঢেউ না পাহাড়!

'এ কোথায় আমরা, তরী? এ দিব্যির ঘর নয়?'

'চুপ, চুপ।' তরী নিশ্বাস বন্ধ করে আবছা গলায় বললে।

'দিব্যির ঘর, তবু তুমি আমাকে ছুঁয়ে রয়েছ, ধরে রয়েছ!' ইয়াসিনের গলায় বিবর্ণ ভয়।

মরা-গলায়, পাথুরে গলায় তরী শুধু বলছে, 'চুপ, চুপ!'

কাঞ্চনীর কানকে ফাঁকি দেয়া গেল না। সে শুনে ফেলেছে, নিজের চোখে দেখে ফেলেছে।

'আমি নয়, তরী—' বলতে যাচ্ছিল ইয়াসিন। তরীর মুখে এক শব্দঃ 'চুপ, চুপ!'

ইয়াসিন বেরিয়ে গেল চোরের মত। কাঞ্চনীর হাতে পঞ্চাশ টাকা গুনাগার দিলে।

কিন্তু কাল কি আর ইয়াসিন আসবে?

পরদিন ছইয়ে বসে মাছ ধরল না বঁড়শিতে, ডাঙা-পথে তরী ঘোরাঘুরি

করতে লাগল। হাওয়ায় ঝরা-পাতা উড়ছে, বলছে, চুপ-চুপ। বলছে ঐ পাখিটা। পারের কাছেকার জলের ঘুরুনি।

নিশ্চুপ আজ নৌকোর অন্ধকার।

ইয়াসিন আসবে না, কিন্তু থানা থেকে দারোগা আসবে তদন্তে। কে একটা মিশশিকারী মেয়ে ভুঁইয়া সাহেবের ছেলেকে গুণ করছে, ঐ মেয়েকে ছাড়া আর কাউকে সে সাদি করবে না, তার থেকে টাকা খসিয়েছে নাকি অনেকগুলো। গুণ থাকলেই গুণ করে। হাতসাফাই জানলেই টাকা খসানো যায়। কিন্তু তা হলে কি, দারোগা সাহেবও টাকা খেয়েছে ভারি হাতে। এ অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেবে তাদের।

সকাল বেলার জোয়ারে বহর ছেড়ে দিল। তরী আর কাঞ্চনী হাল-দাঁড় নিয়ে বসল। পারে দাঁড়িয়ে ইয়াসিন। জলে নামবে, না হাত ধরে তরীকে ডাঙায় তুলে নিয়ে আসবে, যেন দেহ-মনে দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

তরী গান ধরল :

কোথায় তুমি প্রাণপতি কোথায় তুমি স্বামী,
বিয়ার রাতে কাঞ্চা চুলে রাঁড়ী হইলাম আমি।
অফুরন্ত নদী-নালা এই ধারে ওই ধার,
চোখের পানি সাঁতারিয়া যাইব পরপার।
রে বিধির কি হইল!

বুড়িকে কে তামাক সেজে দিচ্ছে। ঠাহর করে চেয়ে দেখল, তাদের সেই হালিয়া। সেকেন্দর।

'সে কি! তুই যাচ্ছিস কোথা?' ইয়াসিন চমকে উঠল।

'আমি চলেছি নৌকার মানুষ হয়ে নয়, সাধারণ চাকর হয়ে। দাঁড় টানব, মাছ ধরব, কাঠ কাটব। মন্তর শিখব। বাদিয়া হয়ে যাব। আসবেন আপনি?'

'চুপ! চুপ!' চোখ পাকিয়ে তরী ধমক দিয়ে উঠল সেকেন্দরকে।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব খুব একটা ধূমকেতুবৎ-কিছু না হলেও, বিস্ময়কর ঘটনা বৈ কি। হাসির গল্পের অভাব এদেশে আছেই—বাংলাদেশ নাকি কাঁদতে ও কাঁদাতেই পারে, হাসির স্থান এখানে কম। এ দুর্নাম মোচন করেন ইদানীংকালের কথা-সাহিত্যে পরশুরাম ও কেদারনাথ। পরশুরামের দান খুব কম—মানে, সংখ্যায় কম। কেদারনাথ অনেক লিখেছেন কিন্তু তাঁরও লেখনী আজ স্তব্ধ। বিভূতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দানও যেমন অপর্যাপ্ত, রসও তেমনি বিচিত্র তাঁর রচনায়। হাস্যমধুর, হাস্য-বেদনায় মেশানো, গম্ভীর—সব রকমই পাই। বরযাত্রী, রাণুর গল্পগুলি ও নীলাঙ্গুরীয়—তিন রকমের এই তিনটি উদাহরণ দিলেই পাঠকরা বুঝবেন। এই তিন শ্রেণীতেই তাঁর লেখনী নিজের বিপুল ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে, যদিচ হাসির গল্পের জন্যই তিনি বিখ্যাত। তাঁর হাসি খোঁচা দিয়ে হাসানো হা-হা ক'রে হাসি নয়, কিংবা লেখক সেখানে আগে হেসে বসে থাকেন না—মিষ্ট হাস্যমধুর রচনাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। বরযাত্রী প্রভৃতি গল্প একটু উচ্চ-হাস্যের সুযোগ দেয়, কিন্তু তাও স্বতঃস্ফূর্ত। ইনি দ্বারভাঙ্গার লোক, অবিবাহিত। ছাপা-খানার কাজে এঁর দক্ষতা আছে। ছবি আঁকতেও জানতেন।

গোলাপী রেশম

তারাপদ বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিল, "তোমার হয়েছে কি শৈলেন? একটা মনি-অর্ডার নিতে যে হিমসিম খেয়ে গেলে! দুবার দুজায়গা ভুল করে কোন রকমে দস্তখৎটা তো সারলে, এখন আবার তারিখ নিয়ে ও কি কাণ্ড করছ?"

শৈলেন নিতান্ত অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি কলমটা তুলিয়া লইয়া বলিল, "ও, হ্যাঁ, তাইতো! উনিশ শ' ছত্রিশ লিখছি কি বলে!..."

তাহার পর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "কত সাল যাচ্ছে বল তো এটা?"

পিওন বলিল, "আটত্রিশ পড়েছে বাবু।"

"ঠিক তো! দেখ, মনেই ছিল না।" আরও বেশি রকম অপ্রতিভ হইয়া ব্যস্তভাবে তারিখটা শুধরাইয়া টাকা কয়টা না গুনিয়াই পকেটে ফেলিয়া পিওনকে সে বিদায় করিল।

তারাপদ ভ্রূ তুলিয়া গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল, "এত অন্যমনস্ক, ব্যাপার কি বন্ধু?"

"কৈ, অন্যমনস্ক হইনি তো!"

"হয়ে-যে-ছিলে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই, অধিকন্তু 'এখনও রয়েছ। আর গোপনের বৃথা চেষ্টা না করে কারণটা বলে ফেল দিকিন। কবি মানুষ, নতুন বসন্ত পড়েছে, আমি তেমন ভাল বুঝছি না।"

শৈলেন একটু লজ্জিতভাবে হাসিল, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর আর একবার তাগাদা খাইয়া বলিল, "নিতান্তই ছাড়বে না তা হ'লে?"

তাহার পর জানালার বাহিরে খানিকটা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "সাল ভুল করার জন্যে আমায় দোষ দিও না, আমি ১৯৩৮ সালে ছিলাম না খানিকক্ষণ, বোধ হয় এখনও ঠিকমত নেই।"

তারাপদ একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়া ছিল, শুইয়া পড়িয়া বলিল, "এইচ-জি-ওয়েল্‌স্‌-কল্পিত 'টাইম-মেশিনে' তুমি যে কোন দূর-ভবিষ্যতে কিংবা দূর-অতীতে পাড়ি মেরেছ তা বুঝতে পেরেছি। একটু পরিচয় দাও তোমার প্রবাস-যাত্রার, শোনা যাক্।"

শৈলেন বলিল, "ভবিষ্যৎ তো মরুভূমি, সে দিকে গিয়ে কি করব? গিয়েছিলাম অতীতে, আজ থেকে ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান। সেখানে, কোন একটি শান্ত পল্লীগ্রামে রাধারমণের মন্দিরের পাশে উঁচু রকের ছায়ায় একটি ছোট মেয়ে খেলা করছে, তার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম।"

তারাপদ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তার পাশটিতে একটি ছোট ছেলেও আছে।"

শৈলেন চোখ না ফিরাইয়াই বলিল, "আছে; তার নাম রাখা যাক্ শ..." তারাপদ বলিল, "শ-এর আড়ালে 'শৈলেন' তেমন ঢাকা পড়ছে না, তুমি স্পষ্টাস্পষ্টি আত্মপ্রকাশই কর। আর পবিত্র মন্দিরের পাশে একটি বালিকার সঙ্গে খেলা করছ বলে এই ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান থেকে কানমলা দেবে এমন লম্বা হাত কারুর নেই।"

শৈলেন দৃষ্টি ফিরাইয়া হাসিল। একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "তোমায় পূর্বে কখন বলেছি—ছেলেবেলায় আমার অভিভাবকেরা আমার পড়াশুনোর সুবিধে হবে বলে তাঁদের কাছ থেকে অনেক দূরে বাংলায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন —কেন না, তাঁরা থাকতেন দূর পশ্চিমাঞ্চলে। আমিও এই সুবিধে পেয়ে পাঠশালা আর গুরুমশাইকে আমার নিজের কাছ থেকে খুব দূরে দূরে রাখতাম। বিদেশে পুত্রবিরহকাতর বাপ-মা যখন ভাবতেন, আমি গুরু-মশাইএর উদ্যত ছড়ির নীচে বিদ্যাকর্ষণ করে যাচ্ছি, সে সময়টা আসলে আমি রাধারমণের মন্দিরের পাশে বেশ মাঝারি গোছের একটি দল জুটিয়ে অভিরুচি-মত নানা রকম খেলায় মশগুল। দলের মধ্যে ছেলে-মেয়ে উভয়েই ছিল। তার মধ্যে একটি ছেলের পরিচয় দেওয়া আপাতত দরকার। ছেলেটার নাম ছিল..."

তারাপদ টুকিল, "লেডিজ্ ফার্স্ট!"

শৈলেন হাসিয়া বলিল, "আমারও ইচ্ছে ছিল, শুধু তুমি কি মনে করবে সেই ভয়েই আগে ছেলের পরিচয় দিতে যাচ্ছিলাম।...যাক্; মেয়েটির নাম ছিল চারু, আমরা চারী বলে ডাকতাম। যখনকার কথা বলছি তখন তার বয়েস হবে—এই বছর আষ্টেক। চওড়া চওড়া গড়ন, ঘোরালো মুখ, মাথায় বেড়া বেণী; একটা তিন পেড়ে কাপড় খাট করে পরা, আঁচলটা কোমরে

মোটা করে জড়ানো। পায়ে একজোড়া হাঙর-মুখো মল ছিল, সে যুগে প্রায় সব মেয়ের পায়েই থাকত।

"এর ওপর চারীর ছিল টক্‌টকে রং, যা বাংলার পল্লীগ্রামে দুর্লভ বলে টপ করে একটা বিশিষ্টতা এনে দেয়।

"চারীর বাড়িতে শুধু ছিলেন তার বাপ আর ঠাকুরমা। মেয়েদের পক্ষে শুধু বাপ আর ঠাকুরমা থাকা মানে যোল আনা আদর। চারুর মা ছিলেন না, অর্থাৎ এই আদরের মধ্যে কোথাও শাসনের বালাই ছিল না। এর ফলে চারুর ছিল পূর্ণ-স্বরাজ এবং সেই জন্যে সে আমার সমস্ত প্ল্যানগুলি পরিপক্ক করে তুলতে আর-সবার চেয়ে সময় দিতে পারত। আমি ভুল বলছি, বরং অধিকাংশ প্ল্যান তারই মাথায় জন্ম নিত এবং তারই দক্ষতায় দানা বেঁধে উঠত। সময়ের অভাব না থাকায় আমি তার হুকুম তামিল করে মতলবগুলি কাজে রূপান্তরিত করতে অন্য ছেলের চেয়ে বেশি সাহায্য করতাম মাত্র!

"আমরা যেখানটায় খেলা করতাম, সে জায়গাটা ছিল বেশ নিরিবিলি। তার একদিকে রাধারমণের মন্দির আর দুদিকে দেয়াল। সামনেটা খোলা ছিল বটে কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা মাঠ, আর মাঠের শেষে আগাছার জঙ্গল। বাড়ি-ঘর নেই। ঘর-বাড়ি যা কিছু তা মন্দিরের পেছনে কিংবা দেয়াল দুটোর আড়ালে। অর্থাৎ, জায়গাটা গ্রামের শেষ প্রান্তে আর কি।

"খেলার রকমারি ছিল বুঝতেই পার। কখনও পাঠশালা-পাঠশালা খেলা হত। আমি ছিলাম পাঠশালার কায়েমী পলাতক; সুযোগ-সুবিধে পেয়ে রোজ গড়পড়তা আরও চার-পাঁচটি করে ফেরার জুটত—স্কুল পাঠশালা মিলিয়ে। বেতটা বাদ দিয়ে আর সব বিষয়েই জিনিসটি স্বাভাবিক করবার চেষ্টা করা হত। এমন কি, অনিচ্ছুককে চ্যাং-দোলা করে টাঙিয়ে নিয়ে আসাও বাদ যেত না, আর যাকে টাঙিয়ে আনা যেত, সেও হাত-পা ছোঁড়া এবং অশ্রাব্য গালাগালি প্রয়োগে নকলটিকে সাধ্যমত আসল জিনিসে দাঁড়

করাবার চেষ্টা করত। কখনও কখনও এমন হত যে, ব্যাপারটা অভিনয়ের কোটা থেকে সত্যই বাস্তবে এসে দাঁড়াত। হঠাৎ কোথা থেকে স্কুল বা পাঠশালের সত্যিকার পোড়োরা এসে পড়ত, এবং যাকে শখের চ্যাং-দোলা করে আনা হচ্ছে আর যারা আনছে তাদের সবাইকে আসল চ্যাং-দোলা করে লটকে' নিয়ে তারা অদৃশ্য হয়ে যেত। আমি গুরুমশাই হয়ে পাঠশালাতে থাকতাম বলে, কিংবা চারু গুরুমশাই হলে শিরপোড়ো হয়ে তার তামাক সাজতাম বলে, পালে বাঘ পড়লেই দূর থেকে গা-ঢাকা দিতে পারতাম। চ্যাংদোলা হইনি কখনও।

"মাঝে মাঝে এই রকম আকস্মিক রসভঙ্গের জন্যে, এ-খেলাটার প্রতি আন্তরিক টান থাকলেও বড় বেশি সাহস করা যেত না। এ-ভিন্ন কানামাছি ছিল, কুমীর-কুমীর ছিল, পাড়ার নিত্য দলাদলির নকল ছিল। কিন্তু সবচেয়ে যা বেশি হত তা অভিনয়ের অভিনয়, অর্থাৎ যাত্রার অনুকরণ।

"সে-সময় আমাদের গ্রামে ও-জিনিসটার খুব চল। নিম্নশ্রেণীদের দুটো যাত্রার দল ছিল, ভদ্রলোকদের একটা অপেরা পার্টি। গ্রামের কয়েকটা ছেলে কলকাতায় পড়ত, তারা শহরের আনকোরা আধুনিকতা আমদানি করে একটা থিয়েটার ক্লাব পর্যন্ত দাঁড় করিয়েছিল। চারটি দলে যা করত, আমরা দুপুরে মন্দিরের পাশটিতে তার পুনরভিনয় করতাম। যাত্রাটাই আমাদের বেশি অ্যাপীল্ করত; তবে থিয়েটারের সীনের দিকে একটা ঝোঁক ছিল, সেইজন্যে প্রায়ই থিয়েটারের স্টেজে যাত্রার পালা ঢেলে অভিনয় করতাম। কেউ আনত গায়ের র‍্যাপার, কেউ মায়ের কস্তাপেড়ে শাড়ি, কেউ দিদিমার নামাবলী। নামাবলীটা হত অরণ্যের সীন্, নামের জঙ্গলকে আমরা গাছের জঙ্গল করে নিয়েছিলাম আর কি। পুকুর দেখাতে হলে নামাবলীর মাঝখানটায় ছিঁড়ে দেওয়া হত। ধ্রুবের মা সুনীতি অরণ্যে ঘুরে ঘুরে তৃষ্ণার্ত হয়ে জল খাচ্ছেন দেখাতে হলে সুনীতি হাতদুটো অঞ্জলিবদ্ধ করে নামাবলীর

ছেঁড়া দিয়ে ভেতর দিকে গলিয়ে দিত এবং ওদিক থেকে ঘটি করে একজন জল ঢেলে দিত,—বাস্তবিকতার নেশায় কখনও কখনও পানাসুদ্ধ! পুকুরে জল খাবার এমন কৌশল আর কোন পার্টিই দেখাতে পারত না বলে এই সীনটি আমাদের সকলের বড় প্রিয় ছিল। ফলে, নামাবলী পাওয়া গেলেই ধ্রুবের পালা অনিবার্য ছিল, আর ধ্রুবের পালার ফাঁড়া কাটিয়ে কোন নামাবলীকেই কখনও অক্ষত শরীরে ফিরে যেতে হয়নি।

"এই সব অভিনয়ে মেন-পার্ট থাকত চারুর। সে মল দুগাছা হাঁটুর কাছে তুলে, বেটাছেলের মত কাপড় প'রে, 'দ্রৌপদীর স্বয়ংবর'এ অর্জুন হয়ে লক্ষ্য বিঁধত, 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস'এ ভীম হয়ে কীচক বধ করত, শ্রীকৃষ্ণ হয়ে কংস ধ্বংস করত। মেয়ের পার্ট বড় একটা নিত না; শুধু 'সুভদ্রা-হরণ'এ গোবরার মুখে লাগাম কসে অর্জুনের রথ হাঁকিয়ে যাবার লোভে সে সুভদ্রা সাজত।

"এই পালাটির জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে থাকতাম। কেন, সে কথা বলবার আগে গোবরার পরিচয়টা দেওয়া দরকার।

"পরিচয়টি আগেই পেতে, কিন্তু তুমি নিজেই বাধা দিয়েছিলে, মনে থাকতে পারে।

"গোবরা আমাদেরই পাঠশালার ছেলে, আমার পরে ভর্তি হয়। দুবেলা এক কোঁচড় করে মুড়ি এনে পাঠশালায় বসে বসে খেত, আর মুড়ি বিলি করে দল পাকাত। এ দিকে মাথা খেলত মন্দ না, তবে পড়াশুনোর দিকে বড় একটা ঘেঁসত না। তার সঙ্গে আমার এই দ্বিতীয় বিষয়ে মিল ছিল এবং এরই বলে তাকে ক্রমে পাঠশালা ছাড়িয়ে আমাদের দলে ভেড়ালাম। ভুল হয়ে গিয়েছিল; যাকে বলে খাল কেটে কুমীর ঢোকানো, তাই করেছিলাম আর কি। গল্পটা শেষ পর্যন্ত শুনলেই বুঝতে পারবে।…

"আচ্ছা, একটা কথা বিশ্বাস করতে পারবে?"

তারাপদ বলিল, "কি ?"

"এই যে, আমি চারুকে ভালবাসতাম।"

তারাপদ সবিস্ময়ে বলিল, "ভালবাসতে ? তখন যে তোমরা দুগ্ধপোষ্য !"

শৈলেন অবিচলিতভাবে বলিল, "ভালই যদি না বাসতাম তো সর্বদা ওর কাছে কাছে থাকতাম কেন ? আর কেনই বা হাজার কাছে থেকেও মনে হত যথেষ্ট কাছে নেই ? এরই বা কারণ কি যে, ক্রমাগতই ইচ্ছে হত চারু একটা কিছু বিপদে পড়ুক, খুব মারাত্মক রকম বিপদে, যেমন ভূতে তাড়া করা, কিংবা হাতীতে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরা, কিংবা মাঝগঙ্গায় নৌকো থেকে পড়ে যাওয়া—আর আমি তাকে উদ্ধার করি। ভালবাসার লক্ষণ নয় ? তা ভিন্ন, পাঠশালা থেকেও যে কায়েমী ভাবে অনুপস্থিত থাকতাম, তারও মূলে ছিল চারুর প্রতি অনুরাগ, শুধুই গুরুমশাইএর প্রতি বিরাগ নয়।

"একদিন দুপুরে 'সুভদ্রা-হরণ' হবে ঠিক হয়েছে। আমার মনটা খুব হৃষ্ট, কেননা এই পালায় আমি সাজতাম অর্জুন। সকালে পাঠশালায় গেলাম—রথের ঘোড়াকে খবর দেবার জন্যে। তখন ঘোড়া সাজত নিবারণ। খবর পেলাম, সে চার-পাঁচ দিন আসেনি। গোবরা ওদের পাড়ার ছেলে ; জিগ্যেস করতে বললে, 'তার ক'দিন থেকে অসুখ।' দুশ্চিন্তায় পড়া গেল।

"একটু পরে গোবরা প্রশ্ন করলে, 'কেন রে নিবারণকে ?'

"ছেলেটা নালিশ করতে এক নম্বর। এর কাছে সব কথা হুট্ করে বলা নয় ; বললাম, 'না, এমনি।'

"কিন্তু ঘোড়ার ভাবনায় মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে রইল। একটু পরে একটা টোপ ফেলে দেখলাম ; বললাম, 'আজ আমাদের ওখানে যাত্রা হবে কিনা...'

"গোবরা স্লেটে একটা বর্তুলাকার মুখ এঁকে তাতে দাঁত বসাচ্ছিল। মুখ না তুলেই জিগ্যেস করলে, 'কার দল রে ? মথুর সা'র ? তার দল হলে একবার দেখতাম।'

"আমি উত্তর করলাম, 'কেন, মথুর সা'র চেয়ে ভাল দল আর হতে নেই ?'

"একটু উৎসুক ভাবে প্রশ্ন করলে, 'কি পালা রে ?'

"বললাম, 'সুভদ্রা-হরণ।'

"গোবরা আমার মুখের দিকে চাইলে। তার পর আবার নির্লিপ্ত ভাবে দাঁত আঁকতে লাগল। আমি জিগ্যেস করলাম, 'যাবি নাকি ?'

"গোবরা একটু নিরাশভাবে বললে, 'না ভাই, পাঠশালা রয়েছে যে।'

"আমি বললাম, 'ঠাকুর-দেবতার পালা দেখলে আবার নাকি দোষ হয়!'

"পাশের অনাথকে সাক্ষী মানলাম। সে কম কথায় সারে, বললে, 'দোষ হলে আর পাঠশালায় বসে পেল্লাদ কেষ্ট-নাম করত না।'

"আমি উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'তুই যাবি নাকি তা হলে ?'

"অনাথ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নাক সিঁটকে বললে, 'ধ্যাৎ!'

"গোবরা সেদিন ধরা দিলে না। কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখা গেল নিজেই নিবারণের সঙ্গে হাজির হয়েছে। সেদিন আমাদের 'রিজিয়া', দুদিন আগে কলেজের ছেলেরা প্লে করেছিল। নিবারণের পার্ট ছিল না। সে আর গোবরা অডিয়েন্স হয়ে স্টেজের বাইরে দুখানা চেয়ার নিয়ে বসল। ঘাবড়ো না, 'চেয়ার' মানে অবশ্য থান ইঁট।

"নতুন দর্শক পেয়ে খুব চুটিয়ে প্লে করা গেল। ওঠবার সময় গোবরা বললে, 'তোরা করিস্ ? তবে যে বললি, মথুর সা'র চেয়েও ভাল দল ?'

"আমি মনে মনে চটলাম। বললাম, মথুর সা'রা পেশাদার···'

"তার পর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল ; বিজয়গর্বের সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, 'মথুর সা'র দলে সত্যিকার মেয়ে আছে ?'

"গোবরা ঠোঁট উল্‌টে বললে, 'আহা, সত্যিকার মেয়ে হলেই যেন হল! তোদের রিজিয়া না হয় মেয়েই, কিন্তু অন্তার দাদার কাছে দাঁড়াতে পারে ?'

"আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম, বললাম, 'খুব বুঝেছিস তো ! রিজিয়া মেয়ে ছিল নাকি ? ও তো পেনোর ভাই, ওর মাথায় ওটা বাবরি চুল।'

"তারকেশ্বরের মানত চুল নিয়ে পেনোর ভাই হারাধন খুব ঠকিয়েছে দেখে আমি আর হাসি সামলাতে পারছিলাম না। এমন সময় অন্য সবার সঙ্গে চারু এসে সামনে দাঁড়াল। ঝুঁকে পায়ের মল নামাতে নামাতে জিগ্যেস করলে, 'কিরে শৈল, হাসছিস্ কেন এত ?'

"সে সেজেছিল বক্তিয়ার, তিনপেড়ে শাড়ির মালকোঁচামারা বক্তিয়ার! বললাম, 'এ তোকে ভেবেছে বেটাছেলে আর হারাধনকে ভেবেছে মেয়েমানুষ !'

"সকলে আবার হেসে উঠলাম।

"চারু একটু গম্ভীর হয়ে, একটু হেসে, চোখ দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, 'এবার থেকে তোরা আমায় চারু-দা বলে ডাকবি, খবরদার !'—সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা আলগা করে হো-হো করে হেসে উঠল।

"গোবরার অবস্থাটা যা হল তা আর বর্ণনা করে কাজ নেই, শুধু কাঁদতে বাকি রৈল বেচারির। মুখ রাঙা করে বললে, 'রোসো, তোমাদের সবার ভিরকুটি ভাঙছি গুরুমশাইকে বলে—মেয়েদের সঙ্গে মিশে এই সব খেলা হয় বাবুদের ! নিবারণ, তোমারও এই বিদ্যে ! বেশ···'

"নিবারণ বললে, 'দিস্ বলে ; ভারি ভয়, ওঃ !'

"চারু একটু এগিয়ে এল, গলা বাড়িয়ে বললে, 'তুই মেয়েমানুষ দেখলি কোথায় রে এর মধ্যে ? আমি তো চারু চন্দোর ভট্টাচার্য !' বলে সোজা হয়ে গম্ভীর হয়ে দাঁড়াল। আর একটা হাসির রোল উঠল।

"তার পরদিন বিকেলে পাঠশালার ফেরত গোবরা আবার এসে হাজির। বললে, 'চল সব, গুরুমশাই ডেকে পাঠিয়েছেন।'

"বিকেলে তখন অনেক ছেলে জুটেছে, তুমুল বেগে কি একটা হুটোপাটি খেলা হচ্ছে, কেউ ওর কথায় বড় একটা কান দিলে না। শুধু পাঁচী বলে একটা মেয়ে খেলার মাঝেই শরীরটা অষ্টাবক্র করে হাতের আঙুলগুলো ছেতরে গোবরার কথাগুলোই বিকৃত করে ভেংচে উঠল। তার পর আর কেউ ওর কথা ভাবলেও না, এবং অনেকক্ষণ পরে খেলার মাঠে একটা ছেলের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে পড়ে গিয়ে যখন ঝেড়ে-ঝুড়ে উঠলাম—দেখি ছেলেটা আর কেউ নয়—আমাদের গোবরা।

"সেই থেকে গোবরা ভিড়ে গেল আমাদের দলে। অবশ্য রোজ আসত না, তবে খুব বেশি দেরিও করত না, আর যত দিন যেতে লাগল ততই তার হাজির ঘন ঘন হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমে আমাদের থিয়েটারের অডিয়েন্স হওয়া থেকে একদিন স্টেজের উপর তার প্রোমোশন হল।

"সেদিন আমাদের 'রাধারমণ থিয়েটার পার্টি'র—আজকালকার ভাষায় বলতে গেলে—শ্রেষ্ঠ অবদান…'সুভদ্রা-হরণ'। অশ্বিনীকুমার নিবারণ অনুপস্থিত—ঘোষালদের কাচ-বাঁধানো দেয়াল টপকে' বেল পাড়তে গিয়ে তার খুরে কাচ বিঁধে গেছে।

"গোবরা ছিল, তাকে বললাম, 'তুই ঘোড়া হ গোবরা, হবি ?'

"গোবরা বললে, 'যাঃ, ঘোড়ার পার্ট আবার মানুষে করে !'

"একটু থেমে বললে, 'যদি করি তো ও-রকম পেছনে ঝাঁটা বেঁধে ন্যাজ করতে পারব না।'

"অগত্যা লাঙুলহীন ঘোড়াই নামানো হল সেদিন। স্টেজে নেমে কিন্তু চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দ করে, ঠোঁট কাঁপিয়ে, লাগামে ঝাঁকানি দিয়ে এবং পেছনের নারকেল-ডেঁপোরের রথে অর্জুন আর সুভদ্রাকে দু একটা লাথি ঝেড়ে ঘোড়া সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলে ! এক মুহূর্তেই প্লে'টার চেহারা বদলে' গেল। খুশিতে, বিস্ময়ে চারু তো স্টেজের মর্যাদা ভুলে হাততালি দিয়ে

চেঁচিয়েই উঠল।

"তখুনি সীন নামিয়ে দেওয়া হল। একটু পরে যখন আবার সীন্ উঠল, বিস্মিত অডিয়েন্স দেখলে ঘোড়ার পেছনে অস্তাদের লক্ষ্মীনারায়ণের রুপোর চামর বাঁধা, আর সুভদ্রা আর তারকেশ্বরের চুলওয়ালা নকল-মেয়ে হারাধন নয়, স্বয়ং চারু।

"এই দারুণ সীনটির লোভে চারু কায়েমী ভাবে সুভদ্রার পার্ট নিলে, একাদিক্রমে চার দিন এই খেলাই চলল। সে যুগে এটা রেকর্ড।

"চারু গোবরার এত ভক্ত হয়ে পড়ল যে, কোথা থেকে খুঁজেপেতে একটা সম্বন্ধও বের করে ফেললে—গোবরা তার ভাই হয়।—অর্থাৎ এত বড় একটা স্টার-অ্যাকটারের সঙ্গে আত্মীয়তা না বের করে সে সন্তুষ্ট হতে পারল না।

"আমার কিন্তু মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। বুঝতে পারলাম আমার ভালবাসার ক্ষেত্র আর মসৃণ নয়—গোবরা হতভাগাও মজেছে, সেও…"

তারাপদ, "থামো!" বলিয়া, হাতটা বারণের ভঙ্গিতে উঁচু করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, বলিল, "নিঃসাড়ে, নির্বিবাদে শুনে যাচ্ছি বলে তুমি যে দস্তুরমত রোমান্স ফেঁদে বসলে দেখছি হে! একটি মেয়ে, ছুটি ছেলে—that damnod eternal triangle again (সেই শাশ্বতী ত্রয়ী)! মতলব-খানা কি বল দিকিন?"

শৈলেন বলিল, "হিংসে আছে, দ্বেষ আছে, চক্রান্ত অভিসন্ধি, এমন কি হত্যা পর্যন্ত…রোমান্স বলতে আপত্তি থাকে, ব'লো না।…

"নানাভাবে লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে লাগল। প্রথম প্রথম গোবরা আমাদের বেশ একটু চোখে চোখে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। খেলার মধ্যে আমরা দুজনে, অর্থাৎ আমি আর চারু, একটু কাছে কাছে থাকতাম, কেননা আর সবার তুলনায় আমাদের দুজনের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতাই ছিল। প্রায় দেখতাম, আমরা খুব ঘেঁসাঘেঁসি হতেই গোবরার বক্রদৃষ্টি আমাদের

ওপর এসে পড়েছে। চারু কিছু বুঝত না, কেননা তার মনটা ছিল নি-দাগ, আমি কিন্তু একটু থতমত খেয়ে যেতাম, কেননা আমি চারুর সান্নিধ্যটা বেশ একটু সূক্ষ্মভাবে উপভোগ করতাম।

"এমনও হয়েছে—দুপুরবেলা, রোদ ঝাঁঝাঁ করছে, আমার মত নিতান্ত এলে-দেওয়া ছেলে এবং চারুর মত নেহাৎ আদরে-গলা মেয়ে ভিন্ন কেউ বাড়ির বা'র হতে পারে না। আমরা দুটিতে মন্দিরের রকের কোণে বেল-গাছের ছায়ায় পাশাপাশি বসে গল্প করছি, হঠাৎ গোবরা নিতান্ত একটা অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরুল। আমাদেরই আশ্চর্য হবার কথা, সে কিন্তু আগে ভাগেই কপালে চোখ তুলে প্রশ্ন করলে, 'তুই এখানে, শৈলেন? আর আমি চারিদিক্ খুঁজে হয়রান হচ্ছি?'

"চারু হয়তো প্রশ্ন করলে, 'কেন রে গোবরা?'

"'ওকে গুরুমশাই ডেকেছেন।'

"'কেন?'

"'কেন তা ও-ই জানে আর গুরুমশাই জানে। আর, ডাকবে না? রোজ রোজ পাঠশালা কামাই করে এখানে এসে একলা বসে থাকা···'

"চারু বললে, 'একলা কেন? এই তো আমি রয়েছি।'

"এর উত্তর গোবরা দিলে না। আমিও চুপ করে রইলাম। একটু পরে গোবরা বললে, 'চল্ শৈলেন, বসে রইলি যে?'

"আমি রেগে-মেগে বললাম, 'যাঃ, যাব না।'

"গোবরা বললে, 'তা হলে যাই আমি, বলে দি'গে যে···'

"আমি তাই চাই—বেশ জমাট গল্প চলছিল, আপদ বিদেয় হলেই বাঁচি, বললাম, 'যা, এক্ষুনি যা,···যাচ্ছিস না যে?'

"গোবরা বললে, 'তোর হুকুম?'

"চারু বললে, 'তার চেয়ে তুইও আয় না গোবরা, একটু পরেই তো

নন্তী, ফেলা, এরা সবাই আসবে।'

"গোবরা অবশ্য আসতেই চায়, কিন্তু আসে না। বলে, 'হ্যাঁ, শৈলর সঙ্গে আমায় কেউ দেখে ফেলুক!'

"ছবিটি আমার যেন চোখের সামনে ভাসছে। চারু আঁচলটা দাঁতে কামড়ে' রকের নীচে পা নামিয়ে গোড়ালি ঠুকে ঠুকে মল বাজাচ্ছে, সমস্ত শরীরটাও দুলছে, আমার পা দোলানো বন্ধ হয়ে গেছে—খানিকটা দূরে সিঁড়ির ও-দিকটায় গোবরা দাঁড়িয়ে। গোবরার শেষের কথাটায় কি ছিল, চারু একেবারে 'হো হো' করে হেসে উঠল। বললে, 'তা হলে শৈল না থাকলে আসবি তো? তুই যা তো শৈল।'

"সঙ্গে সঙ্গে গলাটা বাড়িয়ে নিয়ে এসে আমার কানে কানে বললে, 'তুই অমনি ঘুরে পাঠশালা থেকে সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়, উল্টে ওকেই চ্যাং-দোলা করে নিয়ে যাক্…'

"তার পর কি যে হল মনে পড়ছে না; ছেলেবেলার অনেক ছবিই তো খানিকটা খানিকটা ঝাপসা হয়ে যায়?—তবে গোবরা-ঘটিত আর-এক দিনের কথা সমস্তটাই স্পষ্ট মনে আছে। চারুকে মন্দিরে না পেয়ে তার বাড়িতে গেলাম। দেখি, ঘরে বারান্দায় বাঘবন্দীর ছক্ কেটে চারু আর গোবরা একাগ্রচিত্তে খেলায় মগ্ন। গোবরার পাশে পাঠশালার বই-শ্লেট রাখা। চারু একবার চোখ তুলে আমার দিকে চাইলে, কিন্তু বোধ হয় খুব অন্যমনস্ক ছিল বলে কিছু বললে না। গোবরা আমার দিকে পেছন ফিরে ছিল।

"আমার গায়ে যেন আগুন ছড়িয়ে দিলে। ছেলেবেলার কণ্ঠে যতটা কটুতা ভরা যায়, আর নেহাৎ কমও যায় না—ততটা ভরে বললাম, 'হ্যাঁ রে গোবরা, আর নিজের বেলায় বুঝি পাঠশালা কামাই হয় না?'

"গোবরা চমকে' ফিরে দেখে যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"'বাঃ, আমি তো যাচ্ছিলাম পাঠশালা, আমার তেষ্টা পেয়েছিল, তাই…"

"'আহা, পাঠশালায় তো জল পাওয়া যায় না!…'

"চারু আধশোওয়া হয়ে খেলছিল, যেন ফণা ধরে উঠে বসল, হঠাৎ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললে, 'ও খাবে না পাঠশালার জল, তোর কি রে? আ-মর্! বাড়ি বয়ে কোঁদল করতে এল দেখ না! যা বেরো, ও যখন তোর বাড়িতে যাবে বলিস'খন। আ-গেল যা! নিজে সারাদিন টো-টো করে বেড়াচ্ছে, তাতে কিছু নয়, আর ও বেচারি…তুই উঠিস নি তো গোবরা, ও কি করে আমি দেখব…'

"আমি হন্ হন্ করে বেরিয়ে এলাম; রাগ ছিল, অভিমান ছিল, আর কি ছিল ঠিক মনে পড়ে না, তবে খানিকটা গিয়ে প্রায় যখন মন্দিরের কাছাকাছি হয়েছি, হঠাৎ আমার গলা বন্ধ হয়ে এল, চোখে কি যেন ঠেলে উঠতে লাগল এবং বাপ-মা প্রভৃতিকে অনেক দিন দেখিনি বলে আমি কাপড়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

"হতাশ প্রেমের অশ্রু এই রকম একটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা অবলম্বন করে উপছে ওঠে কি না, তোমরাই বলতে পার।

"তিন দিন যাইনি। চতুর্থ দিন চারু নিজে এসে আমায় ডেকে নিয়ে গেল। রাস্তায় একবার আমার কাঁধে হাত দিয়ে মুখের দিয়ে চেয়ে বললে, 'তোকে কথাগুলো বলে এত কষ্ট হয়েছিল, শৈল, মাইরি বলছি।'

"ছেলেবেলার ভাঙন দুকথাতেই জোড়ে, গেলও জুড়ে; তবে—গোবরা-ঘটিত ব্যাপারটা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠতে লাগল। গোবরা সেদিন খুব আস্কারা পেয়েছিল। তার পরেও যে তিনদিন যাইনি, সে তিনদিনও নিশ্চয়ই তার একাধিপত্য গেছে। সে যে ক্রমে ক্রমে আমায় পরাস্ত করে প্রতি-দ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র থেকে সরাচ্ছে, তাতে আর তার সন্দেহ ছিল না। এর পরেও দু একটা ব্যাপার ঘটল, যাতে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা পরিপুষ্ট হবার বেশ অবসর পেলে। তার পর একদিন সে মনের কথাটা স্পষ্টই বলে ফেললে।

"সেদিন আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ অবদান 'সুভদ্রা-হরণ'। প্রথামাফিক আমি সাজব অর্জুন, চারু সাজবে সুভদ্রা, গোবরা সাজবে ঘোড়া। ল্যাজের জন্যে পেছনে চামর বাঁধবার সময় কিন্তু হঠাৎ সে বেঁকে বসল, বললে, 'না, আমি ও সাজব না।'

"প্রথমে সকলে বেশ একটা কৌতুক অনুভব করলাম, গ্রামের যাত্রা-থিয়েটারে এইরকম প্রায় হয় বলে আমাদের যাত্রারও যেন কদর বেড়ে গেল। 'ঘোড়া বেঁকে বসেছে' বলে বেশ একটা আমোদ-মিশ্রিত রব উঠল। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঘোড়ার জিদে সব পণ্ড হয় দেখে সবাই চটে উঠল। কে একজন জিগ্যেস করলে, 'তবে, তুই কিসের পার্ট নিবি শুনি?'

"গোবরা খানিকটা গোঁজ হয়ে রইল, তার পর আরও সবার পীড়াপীড়ির পর ঘাড়টা বাঁকিয়ে বললে, 'আমি অর্জুনের পার্ট নেব।'

"সকলে এত বিস্মিত হয়ে উঠল, যেন সত্যিই একটা ঘোড়া অর্জুনে রূপান্তরিত হতে চাচ্ছে; কয়েকজন একসঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'অর্জুনের!'

"গোবরা বললে, 'বাঃ, কেন হব না? তুবার ঘোড়া সেজেছি বলে আমি যেন মানুষ নই! আমি শৈলর চেয়ে ঢের বড়, ওর চেয়ে ঢের সুন্দর। আর, ও আসুক দিকিন আমার সঙ্গে কুস্তিতে!'

"চারু একেবারে কপালে চোখ তুলে বলে উঠল, 'সে কি রে! তুই আমার সম্পর্কে দাদা হ'স না? বলতে তোর আটকাল না জিভে? তুই অর্জুন সাজলে আমার সুভদ্রা সাজা চলে? তুই যে অবাক্ করলি রে।'

"নন্তী গালে তর্জনী ঠেকিয়ে বললে, 'পাঠশালে পড়ে তোর এই বিদ্যে হচ্ছে গোবরা!"

"মাসখানেক থেকে পাঠশালে যে তার কোন বিদ্যেই অর্জন হচ্ছে না সে কথাটা অবশ্য কেউ তুললে না।

"নিবারণ বললে, 'আর তুই কুস্তিতে যদি শৈলকে হারাতে পারিস, তা

হলে তো তুই ওর দাদা ভীম হলি, চারী তা হলে তোর ভাদ্দর-বৌ হল না ?'

"সে দিনে আর প্লে হল না। ভালই হল, কেন না গোবরা আমার দিকে এমন ভাবে চাইলে, যাতে স্পষ্ট বোঝা গেল, সে ঘোড়া সাজলে একটি খুর যা ঝাড়ত, তাতে বীর অর্জুনকে আর এ জন্মে গাণ্ডীব তুলতে হত না।

"এর ফল এই হল যে, আমার আর চারুর সম্বন্ধটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্থাৎ, চারু সুভদ্রা হলে আমার অর্জুন হতে কোন দোষ নেই। বরং সব দিক দিয়ে আমিই যোগ্য।...তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, তারাপদ, এর পরে আমাদের দুজনের মনে মনে যেন একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল। করছ না বিশ্বাস ?"

তারাপদ বলিল, "বিশ্বাস করি আর নাই করি, ওর কাব্যটুকু উপভোগ করতে বাধা হচ্ছে না। কৈশোরের প্রেম বড় মধুর ; আমাদের ধর্ম তাই এ'কে দেব-মুখী করে শাশ্বত করে রেখেছে। সত্যিই নিজের শুদ্ধতার জোরে এ-প্রেম প্রেমাস্পদকে দেবতার সঙ্গে একাসনে..."

শৈলেন তারাপদর মুখের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে হাসিতে লাগিল ; বলিল, "ঠিক বলেছ, দেবতার সঙ্গে একাসনই বটে। সেই কথা বলব বলেই আজ এত কথার অবতারণা।

"সেদিন কি-একটা অজ্ঞাত কারণে সকাল থেকেই ভাল ছেলে হবার ঝোঁক চেপেছিল। খুব ভোরে উঠলাম। বইএর ছেঁড়া পাতাগুলি জেয়ল আঠা দিয়ে জুড়ে বইগুলোতে মলাট দিলাম, তার পর খাবার-টাবার খেয়ে বই-স্লেট নিয়ে পাঠশালায় বেরুলাম।

"রেল পেরিয়ে চারুর সঙ্গে দেখা ; জিগ্যেস করলে, 'কোথায় চলেছিস রে শৈল ? পাঠশালায় ?'

"মাথা নেড়ে উত্তর দিলাম।

"জিগ্যেস করলে, 'আজ আসবি না—?'

"বললাম, 'না। বাঃ, পাঠশালায় যেতে হবে না? শুধু তোদের সঙ্গে খেলা করলে চলবে আমার?'

"চারু শুধু ঠোঁটটা একটু উল্টে চলে গেল। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে জিগ্যেস করলাম, 'তুই কোথায় যাচ্ছিস রে?'

"বললে, 'সজনে ফুল কুড়ুতে ঘোষেদের পুকুরপাড়ে।'

"আমি আবার পাঠশালা পানে ঘুরলাম বটে, কিন্তু দুপা এগুতে পাঠশালা আর সজনে ফুল, অর্থাৎ গুরুমশাই আর চারুর দোটানায় পড়ে গতিটা শ্লথ হয়ে উঠল, এবং হঠাৎ যখন মনে হল, সজনে ফুল কুড়িয়ে বাড়িতে তরকারির সাহায্য করাও ভাল ছেলের একটা লক্ষণ, তখন বেশ একটা তৃপ্তি পেলাম।

"সেদিন সকাল বেলাটায় কিছু একটা ছিল। যেমন নিজেকেও খুব ভাল লাগছিল, ঘোষেদের পুকুর-পাড়ে চারুকেও তেমনি যেন বেশি করে মিষ্টি বোধ হচ্ছিল। তাকে ঝরে-পড়া ফুল কুড়ুতে দিলাম না, আমি থাকতে সে বাসি ফুল কুড়ুবে? গাছে উঠে ডাল ভেঙে ভেঙে টাটকা ফুলে তার কোঁচড় ভর্তি করলাম। কিছু আমও চুরি করে দিলাম। তার পর বাস্তবক্ষেত্রে আর তার কোন উপকার করবার উপায় না দেখে বললাম, 'আজ রিজিয়ার থিয়েটার করবি চারী?'

"মানে, তা হলে বক্তিয়ার সেজে বীরেন্দ্রসিংহকে হত্যা করা যায়। বইএ যাই থাক্ না কেন। চারুর জন্যে একটা প্রকাণ্ড কিছু না করতে পারা পর্যন্ত যেন স্থির হতে পারছিলাম না। যদি পারি তো বীরেন্দ্রের পার্টটা গোবরাকেই দোব।

"চারু একটা টোকো আম দাঁত নিয়ে কুরে কুরে খাচ্ছিল। চোখমুখ কুঁচকে বললে, 'না।'

"জিগ্যেস করলাম, 'কেন রে?'

"চারু বিরক্তভাবে বললে, 'সাজ নেই, কিছু নেই, আমি অমন নামাবলী গায়ে দিয়ে রিজিয়া সাজতে পারব না, যাঃ!'

"একটু আশ্চর্য হলাম, কেননা চারুর কোন কালে পোশাকের ফ্যাসাদ ছিল না। কথাবার্তায় রহস্যটা বোঝা গেল। আগের দিন শীতলাতলায় কলকাতার গণেশ পরামানিকের দল গেয়ে গেছে। তারা আনকোরা-নতুন সাজে একেবারে তাক লাগিয়ে দিয়েছে; বিশেষ করে রুক্মিণী—সে আবার ঢুকল, ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের মত একটা প্রকাণ্ড গোলাপী রেশমী শাড়ি পেছনে টানতে টানতে। ও-জিনিসটা তখন সদ্য কলকাতায় যাত্রা-থিয়েটারে ঢুকেছে, আর নির্বিচারে চলেছে, এখনকার স্টেজে গ্রীক্‌-প্যাটার্ণের অভিবাদনের মত,—সেলুকাসের সেনাও ওই করছে, আবার শ্রীকৃষ্ণের দ্বাররক্ষীও ওই করছে; সেদিন এক জায়গায় দেখলাম বৈকুণ্ঠে দেবর্ষি নারদও মাথায় বীণা তুলে ঐ ইউনানী অভিবাদন করলো···তুমি হাসছ যে,—অমরলোকে না-হয় সেখানকার বাসিন্দাদেরই মৃত্যু নেই, তা বলে পুরনো স্টাইল মরে নতুন স্টাইলও ঢুকবে না, এমন কোন সর্ত আছে না কি?

"আমি একটু ব্যাকুল হয়ে উঠলাম; চারুর ভাল পোশাক পরবার সাধ হয়েছে, এই সময় যদি কিছু করা যেত! বিশেষ করে চারুর মনোরঞ্জনের জন্যে আমার আর গোবরার মধ্যে যে রকম রেষারেষি চলছে।

"গল্প করতে করতে আমরা ঘাটে শানের বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। আমি বললাম, 'বৌদির ট্রাঙ্কে একটা শান্তিপুরে ডুরে শাড়ি আছে, যদি বলিস তো দুপুর বেলায় যখন ঘুমুবে··?'

"চারু ঠোঁট কুঁচকে বললে, 'মিছে বকিসনে শৈল, ডুরে শাড়ির নাকি আবার উড়্‌নি হয়, তাও আবার শান্তিপুরে! অরুচি!"

"বৌদির পরই জেঠাইমা আর ঠাকুরমা—থান আর নামাবলী। আমি অসহায়ভাবে চিন্তা করতে লাগলাম।

"একটু পরে মল-সুদ্ধ্ পা শানে ঠুকতে ঠুকতে চারু বললে, 'এক জায়গায় পাওয়া যায়।'

"আমি ব্যগ্রভাবে বললাম, 'কোথায় বল্ তো ?'

চারু উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে চেয়ে গা দোলাতে লাগল। আমি আবার প্রশ্ন করতে বললে, 'সে তোর দ্বারা হবে না।'

"বললাম, 'বল্ই না।'

"বললে, 'রাধারমণের মন্দিরে।'

"আমার সমস্ত অন্তরাত্মা মন্দির ওলট-পালট করে এল। নিষ্ফল হয়ে আবার জিগ্যেস করলাম, 'মন্দিরে কোথায় রে ?—সেখানে তো দোলনা, ঠাকুরের শোবার খাট, নৈবিদ্যির থালা…'

"চারু আঁচলটা দাঁতে চেপে পালিশ করতে করতে বললে, 'রাধার গায়ে।'

"বলে, ফল কি হল দেখবার জন্যে একবার আড়চোখে আমার দিকে চাইলে। আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, 'রাধার উড়্নি তুই গায়ে দিবি !'

"চারু বোধ হয় ভয় পেয়ে গেল, তাড়াতাড়ি বললে, 'বাঃ, তাই বললাম না কি ?'

"তার পরে গম্ভীরভাবে উঠে পড়ে বলল, 'বাড়ি যাই, তুই পাঠশালে যাবি নি ? খালি মেয়েদের সঙ্গে খেলা !'

"চারু রেগেছে। একসঙ্গে আসতে আসতে খানিক পরে আমি বললাম, 'আর, যদি কেউ টের পায় ? তা ছাড়া পাপ তো বটে ?'

"চারু কোঁচড় থেকে একমুঠো সজনে ফুল বের করে শুঁকতে শুঁকতে বললে, 'কে তোকে বলেছে ?—তার চেয়ে গোবরাকে বললে বরং…'

"চারু ঈর্ষার শক্তির কথা জেনেই কি ওকথা বলেছিল ? মেয়েমানুষ,—ওদের মনের বৃত্তি কখন্ থেকে অঙ্কুরিত হতে থাকে কে জানে ? কিন্তু ঐতেই —ঐ গোবরার নাম এনে ফেলতেই—ফল হল।

"তার পরদিন দুপুরের পূজো করতে ঢুকে পুরুতঠাকুর দেখলেন রাধার গা খালি। একটুখানির মধ্যেই গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল।...সিগারেটের টিনটা নড়িয়ে দাও দিকিন, দেশলাইটাও,—থ্যাংক্‌স্‌।

"কখন্‌ চুরি গেল, কে করলে, কেমন করে—সে সব কথা থাক্‌। আজ একটু আগে বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম—না? আসল কথা হচ্ছে—রাস্তা দিয়ে একটা লোক খানিকটা জরি-বসানো গোলাপী রেশম নিয়ে যাচ্ছিল, দুপুরের রোদে ঝলমল করছে। আলোয় ঝলমল গোলাপী রঙ এখনও আমায় চঞ্চল করে তোলে। আমি আর বর্তমানে থাকি না। কালের পর্দা হালকা রেশমের মতই ফরফরিয়ে উড়তে থাকে—দেখি তার ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে দুটি কিশোর-কিশোরী, স্থান—একটি পোড়োবাড়ির একটি নিভৃত প্রান্ত।

"মেয়েটির গা একটি জরির পাড় দেওয়া গোলাপী রেশমে জড়ানো! তার ভাঁজে ভাঁজে ওপর থেকে এসে পড়েছে দুপুরের সূর্যের চোখ-ঝলসানো আলো; তাতে ভেতরের গায়ের রং আর বেড়াবেণীর ঝিক্‌মিকি যেন হয়ে উঠেছে রূপকথার মায়া। ছেলেটি বিজয়গর্বে দাঁড়িয়ে আছে; রাজকুমারীকে সোনার গাছের হীরের ফল এনে দিয়ে অরূপকুমার নিশ্চয় একদিন এই রকম ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।"

তারাপদ একটু অপেক্ষা করিয়া ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "তার পর?"

শৈলেন বলিল, "হ্যাঁ, একটা 'তারপর' আছে বৈকি;—তার পর সেই দৃশ্যমঞ্চে পুরোহিত-প্রমুখ গ্রামের একপাল লোকের প্রবেশ—দুপুরের চেয়েও উগ্রমূর্তি সবার; পথনির্দেশক গোবরা।...হ্যাঁ, বলেছিলাম, এ রোম্যান্সে হত্যা পর্যন্ত আছে, সেটা আর কিছু নয়, তোমার গার্ভিসলিকো-পড়া মনে ঔৎসুক্যটা জাগিয়ে রাখবার জন্যে; ক্ষমা কর।...ও কি! তোমায় হঠাৎ অমন উদাস দেখাচ্ছে কেন? রেশমী উড়নির মায়ার ছোঁয়াচ, না, গোবরার হাতে হত্যা হলাম না বলে নিরাশা?—তার হাতে যতটুকু ছিল তা তো সে করেই ছিল।"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্লোল-কাগজের শেষের দিকে যাঁদের আবির্ভাব ঘটেছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। এঁর অভ্যুত্থান যেমন আকস্মিক তেমনি বিস্ময়কর। তখন ভাল কথাশিল্পীর অভাব ছিল না, তবু মানিকবাবু যে অতি সহজে নিজের একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিতে পেরেছিলেন এইতেই তাঁর শক্তির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি নিজে প্রথম জীবনে বহুস্থানে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, তারই ফলে বোধহয় জীবন সম্বন্ধে এঁর এমন প্রত্যক্ষ এবং বিচিত্র অভিজ্ঞতা। মানুষের মনের অন্তস্তলে যে জটিল ও কুটিল বাসনার খেলা চলে তা মানিকবাবুর চোখে যেন অনায়াসে ধরা পড়ে। তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক' এর বোধহয় জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ১৯০৮ সালে বাংলার বাইরে দুমকাতে এঁর জন্ম। কলেজে পড়তে পড়তেই হঠাৎ এক ঝোঁকের মাথায় সাহিত্য-চর্চা শুরু করেন তারই ফলে 'অতসী মামী'র সৃষ্টি হয় এবং তা বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। প্রথম বয়সে একাধিক চাকরী করার পর সাহিত্যসেবাতেই মনোনিবেশ করেছিলেন। ইনি কিছুদিন সাম্যবাদে বিশ্বাসী এবং প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এঁর সমধিক বিখ্যাত গ্রন্থের মধ্যে 'পদ্মানদীর মাঝি' 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'মিহি ও মোটা কাহিনী' 'প্রাগৈতিহাসিক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ সালের শেষের দিকে অকস্মাৎ এঁর জীবনদীপ নিভে যায়।

শিল্পী

সকালে দাওয়ায় বসে মদন সারা গায়ে শীতের রোদের সেঁক খাচ্ছিল, হঠাৎ তার পায়ে খিঁচ ধরল ভীষণভাবে।

একেবারে সাত-সাতটা দিন তাঁত না চালিয়ে হাতে-পায়ে কোমরে-পিঠে কেমন আড়ষ্ট মত বেতো ব্যথা ধরেছিল, তাতে আবার গাঁটে গাঁটে ঝিলিক-মারা কামড়ানি। সুতো মেলে না, তাঁত চলে না, বিনা রোগে ব্যারাম ধরার

মত হন্দ করে ফেলে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা ধরাবাঁধা নড়ন-চড়ন তাঁত চালানোর কাজে, তার অভাবে শরীরটা মিইয়ে ঝিমিয়ে ব্যথিয়ে ওঠে দু'দিনে, রাতে ঘুম আসে না, মনটা কেমন টনটন করে একধরনের উদাসকরা কষ্টে, সব যেন ফুরিয়ে গেছে! যাত্রা শুনতে গিয়ে নিমাই সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবার সময় যেমন লাগে তেমনিধারা কষ্ট, তবে ঢের বেশি জোরালো আর অফুরন্ত। শরীর-মনের ওসব উদ্বেগ সয়ে চুপচাপ থাকে মদন। যা সয় তা সইবে না কেন।

সকালে উঠেই মা গেছে বৌকে সাথে নিয়ে বাবুদের বাড়ি। বাড়ির মেয়েদের ধরবে, বাবুর ছোট মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দু'একখানা ভাল, মদন তাঁতির নাম-করা বিশেষ রকম ভাল, কাপড় বোনার ফরমাস যদি আদায় করতে পারে। বাবুর বাড়ির বায়না পেলে সুতো অনায়াসে জোগাড় হয়ে যাবে বাবুদেরই কল্যাণে।

বাড়িতে ছিল শুধু মদনের মাসি। তার আবার একটা হাত নুলো, শরীরটি প্যাকাটির মত রোগা। মদনের হাউমাউ চীৎকার শুনে সে ছুটে আসে মদনের দুবছরের ছেলেটাকে কোলে নিয়ে, সাথে আসে মাসির চার বছরের মেয়ে। মাসির কি ক্ষমতা আছে এক হাতে টেনে খিঁচধরা পা ঠিক করে দেয় মদনের। মাসিও চেঁচায়। মদনের চীৎকারে ভয় পেয়ে ছেলেমেয়ে দুটো আগেই গলা ফাটিয়ে কান্না জুড়েছিল।

কখন রাস্তা থেকে ভুবন ঘোষাল এসে ব্যাপারটা বুঝেই গোড়ালির কাছে মদনের পা ধরে কয়েকটা হ্যাঁচকা টান দেয় আর উরুতে জোরে জোরে থাপড় মারে। যন্ত্রণাটা সামালের মধ্যে আসে মদনের, মুচড়ে মুচড়ে ভেঙে পড়ার বদলে বশে আসে পা'টা।

বাঁচালেন মোকে।

মুখে শুষতে শুষতে মদন পায়ে হাত ঘষে। খড়িওঠা ফাটা পায়ে হাতের কড়া তালুর ঘষায় শব্দ হয় শোষেরই মত।

ভুবন পরামর্শ দেয় : উঠে হাঁটো দু'পা। সেরে যাবে।

মদন কথা কয় না। এতক্ষণে আশে-পাশের বাড়ির কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ ছুটে এসে হাজির হয়েছে হুল্লোড় শুনে। শুধু উদি আসেনি প্রায়-লাগাও কুঁড়ে থেকে, কয়েকটা কলাগাছের মোটে ফারাক মদন আর উদির কুঁড়ের মধ্যে। ঘর থেকেই সে তাঁতিপাড়ার মেয়ে-পুরুষের পিত্তি-জ্বালানো মিষ্টি গলায় চেঁচাচ্ছে : কি হল গো? বলি, হল কি?

ভুবন রাস্তা থেকে উঠে এলেও এটা জানা কথাই যে উদির কুঁড়ে থেকেই সে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে এসেছে। উদিই হয়তো তাড়া দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। সাতদিন তাঁত বন্ধ মদনের, বৌটা তার ন'মাস পোয়াতি, না খেয়ে তার ঘরে পাছে কেউ মরে যায় উদির এই ভাবনা হয়েছে, জানা গেছে কাল। কিছু চাল আর ডাল সে চুপি চুপি দিয়েছে কাল মদনের বৌকে, চুপি চুপি শুধিয়েছে মদনের মতিগতির কথা, সবার মত মজুর নিয়ে সাধারণ কাপড় বুনতে মন হয়েছে কিনা মদনের। কেঁদে উদিকে বলেছে মদনের বৌ যে, না, একগুঁয়েমি তার কাটেনি।

পাড়ার যারা ছুটে এসেছিল, ভুবনকে এখানে দেখে মুখের ভাব তাদের স্পষ্টই বদলে' যায়। ইতিমধ্যে মাসি পিঁড়ি এনে বসতে দিয়েছিল ভুবনকে। বারবার সবাই তাকায় মদন আর ভুবনের দিকে দু'চোখে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা নিয়ে। সেও কি শেষে ভুবনের ব্যবস্থা মেনে নিল, রাজী হল প্রায় বেগার খাটা মজুরি নিয়ে সস্তা ধুতিশাড়ি গামছা বুনে দিতে? মদন অস্বস্তি বোধ করে। মুখের খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি মুছে ফেলে হাতের চেটোতে।

সবার নিঃশব্দ জিজ্ঞাসার জবাবেই যেন বুড়ো ভোলাকে শুনিয়ে সে বলে, পায়ে খিঁচ ধরল হঠাৎ। সে কি যন্তনা, বাপ্, একদম যেন মিত্যু-যন্তনা, মরি আর কি। উনি ছুটে এসে টেনেটুনে ঠিক করে দিলেন পা'টা, বাঁচালেন মোকে।

গগন তাঁতির বেঁটে মোটা বৌ অদ্ভুত আওয়াজ করে বলে, অ! কাছেই ছিলেন তা এলেন ভালো, তাইতো বলি মোরা।

তাঁত না চালিয়ে গা'টা ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি বলে মদন। গগন তাঁতির বৌএর মুখকে তার বড় ভয়।

বৃন্দাবন দাঁড়িয়ে ছিল পিছনে, অপরাধীর মত। তার কুঁড়েও মদনের ঘরের প্রায় লাগাও—উত্তরে একটা আমগাছের ওপাশে, যার তু'পাশের ডালপালা তু'জনের চালকে প্রায় ছোঁয় ছোঁয়।

বুড়ো ভোলার চেয়ে বৃন্দাবনের বয়স অনেক কম, কিন্তু শরীর তার অনেক বেশি জরাজীর্ণ। একটি তার পুরোনো জীর্ণ তাঁত, গামছা আর আট-হাতি কাপড় শুধু বোনা যায়। তাতে সে আর বসে না, ক্ষমতা নেই। তার বড় ছেলে কেশব তাঁত চালায়। সুতোর অভাবে তাঁতিপাড়ায় সমস্ত তাঁত বন্ধ, অভাবে ও আতঙ্কে সমস্ত তাঁতিপাড়া থম থম করছে। শুধু তাঁত চলছে কেশবের আর বৃন্দাবনের।

ভুবন অমায়িক ভাবে বৃন্দাবনকে জিজ্ঞাসা করে, ক'খানা গামছা হয়েছে বৃন্দাবন?

বৃন্দাবন যেন চমকে' ওঠে। এক পা পিছিয়ে যায়।

জানি না বাবু, মোর ছেলা বলতে পারে।

কেশবকে বোলো বোনা হলে যেন পয়সা নিয়ে যায়।

বাঁকা মেরুদণ্ডটা একবার সোজা করবার চেষ্টা করে বৃন্দাবন অসহায় করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে একবার তাকায়।

ছেলেকে শুধোবেন বাবু। ওসব জানি না কিছু আমি।

পিছু ফিরে ধীরে ধীরে চলে যায় বৃন্দাবন।

গগনের বৌ বলে মুখ বাঁকিয়ে ঝাঁজের সঙ্গে, আমি কিছু জানি না গো, মোর ছেলা জানে! কত ঢং জানে বুড়ো।

বুড়ো ভোলা বলে, আহা থাম না বুনোর মা! অত কথায় কাজ কি। যন্তনা গেছে না মদন? মোরা তবে যাই।

কেশব গেলেই পয়সা পাবে, গামছা কাপড় বুনে দিলেই পয়সা মেলে, এসব কথা—এসব ইঙ্গিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে তারা ভয় পায়। সব ঘরে রোজগার বন্ধ, উপোস।

ভুবন বলে, তোমার গাঁয়ের তাঁতিরা, জানো মদন, বড় বোকা।

মদন নিজেও সাতপুরুষে তাঁতি। রাগের মাথায় সে ব্যঙ্গই করে বসে, সে কথা বলতে! তাঁতি জাতটাই বোকা।

ভুবন নিজের কথা বলে যায়, সুতো কিনতে পাচ্ছিস না, পাবিও না কিছুকাল। তাঁত বসিয়ে রেখে নিজে বসে থেকে লাভ কি? মিহিরবাবু সুতো দিচ্ছেন, বুনে দে, যা পাস তাই লাভ। তা নয়, সুতো না কিনতে দিলে কাপড়ই বুনবে না একি কথা? তোমার কথা নয় বুঝতে পারি, সস্তা কাপড় বুনবেই না তুমি, কিন্তু ওরা—

পোষায় না ওদের। সুতো কি সবাই কেনে, না কিনতে পারে? আপনি তো জানেন, বেশির ভাগ দাদন কর্জে তাঁত চালায়। পড়তা রাখে দিবারাত্তির তাঁত চালিয়ে, মুখে রক্ত তুলে। আপনি তাও আদ্দেক করতে চান, পারব কেন মোরা?

নইলে ইদিকে যে পড়তা থাকে না বাপু। কি দরে সুতো কেনা জানো? ভুবন আপসোসের শ্বাস ফেলে, যাক গে, কি করা। কত্তাকে কত বলে তোমাদের জন্যে সুতো বরাদ্দ করিয়েছিলাম, তোমরা না মানলে উপায় কি। বুঝি তো সব, কিন্তু দিনকাল পড়েছে খারাপ, তাঁত রেখে কোনমতে টিকে থাকা। নয়তো দু'দিন বাদে তাঁত বেচতে হবে তোমাদের। সুতো মিলবে আবার, তখন মনে পড়বে এই ভুবন ঘোষালের কথা, বলে রাখছি, দেখো মিলিয়ে। তখন আপসোস করবে, আমার কথা শুনলে তাঁতও বজায়

থাকত, নিজেরাও টিকতে।

তাঁত বাঁধা দিতে বেচতে হলে মিহিরবাবুর হয়ে ভুবনই কিনবে। সেই ভরসাতেই হয়তো গ্যাঁট হয়ে বসে আছে লোকটা। কিন্তু সে পর্যন্ত কি গড়াবে? তার আগে হয়তো ভুবনের কাছে সুতো নিয়ে বুনতে শুরু করবে তাঁতিরা।

মাসি এসে ঘুর-ঘুর করে আশে-পাশে। বামুনের ছেলে পায়ে হাত দিয়েছে মদনের, গড় হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে ভুবনকে যতক্ষণ সে প্রণাম না করছে মাসির মনে স্বস্তি নেই। মদনের বুঝি খেয়াল হয়নি, ভুলে গেছে। মদনের পা দুটো টান হয়ে ভুবনের পিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলে মাসির আর ধৈর্য থাকে না। মদনের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে প্রণামের কথাটা মনে করিয়ে দেয়।

মদন একেবারে খিঁচড়ে ওঠে, মেয়েটাকে নে না কোলে, কেঁদে মরছে! মরগে না হেথা থেকে যেথা মরবি!

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে মাসি পালায়। মদনের এ মেজাজ চেনে মাসি। মেয়ে কাঁদছে বলে বকুনি মিছে, ওটা ছুতো। ছেলেপিলে কানের কাছে চেঁচালে মানুষের অশান্তি কেন হবে মাসিও জানে না মদনও বোঝে না। ছেলেমেয়ের কান্না মদনের কানে লাগে না। তাঁতের ঠকঠকি, মেয়েদের বকাবকি, ঝিঁঝিঁর ডাকের মত। মেজাজটাই বিগড়েছে মদনের। না করুক প্রণাম সে বামুনের ছেলেকে। মদনের ওপর মাসির বিশ্বাস খাঁটি। রামায়ণ সে পড়তে পারে সুর করে, তাঁতের কাজে বাপের নাম সে বজায় রেখেছে, সেরা জিনিস তৈরির বায়না পায় মদন তাঁতি। মদনের মার সাথে কচি বয়সে এ বাড়িতে এসে মাসি শুনেছিল, বাবুদের বাপের আমলে বেনারসী বুনে দেবার বায়না পেয়েছিল মদনের বাপ। বিয়ের সময় জালের মত ছিষ্টিছাড়া শাড়ি বুনে পরতে দিয়ে তার সঙ্গে যে মস্করা করেছিল মদনের বাপ সে কথা

কোনদিন ভুলবে না মাসি। আজ আকাল, বায়না আসে না, স্থতো মেলে না, তাঁত চলে না, তবু মদন ওঁচা কাপড় বোনে না। ওর জন্যে কষ্ট হয় মাসির, ওর বাপের কথা ভেবে। মা বৌ যেন কেমন ব্যাভার করে ওর সঙ্গে।

মদনের বাপ যদি আজ বেঁচে থাকত, মাসি ভাবে। বেঁচে থাকলে সাড়ে চার কুড়ির বেশি বয়স হ'ত তার। মাসি তা ভাল বোঝে না। শুধু শ্রীধরের চেয়ে সে বেশি বুড়ো হয়ে পড়ত ভাবতে মনটা তার মুসড়ে যায়। শ্রীধর তাঁতির বেঁচে থাকার দুর্ভাগ্য দেখে সে নিজেই যে কামনা করে, এবার বুড়োর যাওয়াই ভাল।

না থাক্ মদনের বাপ। মদন তো আছে!

মদনের মা বৌ ফিরে আসে গুটি-গুটি, পেটের ভারে মদনের বৌ থপ-থপ পা ফেলে হাঁটে, হাত-পা তার ফুলছে ক'দিন থেকে। পরনের জীর্ণ পুরানো শাড়িখানা মদন নিজে বুনে দিয়েছিল তাকে বিয়ের সময়। এখনো পাড়ের বৈচিত্র্য, মিহি বুননের কোমল থাপি উজ্জ্বলতা সব মিলে এমন স্থন্দর আছে কাপড়খানা যে, অতি বিশ্রীভাবে পরলেও, রুক্ষ জটবাঁধা চুল, চোক্‌লা-ওঠা ফাটা চামড়া এসব চিহ্ন না থাকলে বাবুদের বাড়ির মেয়ে মনে করা যেত তাকে।

মদনের মা বিড় বিড় করে বকতে বকতে আসছিল লাঠি ধরে কুঁজো হয়ে, ভুবনের সামনে সে কিছু না বললেই মদন খুশি হত। কিন্তু বুড়ির কি সে কাণ্ডজ্ঞান আছে। সামনে এসেই সে শুরু করে দেয় মদন তাঁতির এয়োতি বশীকরণ বসন্ত শাড়ির বায়নার কথা শুনেই বাবুর বাড়ির মেয়েদের হাসি টিটকারি দিয়ে তাদের বিদেয় করার কাহিনী। ওসব কাপড়ের চল আছে নাকি আর, ঠাকুমা দিদিমারা ঝিরা আর চাষার ঘরের মেয়েরা পরে ওসব শাড়ি।

মদন তাঁতি! মদন তাঁতির কাপড়! বনগাঁয় শ্যাল রাজা মদন তাঁতি।

বলল ? বলল ওসব কথা ? পা গুটিয়ে সিধে হয়ে বলে মদন, বেড়েছে—বড় বেড়েছে বাবুরা। অতি বাড় হয়েছে বাবুদের, মরবে এবার।

দাওয়ায় উঠতে টলে পড়বার উপক্রম করে মদনের বৌ। খুঁটি ধরে সামলে নিয়ে ভেতরে চলে যায়, ভেতর থেকে তার উগ্র মন্তব্য আসে ঃ এক পয়সার মুরোদ নেই, গর্বো কত !

ভুবন সান্ত্বনা দিয়ে বলে, মেয়েরা অমন বলে মদন, ওসব কথায় কান দিতে নেই।

তা বলে, বাবুদের বাড়ির মেয়েরাও বলে, তার মা বৌও বলে, উদিও বলে। কিন্তু সব মেয়েরা বলে না। এই তাঁতিপাড়ার অনেক মেয়েই বলে না। মদন তাঁতিকে সামনে খাড়া করিয়ে তারা বরং ঝগড়া করে ঘরের পুরুষদের সঙ্গে। মদনও তাঁত বোনে তারাও তাঁত বোনে, পায়ের ধুলোর যুগ্যি নয় তারা মদনের। এক আঙুল গোঁপ-দাড়ির মধ্যে ভাঙা দাঁতের হাসি জাগিয়ে মদন শোনায় ভুবনকে। একটা এঁড়ে তাঁতির তেজ আর নিষ্ঠায় একটু খটকাই যেন লাগে ভুবনের। একটু রাগ একটু হিংসার জ্বালাও যেন হয়। সম্প্রতি মিহিরবাবুর তাঁতের কারবারে জড়িয়ে পড়ার পর সে শুনেছিল এ অঞ্চলের তাঁতি মহলে একটা কথা চলিত আছে ঃ মদন যখন গামছা বুনবে। গোড়ায় কথাটার মানে ভাল বোঝেনি, পরে টের পেয়েছিল, সূর্য যখন পশ্চিমে উঠবে-র বদলে ওই কথাটা এদিকের তাঁতিরা ব্যবহার করে। সে জানে, মদন যদি তার কাছ থেকে সুতো নিয়ে কাপড় বুনে দিতে রাজী হয় আজ, কাল তাঁতি পাড়ার বেশির ভাগ লোক ছুটে আসবে তার কাছে সুতোর জন্যে। বড় খামখেয়ালী একগুঁয়ে লোকটা,—এই রাগে, এই হাসে, হাহুতাশ করে, এই লম্বাচওড়া কথা কয়—যেন রাজামহারাজা !

ওঠবার সময় ভুবনের মনে হয় ঘর থেকে যেন একটা গোঙানির আওয়াজ কানে এল।

তার পরেই মাসির গলা : ও মদন, ছ্যাখসে বৌ কেমন করছে !

ভুবন গিয়ে উদিকে পাঠিয়ে দেয় খবর নিতে। বেলা হয়েছে, তার বেরিয়ে পড়া দরকার, কাজ অনেক। কিন্তু মদনের ঘরের খবরটা না জেনে যেতে পারে না। তেমন একটা বিপদ ঘাড়ে চাপলে মদন হয়তো ভাঙতে পারে। উদির জন্য অপেক্ষা করতে করতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ও ছুঁড়ির বড় বাড়াবাড়ি আছে সব বিষয়ে, খবর আনতে গিয়ে হয়তো সেবা করতেই লেগে গেছে মদনের বৌএর। কি হয়েছে মদনের বৌএর ? কি হতে পারে ? কিছু যদি হয়…

উদি ফেরে অনেকক্ষণের পরে। অনেকটা পথ হেঁটে মদনের বৌএর শরীরটা কেমন কেমন করছিল, একবার মূর্ছা গেছে। মনে হয়েছিল বুঝি ওই পর্যন্তই থাকবে, কিন্তু পরে মনে হচ্ছে প্রসবব্যথাটাও উঠবে।

পেসব হতে গেলে মরবে মাগী এবার। একবেলা একমুঠো ভাত পায় তো তিন বেলা উপোস। এমনি চলছে দু'মাস। গাল দিয়ে এলাম তাঁতিকে, মরণ হয় না ?

আখায় কাঠ গুঁজে নামানো হাঁড়িটা চাপিয়ে দেয়। বেঁটে আঁটো দেহটা পর্যন্ত তার পরিচয় দেয় দুর্জয় রাগের। বসাতে গিয়ে মাটির হাঁড়িটা যে ভাঙে না তাই আশ্চর্য।

এখনো গেলে না যে ?

যাবো। আলিস্যি লাগছে।

ভাত খাবে, মোর রাঁধা ভাত ? উদি আব্দার জানায়।

ভুবন রেগে বলে, তোর কথা বড় বিচ্ছিরি।

মদন দাওয়ায় এসে বসেছে উঁকি মেরে দেখে ডোবা ঘুরে রাস্তা হয়ে ভুবন

আবার যায়। সকালের পিঁড়িটা সেইখানে পড়ে ছিল, তাতে জাঁকিয়ে বসে।

কেমন আছে বৌ ?

ব্যথা উঠেছে কম কম। রক্ত ভাঙছে বেশি, ব্যথা তেমন নয়। দুগ্‌গা বুড়ীকে আনতে গেছে।

মদনের শান্ত নিশ্চিন্ত ভাব দেখে ভুবন রীতিমত ভড়কে যায়। একটা বিড়ি ধরিয়ে ভাবে। মদনকেও একটা বিড়ি দেয়।

মদন বলে হঠাৎ: ভাল কিছু বোনান না, একটু দামী কিছু। সুতো নেই বুঝি ?

মনটা খুশি হয়ে ওঠে ভুবনের।

সামান্য আছে। কিন্তু বেনারসী ছাড়া তুমি কি কিছু বুনবে ?

বেনারসী ? বেনারসী না বোনা যেন তারই অপরাধ, তারই অধঃপতন এমনি আপসোসের সঙ্গে বলে মদন, বেনারসী জীবনে বুনিনি।

একঘণ্টার মধ্যে সুতো এসে পড়ে। ভুবন লোক দিয়ে সুতো পৌঁছে দেয় মদনের ঘরে। সুতো দেখে কান্না আসে মদনের। এই সুতো দিয়ে তাকে ভাল কাপড়, দামী কাপড় বুনে দিতে হবে! এর চেয়ে কেশবের মত গামছাই নয় সে বুনত, লোকে বলত মদন তাঁতি গামছা বুনেছে দায়ে পড়ে কিন্তু যা-তা ওঁচা কাপড় বোনেনি।

সকালে পায়ে যেমন খিঁচ ধরেছিল তেমনি ভাবে কি যেন টেনে ধরে তার বুকের মধ্যে। ট্যাঁকে গোঁজা দাদনের টাকা দুটো যেন ছ্যাঁকা দিতে থাকে চামড়ায়। কিন্তু এদিকে তাঁত না চালিয়ে চালিয়ে সর্বাঙ্গে আড়ষ্টমত ব্যথা, পেটে খিদেটা মরে মরে জাগছে বারবার, বৌটা গোঙাচ্ছে একটানা।

কি করবে মদন তাঁতি ?

সেদিন রাত্রি যখন গভীর হয়ে এসেছে, শীতের চাঁদের ম্লান আলোয় গাঁ ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক স্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে মাঝে মাঝে কাছে ও দূরে কুকুরশেয়ালের ডাক ছাড়া, মদন তাঁতির তাঁত-ঘরে শব্দ শুরু হল ঠকাঠক্। খুব জোরে তাঁত চালিয়েছে মদন, শব্দ উঠছে জোর। উদির ঘরে তো বটেই, বৃন্দাবনের ঘরে পর্যন্ত শব্দ পৌছতে থাকে তার তাঁত চালানোর।

ভুবন বলে আশ্চর্য হয়ে, এর মধ্যে তাঁত চালাল? একা মানুষ, কখন ঠিক করল সব?

উদিও অবাক হয়ে গিয়েছিল—ও খাঁটি গুণী লোক, ও সব পারে—সে বলে ভয়ে ও বিস্ময়ে কান পেতে থেকে।

বুড়ো বৃন্দাবন ছেলেকে ডেকে বলে, মদন তাঁত চালায় নাকি রে?

তা ছাড়া কি আর? কেশব জবাব দেয় ঝাঁজের সঙ্গে, রাতদুকুরে চুপি চুপি তাঁত চালাচ্ছেন, ঘাট শুধু মোদের বেলা।

ভুবনের সুতো না হতে পারে।

কার সুতো তবে? কার আছে সুতো ভুবন ছাড়া শুনি?

মদনের তাঁত কখন থেমেছিল উদি জানে না। ভোরে ঘুম ভেঙেই সে ছুটে যায় মদনের কাছে। মদনকে ডেকে তুলে সাগ্রহে বলে, কতটা বুনলে তাঁতি?

আয় দেখবি।

মদন তাকে নিয়ে যায় তাঁত-ঘরে। ফাঁকা শূন্য তাঁত দেখে থ বনে থাকে উদি। সুতোর বাণ্ডিল যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে।

সুতো মদন উদির হাতে তুলে দেয়, টাকা দুটোও দেয়। বলে, নিয়ে যা ফিরে দে গা ভুবনবাবুকে। বলিস, মদন তাঁতি যেদিন গামছা বুনবে—

একটু বেলা হতে তাঁতিপাড়ার অর্ধেক মেয়েপুরুষ দল বেঁধে মদনের ঘরের দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ায়। মুখ দেখলেই বোঝা যায় তাদের মনের অবস্থা।

রোষে ক্ষোভে কারো চোখে জল এসে পড়বার উপক্রম করেছে। গগন তাঁতির বৌটা পর্যন্ত নির্বাক হয়ে গেছে।

বুড়ো ভোলা শুধোয়ঃ ভুবনের ঠেঁয়ে নাকি স্থতো নিয়েছ মদন? তাঁত চালিয়েছ দুকুর রাতে চুপি চুপি?

দেখে এসো তাঁত।

তাঁত চালাওনি রাতে?

চালিয়েছি। খালি তাঁত। তাঁত না চালিয়ে খিঁচ ধরল পায়ে, রাতে তাই খালি তাঁত চালালাম এট্টু। ভুবনের স্থতো নিয়ে তাঁত বুনব? বেইমানি করব তোমাদের সাথে কথা দিয়ে? মদন তাঁতি যেদিন কথার খেলাপ করবে—

মদন হঠাৎ থেমে যায়।

প্রবোধকুমার সান্যাল

বাংলাদেশে কথাসাহিত্যিক বলে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে আবার যাঁরা শীর্ষস্থানীয়, প্রবোধকুমার তাঁদেরই একজন। তবু, বিস্ময়ের কথা এই যে, তাঁর সর্বাধিক বিখ্যাত বই—কল্পনা নয়, সত্যকাহিনী, অর্থাৎ—ভ্রমণকাহিনী। ভ্রমণ-বিবরণকে প্রথম-শ্রেণীর সাহিত্য-মর্যাদা দিয়েছেন বোধহয় প্রবোধকুমারই, যদিচ তাঁর 'কলরব' 'নিশিপদ্ম' প্রভৃতি বই-এর গল্পগুলি পৃথিবীর সমস্ত ভাষার ছোটগল্পের আসরেও মাথা উঁচু করে থাকবে চিরকাল। ১৯০৫ সালে ওঁর জন্ম, স্কটিশচার্চ কলেজে লেখাপড়া করেন—কিছুদিন সরকারী চাকরীও করেছিলেন কিন্তু সাহিত্য ওঁকে সেখান থেকে দুর্বার আকর্ষণে টেনে আনে। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত তিনি সাহিত্যসেবাতেই অতিবাহিত করেছেন, অন্য কোনো বৃত্তি নেন্‌নি। এ তাঁর জীবিকাও। অত্যন্ত অস্থির এবং ভবঘুরে মন—ভ্রমণের নেশা বারবার তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে হিমালয় ও কুমারিকার মধ্যে অসংখ্য স্থানে। ভ্রমণের নামে আজও তাঁর রক্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রবন্ধসাহিত্যেও এঁর কিছু মূল্যবান দান আছে। ছোট-বড় মিলিয়ে পুস্তকের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি।

গুহায় নিহিত

ঘর ওই মাত্র তিনটি। রান্না-ভাঁড়ার অবশ্য আলাদা,—আর দক্ষিণে একফালি বারান্দা,—কিন্তু কলকাতা শহরে এই ফ্ল্যাটটির মাসিক প্রণামী চল্লিশ টাকা।

তিন-চারটি প্রাণীর হাত পা ছড়িয়ে থাকার পক্ষে এমন একটি ফ্ল্যাট সামান্য কথা নয়। অবশ্য অতিথি-অভ্যাগত এসে পড়বার সম্ভাবনা হ'লে একটু সমস্যা দেখা দেয় বৈ কি।

তা হোক—বসবার ঘরের দেয়ালে পেরেক ঠুকতে ঠুকতে প্রতিমা বলে, দেবী-দিদি একলা আসছেন, কোনো ঝঞ্ঝাট তাঁর নেই। বসবার ঘরে থাকলেই বা—?

প্রিয়কুমার বললে, সিঁড়ি দিয়ে লোক যাতায়াত করবে না? তেতলার লোক যাওয়া-আসার সময় তোমার দেবী-দিদির দিকে কেউ যদি উঁকি-ঝুঁকি মারে?

প্রতিমা মুখ ফিরিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। বড়-বড় টানা চোখ, কপালে রেখা নেই, মুখে সংশয়ের চিহ্ন নেই। বলে, সে কি, তাই কেউ করে বুঝি?

করে না?—প্রিয়কুমার বলে ফ্ল্যাটওলা বাড়িতে থাকার কৌতুক তোমার চোখে এখনো পড়েনি। সাধে কি আর বলি, গেঁয়ো ভূতের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে!

আচ্ছা—আচ্ছা, আমি না হয় গেঁয়ো ভূত, আর তুমি কলকাতার ছেলে, হয়েছে ত? এখন তা হ'লে কি করবে তাই বলো!—প্রতিমা আবার ছবি টাঙানোর পেরেক ঠুকতে থাকে। অতিথি এসে পৌঁছবার আগে ঘরখানা সাজিয়ে তুলতে না পারলে আর চলছে না।

প্রিয়কুমার বলে, ভীষণ সমস্যা! কি করা যায় বলো দেখি এখন!—এই বলে সে মুখ টিপে হাসে।

স্বামীর-মুখ-চাওয়া স্ত্রী নিজের কল্পনায় কোনো প্রতিবিধান করতে না পেরে শেষকালে বলে, বলো না, কি করব?

ওরে বোকা, এই ছ্যাখো—ব'লে প্রিয়কুমার স্ত্রীর কাছে স'রে গিয়ে বলে, এই যে সিঁড়ির ধারের জানলাটা, এটায় পর্দা একটা ঝুলিয়ে দিয়ো, আর এই দরজাতেও একটা—বুঝলে? সেই যে আমি ফুলকাটা রঙিন খদ্দরের থান এনেছিলুম—?

একমুখ হেসে প্রতিমা এইবার স্বামীর দিকে তাকায়। এত সহজে সমস্যার যে সমাধান হয় আগে কে জানতো! বলে, ঠিক বলেছ, আমার মনেই ছিল না। কিন্তু আমি যে সেলাই জানিনে? কে করবে? কী চমৎকার ফুলকাটা পর্দা করেছে ও-বাড়ির হররমা! আমাকে যদি কেউ শিখিয়ে দিত!

প্রিয়কুমার বলে, তুমি একটি আস্ত শিমুল ফুল! কত লোকের বউ কত রকম জানে! তুমি কী জানো? জানো কেবল—

মুখের কথাটা প্রিয়কুমারের মুখেই থেকে যায়। দুজনেই হাসিমুখে তাকায় দুজনের দিকে। চারটি চোখের মধ্যে দুইটিতে চতুর বুদ্ধির দীপ্তি, আর দুইটি চাহনিতে নদীয়া জেলার কোন্ এক অখ্যাত গ্রামের একটি প্রাচীন সরোবরের স্নিগ্ধ ছায়া। প্রতিমা হাসিমুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে পিঠের দিক্‌কার আঁচলটা কাঁধের উপর টেনে নেয়।

—আরে, সরো সরো, পেরেক পুঁতে পুঁতে ঘরখানাকে ভরিয়ে তুললে। কী হবে অত ছবি টাঙিয়ে? দেয়ালে আর মশা-মাছি বসবার জায়গা নেই! তোমার দেবীদিদি এমন কী মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া আসছেন যার জন্যে এত সাজসজ্জা?

তুমি চুপ করো—প্রতিমা গ্রীবা দুলিয়ে বলে, ওরা কত লেখাপাড়া-জানা মেয়ে, কত ইংরিজি বই পড়ে! ঘরের চেহারা দেখলে কী মনে করবে বলো ত?

প্রিয়কুমার বলে, ওঃ, অমন ঢের ঢের গ্র্যাজুয়েট মেয়ে কলকাতায় গড়াগড়ি যায়! তোমার মতন লক্ষ্মীর ঘরে তাঁর মতন থুবড়ি মেয়ে জায়গা পাবেন, এটা তাঁর ভাগ্যি।

তা বৈ কি। এসে দেখবে ঘরদোর আগোছালো; বলবে অশিক্ষিত মেয়ে আমি! কী মনে করবে বলো ত?

ইঃ—কী মনে করবেন, শুনি? লেখাপড়াতে তুমিই কোন্ কম? তুমিও ত ছোটবেলায় পড়েছিলে শিশুশিক্ষা?

স্বামীর গম্ভীর রসিকতা প্রতিমা বুঝতে পারে না। মুখ ফিরিয়ে বলে, কিন্তু তুমি যে বলো শিশুশিক্ষা পড়লেও মানুষ মুখ্যু থাকে? দেবীদিদি যে ইংরিজিও জানেন।

প্রিয়কুমার বলে, ছোঃ, ইংরিজি! ইংরিজির শিশুশিক্ষাই লোকে পড়ে, তা জানো? তোমার দেবীদিদি যদি বিদ্বান্ হন্ তবে তুমি আর তিনি একই—নাও, হয়েছে, টুল থেকে এবার নামো। ওই ত, বেশ ছবি মানিয়েছে! তোমার দেবীদিদি এমন ঘরে ঢুকলে আর বেরোতেই চাইবেন না দেখো।

স্বামীর কথায় প্রতিমার মন খুশি হয়ে যায়। বলে, থাকলে ত ভালোই, কতদিন দেখিনি। ও-বছরে একবারটি এসেছিল, সেই যে তুমি গাড়িতে তুলে দিয়ে এলে? সেই যে গো, ফটো তুললাম আমরা, মনে নেই? বড্ড ভুলে যাও তুমি, বাপু। সেই যে তোমাকে তিনি একটা পশমের গেঞ্জি বুনে দিয়ে গেলেন?

প্রিয়কুমার বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু একটু মনে পড়ছে। তোমার দেবীদিদি দেখতে ঠিক কেমন, বলো ত? মানে, ঠিক মনে পড়ছে না আমার। আমাদের বনমালীর মতন গায়ের রংটা হবে বোধ হয়, না?

ওমা—প্রতিমা চোখ কপালে তুলে শিউরে ওঠে,—তোমার তাহলে একটুও মনে নেই! একেবারে ধবধবে রং, নাক-চোখ কি স্বন্দোর, কেমন গড়ন-পেটন, কেমন চুল—

প্রিয়কুমার একমনে গভীরভাবে চিন্তা ক'রে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ—তাই ত! তা বয়স হোলো বৈ কি, যতদূর মনে পড়ে বোধ হয় বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি,—না কি বলো?

অ্যাঁ!

অন্তত পঁয়তাল্লিশ?

সহসা একঘর হেসে উঠে প্রতিমা তাড়াতাড়ি মুখে আঁচল চাপা দেয়, এবং তেমনিভাবে হাসতে হাসতে স্বামীর গায়ের উপর গড়িয়ে প'ড়ে বলে, পঁয়তাল্লিশ! তাঁর যে এখনো পঁচিশ হয়নি গো!

ও একই।—প্রিয়কুমার বলে, দাঁড়াও, দরজাটা ভেজিয়ে দিই, তার পর দুজনেই হাসবো খুব ক'রে।

চট ক'রে প্রতিমা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। রুষ্টকণ্ঠে বলে, না, থাক্ দরজা খোলা, তোমার চালাকি আমি জানি। এই সকাল বেলায় তোমার—ছিঃ. কী হচ্ছে ?

বাইরে খুড়িমার গলার আওয়াজ পেয়ে দুজনেই সতর্ক হয়ে স'রে দাঁড়ায়। তার পর দরজার কাছে এসে প্রিয়কুমার নিজেই বলে, পিসতুতো বোনের ননদ, তার জন্যে আবার এত ! আমি বাপু তোমাদের অতিথি-সৎকারের মধ্যে নেই, আমার অনেক কাজ। বসবার ঘরটা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু বন্ধুবান্ধব এলে বসাবো কোথায় ?

মাথায় ঘোমটা টেনে চাপা গলায় প্রতিমা বলে, একটু কষ্ট করো, লক্ষ্মীটি—

ক'দিন তিনি থাকবেন শুনি ?

তিন দিন গো—

আমাকে দিয়ে যেন ফাই-ফরমাস খাটিয়ো না। মেয়েছেলের ফরমাস খাটাও ঝকমারি।

খুড়িমা বারান্দার ধার থেকে এগিয়ে এসে বলেন, তা আসছে, ভালোই ত। কবে আসবে গো, বৌমা ?

প্রতিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খুড়িমার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে, আজই বিকেলে।

আয়োজনের আর কোনো ত্রুটি রইলো না। অতিথির কাছে স্বামীর পরিচয় আর ঐশ্বর্যকে উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরার জন্যে সারাদিন প্রতিমার পরিশ্রমের আর অন্ত নেই। বনমালীর সাহায্যে সমস্ত ফ্ল্যাটটা জল দিয়ে ধুয়ে-মুছে সে তকতকে ক'রে তুললো। শোবার ঘর তিনখানার আসবাব সজ্জাগুলি

ঝেড়ে মুছে চেহারা ফিরিয়ে দিল। দর্জির বাড়ি থেকে দরজা ও জানালার পর্দা তৈরি হয়ে এলো। এদিকে ধবধবে চাদর উঠলো বিছানায়, ঝালর-দেওয়া বালিশ, নেট-এর মশারি,—টেব্‌লে চিনেমাটির ফুলদানি, প্রিয়কুমারের প্রিয় কয়েকখানি বই, টিপাইয়ের উপরে ঘষা কাচের ডুম-বসানো টেব্‌ল্-ল্যাম্প,—ওদিকে একটি শেল্‌ফে সুগন্ধী তেল, ভালো সাবান; দাঁতের মাজন, মাথার নতুন ফিতে ও কাঁটা, দেয়ালে ঝোলানো বড় একখানা সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, তার পাশে শাড়ি ঝুলিয়ে রাখার একটি আলনা। মহিলা অতিথির অভ্যর্থনা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কোথাও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য নেই। স্বামীর রুচি আর সৎশিক্ষার সুখ্যাতি হবে এই আনন্দ-গৌরবে সারাদিন প্রতিমার বুকের ভিতরটা টলমল করতে লাগলো। তার মতন স্বামী-ভাগ্য ক'জনের?

ভালো শাড়ি আর জামা প'রে বেলা চারটে নাগাৎ সবেমাত্র সে পায়ে আলতা প'রে উঠে দাঁড়িয়েছে এমন সময় নীচের দরজায় মোটরের হর্ণ শোনা গেল।

প্রিয়কুমারের বহু আপত্তি থাকলেও স্ত্রীর অনুরোধে তাকে যেতে হয়েছিলো স্টেশনে। মোটরের আওয়াজ শুনে প্রতিমা বারান্দায় হাসিমুখে এসে দাঁড়ালো। খুড়িমা বেরিয়ে এলেন। বনমালী জিনিসপত্র বয়ে আনার জন্যে নীচে নেমে গেল।

অতিথির মতো অতিথিই বটে। মুখে অপরিসীম গাম্ভীর্য, কিন্তু তবু হাসিমুখ। পরনে দামী শাড়ি, কিন্তু তার চাকচিক্য নেই, যেমন-তেমন ক'রে জড়ানো। হাতে কয়েকটি ফিনফিনে চুড়ির সঙ্গে একটি ছোট সোনার হাত-ঘড়ি, গলায় চিকচিকে হার, পায়ে বাদামী রঙের ফিতে বাঁধা একজোড়া স্লিপার। দীর্ঘ উন্নত দেহ, শঙ্খের মতো সে দেহ মসৃণ সুন্দর।

প্রতিমার চিবুক নেড়ে আদর ক'রে দেবীরাণী খুড়িমার পায়ের ধুলো

নিলো। প্রতিমা বললে, এবারে কিন্তু তিনদিনের বেশি থাকতে হবে তোমাকে, দেবীদিদি।

বক্‌শিস্ ?—ব'লে দেবীরাণী হাসিমুখে ফিরে চাইলে। বকশিস না পেলে অতিথির চলবে কেন ?

প্রতিমার হয়ে প্রিয়কুমার উত্তর দিলো, তা বকশিস্ দেবো বৈকি। আমাদের অকুণ্ঠ সেবা, হৃদয়ের ঐকান্তিক—মানে, যাকে বলে—

আপনি কে, মশাই ? চিনিনে ত ?

খুড়িমা হাসছেন। প্রতিমা মুখে আঁচল চাপা দিল। প্রিয়কুমার বললে, বেশ লোক যা হোক, স্টেশন থেকে আনলুম মাথায় ক'রে, তার জন্যে একটু কৃতজ্ঞতাও নেই। উল্টে বাড়ি বয়ে এসে বাড়িওয়ালাকে বলেন, আপনি কে মশাই! ঘোর কলিযুগ!

দেবীরাণীর হাত ধ'রে প্রতিমা তাকে ঘরে নিয়ে এলো। প্রিয়কুমার ভিতরে এসে বলে, বিশিষ্ট অতিথির জন্যে আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে সারাদিন ঘর সাজিয়েছি। দয়া ক'রে সেদিকে একটু প্রসন্ন দৃষ্টি দেওয়া হোক।

প্রতিমা বললে, ওমা, তুমি আবার কখন্ কি করলে ?

করিনি ? ফের আবার স্বামীর অবাধ্য হওয়া ?

কখন্ আমি আবার অবাধ্য হলাম গো তোমার ?

হওনি ?—কৃত্রিম রোষ প্রকাশ ক'রে প্রিয়কুমার বললে, অতিথির সামনে আমাকে অপমান ?

প্রতিমা অবাক হয়ে বললে, আচ্ছা দেবীদিদি, এতে অপমান হোলো কোথায় ?

দেবীরাণী তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, মানী লোক কিনা ওরা, তাই ওরা পদে পদে মান খোয়ায়! তুমি ভাই রাগ ক'রো না।

প্রিয়কুমার বললে, আপনার একথার মানে ?

মানে এই যে, সারাদিন আমি ট্রেনে এসেছি, এখন বিবাদ বাধালে আপনাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে।

প্রতিমা হেসে লুটিয়ে পড়লো।

দেবীরাণী পুনরায় বললে, যান্ চা আনুন, ব'সে ব'সে কোঁদল করবেন না ;—না, না, তুমি থাকো ভাই, ওঁকে একটু খাটিয়ে নিই। ফাইফরমাস করলে উনি বিশেষ দুঃখিত হবেন না।

নিতান্ত অতিথি ব'লেই—এ রকম তাচ্ছিল্য সয়ে রইলুম।—ব'লে প্রিয়কুমার হাসিমুখে বাইরে চ'লে গেল। খুড়িমা এসে অবশ্য তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, বনমালীর হাতে তিনি চা ও জলখাবার পাঠালেন। মিনিট দুই পরেই প্রিয়কুমার আবার ফিরে এসে বসলো।

দেবীরাণী হাসিমুখে বললে, স্ত্রীকে একটু ভালো-টালো বাসেন? না, কেবল কথার চাতুরীতে গ্রামের মেয়েকে ভুলিয়ে রাখেন?

প্রশ্নটিতে একটু অস্বস্তি জাগে বৈ কি। প্রতিমা উঠে পালাবার চেষ্টা করলো। প্রিয়কুমার বললে, পাপমুখে বলতে নেই। আমাদের ভালোবাসা কি আর অন্যলোকে বুঝবে।

এসেই যে-শাসন দেখলুম তাতে বিশ্বাস করা একটু কঠিন।—ব'লে দেবীরাণী বক্রদৃষ্টি ফিরিয়ে হাসলো।

প্রিয়কুমার বললে, মেয়েমানুষের দৃষ্টি বেশিদূর পৌঁছয় না।

দেবীরাণী বললে, তাই নাকি? কথাটা শুনলেও মন ঠাণ্ডা হয়। কই, আমার দিকে মুখ তুলে কথা বলুন ত?

প্রিয়কুমার কিন্তু মাথা তুললো না। মুখ নামিয়েই তামাসা ক'রে বললে, স্ত্রী ছাড়া আর কোনো মেয়ের দিকে আমি মুখ ফেরাইনে। এইটি আমার তপস্যা।

দেবীরাণী খুশিমুখে বললে, ওরে বাবা, এত? খুব যে তোষামোদ করতে

শিখেছেন? গত বছরের চেয়ে একটু উন্নতি হয়েছে দেখছি। চক্ষু সার্থক হোলো।

বেশ ত, থাকুন না কিছুদিন, আরো দেখতে পাবেন।

রক্ষে করুন, আমার বাজার-হাট করা হয়ে গেলেই এখান থেকে পালাবো।

কোথা পালাবেন?—প্রিয়কুমার মুখ তুললো।

কেন, লক্ষ্ণৌতে? যেখানে চাকরি করি?

প্রতিমা বললে, চাকরি ক'রেই তুমি চিরদিন কাটাবে, দেবীদিদি?

কি আর করি ভাই বলো?

বিয়ে করবে না বুঝি?

দেবীরাণী শিউরে উঠে বললে, সর্বনাশ, বিয়ে? একটা পুরুষ মানুষ চিরকাল জ্বালাবে, আর তাই সহ্য করব?

ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠলো।

প্রতিমা বললে, তুমি বড়লোকের মেয়ে, চাকরি ক'রে তোমার কী হবে?

বিয়ে ক'রেই বা কী স্বর্গলাভ?

প্রিয়কুমার সেখান থেকে হঠাৎ উঠে বেরিয়ে গেল। প্রতিমা সরল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দেবীরাণীর প্রতি। স্ত্রীলোকের বিবাহের দিকে মন নেই! বিয়ে হ'লে তাদের স্বর্গলাভ হয় না, তারা স্বামী ছাড়া আর কোনো পরিচয়ে নাকি সংসারে বেঁচে থাকতে পারে, এসব কথা তার কল্পনায় নেই। সুতরাং সর্বপ্রথম যে-কথাটা তার মনে এলো সেইটিই সে প্রকাশ করলো। বললে, কিন্তু স্বামী ছাড়া মেয়েমানুষকে দেখবে কে, দেবীদিদি?

এতদিন কে দেখলো রে?—ব'লে দেবীরাণী একঝলক মলিন হাসি হাসলো।

প্রতিমা বললে, কিন্তু যখন বয়স হবে? বুড়ো হবে?

বেশ ত, তোরাই ত আছিস। ব'লে দেবীরাণী খুব হেসে উঠলো। কথাটা ওঘর থেকে প্রিয়কুমার কান পেতে শুনলো। আর মনের একূল থেকে ওকূল অবধি একটা তরঙ্গ আলোড়িত হয়ে উঠলো।

দেবীরাণীর কেমন একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়—সেটা অনেকটা যেন অস্বাভাবিক। তিনখানা ঘর জুড়ে যখন-তখন তার অহেতুক পদচারণা লক্ষ্য ক'রে প্রতিমা তাকে কি যেন একটা প্রশ্ন ক'রে বসেছিল, কিন্তু একটুখানি হাসি ছাড়া আর কোনো বিশেষ সদুত্তর পায়নি। ভাঁড়ার ঘর খানায় ঢুকে প্রত্যেকটি সামগ্রী লক্ষ্য করা, অনাবশ্যকভাবে রান্নাঘরের ভিতরটা পর্যবেক্ষণ ক'রে অকারণ মন্তব্য করা, গৃহসজ্জার খুঁটিনাটি আলোচনা ক'রে নিজের মতামতটা জানানো, হঠাৎ বাথরুমটায় ঢুকে নিঃশব্দে কতক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—এই রকম বিভিন্ন প্রকার খেয়াল লক্ষ্য ক'রে প্রতিমা অনেক সময়ে হেসেই অস্থির। এক সময়ে আড়ালে গিয়ে স্বামীকে সে প্রশ্ন করে, হ্যাগো, দেবীদিদির মনটা এমন উড়ু-উড়ু কেন, বলো ত?

প্রিয়কুমার বলে, তোমার দেবীদিদিকে জিজ্ঞেস করলেই পারো!

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা প্রতিমার আর হয়ে ওঠে না। লেখাপড়া-জানা মেয়ে ওরা, ওদের মনের ভাব জানতে গিয়ে কি সে শেষকালে নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেবে?

খুড়িমা এক সময়ে দেবীদিদিকে ধরলেন। বললেন, হাঁগা রাণু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলুম, মা।

দেবীরাণী খুশি হয়ে বললে, কি বলুন?

তোমাকে বাজার-হাট করতে কলকাতায় আসতে হোলো? লক্ষ্ণৌ শহরে কিছু পাওয়া যায় না বুঝি?

দেবীরাণী বললে, সবাই কি সেখানে সব পায়, খুড়িমা ? তাই ত এতদূরে ছুটে এলুম।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বৈ কি—খুড়িমা চুপ ক'রে গেলেন। কিন্তু তাঁর সন্দিগ্ধ প্রশ্ন আর অব্যক্ত মনোভাবটি লক্ষ্য ক'রে দেবীরাণী যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। একটু পরে খুড়িমা আবার কথা পাড়লেন। বললেন, বিয়ের পর আমরা জানলুম, তোমাদের সঙ্গে বৌমাদের আত্মীয়তা আছে। কিন্তু তুমি নাকি আগে কলেজে পড়তে প্রিয়কুমারের সঙ্গে ?

দেবীরাণী একটু চমকে উঠলো। কিন্তু ভাবগোপন ক'রে বললে, সেটা আমার ঠিক মনে পড়ে না। তবে বছর মিলিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, প্রিয়-কুমারবাবু পড়তেন সেই সময়টায়।

তোমার মনে নেই ?

একটু আধটু অস্পষ্ট মনে পড়ে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী ছিল কিনা—

খুড়িমা তাঁর মন্তব্য জানালেন। বললেন, আমি ঠিক ভালো বুঝিনে মা —ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়া, অনেক রকম কথা ওঠে কিনা—

দেবীরাণী বললে, তা ঠিক বলেছেন আপনি। অনেকের জীবন ভেঙে-চুরেও তচনচ হয়ে যায় শুনেছি!—এই ব'লে সেখান থেকে সে স'রে গেল। প্রতিমা তার পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। সরল নির্বোধ ও গ্রাম্য তার দুটি চোখ।

সমস্ত ফ্ল্যাটটার মধ্যে মানুষের মনোবিকলনের একটা সূক্ষ্ম নাটকীয় ঘাত-সংঘাত চলেছে, উপরে সেটা প্রত্যক্ষ নয়। ঘটনায় তার কোনো প্রকাশ নেই, বাঙ্ময়তায় সেটা আন্দোলিত হয় না—কিন্তু চলাফেরায়, চাহনিতে, ভ্রূকুঞ্চনে, ঈষৎ হাস্যে—সেটা প্রকট। প্রতিমার সাধ্য নেই সেটাকে স্পর্শ করে, খুড়িমার সাধ্য নেই সেটাকে আবিষ্কার করেন। এ নাটক সকলের জন্যে নয়।

দেবীরাণী এসে দাঁড়ালো এ ঘরে। প্রিয়কুমার তখন একখানা বই মুখে

দিয়ে ব'সে রয়েছে। মুখ না তুলে সে বললে, তোমার দেবীদিদির কোনো অযত্ন হয় না যেন, দেখো।

তুমি নয়, আপনি! দেবীরাণী পিছন থেকে হেসে উঠলো।

সলজ্জ বিস্ময়ে প্রিয়কুমার বললে, বুঝতে পারিনি আপনি এসে দাঁড়িয়েছেন।

দেবীরাণী বললে, কিন্তু যত্ন করলেও যদি আমি খুশি না হই?

তাহ'লে বলুন কিসে আপনি খুশি হবেন?

যদি বলি, হে বলি-রাজা, তুমি স্বর্গ আর মর্ত্যের অধীশ্বর—মস্তবড় দাতা তুমি। কিন্তু স্বর্গ আর মর্ত্যলোক আমাকে দান করুন—পারবেন?

প্রিয়কুমার বললে, আপনি অন্তর্যামী নারায়ণ হ'লে পাতালে যেতে পারতুম বৈ কি।

দেবীরাণী বললে, না, পারতেন না। কোনো যুগেই পুরুষ মেয়েদের জন্যে সর্বস্বান্ত হয়নি। মেয়েদের প্রাণ নিয়ে তারা জীবন-মরণ খেলায় মেতেছে। হেরেছে কিংবা জিতেছে, এইমাত্র।—শেষের কথাটায় তার গলা একটু ধ'রে এলো।

প্রিয়কুমার নতমুখে চুপ ক'রে রইলো, আর কোনো জবাব দিলো না।

দেবীরাণী বললে, আপনার খুড়িমার প্রশ্নবাণে আমি জর্জরিত। তিনি বলেন, লক্ষ্ণৌ থেকে এতদূরে এসে বাজার-হাট করা! সেখানে কি কিছুই পাওয়া যায় না?

প্রিয়কুমার বললে, আপনি কী জবাব দিলেন?

ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে দেবীরাণী বললে, সেকথা শোনবার কি কোনো দরকার আছে আপনার? আপনি কি মনে করেন, আপনার খুড়িমার কাছে কথার চাতুরী খেলতেই আপনার এখানে এসেছি?

এই ব'লে সে স'রে গেল। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রিয়কুমার

রুদ্ধ নিশ্বাসে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইলো। ঘরের বাতাসটা যেন থমথম করছে। কে যেন একটা মস্ত কান্নার গলা টিপে ধরেছে।

এমন সময় প্রতিমা এসে দাঁড়ালো দেবীরাণীর কাছে। মুখ ফিরিয়ে দেবীরাণী বললে, এসেছিস ? অতিথিকে কোথাও যেন একলা ফেলে রাখিসনে, তাকে ভূতে পায়, জানিস ত ?

প্রতিমা খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। দেবীরাণী সস্নেহে তার গলা ধ'রে বললে, হ্যাঁ রে ভাই, সত্যি ! আচ্ছা প্রতিমা, একটা কথা ঠিক ক'রে বলতে পারিস ?

কী বলো ত ?

মরুভূমির ওপর যদি বুকের রক্ত গড়িয়ে পড়ে, তবে কি সে-মরুভূমি উর্বর হয় ?

কথাটা যাকে উদ্দেশ ক'রে বলা, সে তখনো বইখানা সামনে ধ'রে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রয়েছে। প্রতিমা জবাব দিলো, আমি ত ভাই বলতে পারিনে !

দেবীরাণী বললে, পারিসনে, কেমন ? বেশ। আচ্ছা, বলতে পারিস, ত্রেতাযুগে কোনো ছলনাময়ী রাজা রামচন্দ্রের মন ভোলাতে চেষ্টা করেছিল ? বোধহয় করেনি, কি বলিস ?

সরলভাবে প্রতিমা বললে, আমি ভাই ছোটদের রামায়ণ পড়েছিলুম, তাতে এসব ছিল না।

দেবীরাণী সহসা অন্য জানলাটার কাছে স'রে গেল। তার পর বললে, তোদের এদিকটা বড্ড ফাঁকা। এত ফাঁকায় তোরা থাকিস, মন হু হু করে না ? কোথাও গাছপালা নেই, কেবল প্রকাণ্ড একটা শূন্য !—তার গলাটা যেন শান্ত হয়ে এলো।

প্রিয়কুমার আস্তে আস্তে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেইদিকে একবার লক্ষ্য ক'রে দেবীরাণী বললে, আমার এক একবার কী মনে হয়

জানিস, প্রতিমা ? মানুষের জীবন হোলো ঈশ্বরের মস্ত একটা জিজ্ঞাসা,—আমরা কেবল তারই উত্তর হাতড়ে হাতড়ে বেড়াই। সে উত্তর খুঁজে পাবো না কোনোদিন।

সমস্ত শুনে প্রতিমা বললে, তুমি এবার চান্ করবে চলো দেবীদিদি।

প্রস্তাবটা শুনে সহসা অহেতুক ব্যস্ততা সহকারে দেবীদিদি ব'লে উঠলো, তাই চল্। খেয়ে-দেয়েই আমাকে একবার বেরুতে-হবে। কি জানিস ভাই, ঘরের মধ্যে আমার মন কিছুতেই টিঁকতে চায় না।

অনুযোগের সঙ্গে প্রতিমা বললে, কি ক'রে টিঁকবে ? ঘরকন্নার স্বাদ যে তুমি পাওনি !

পিছন ফিরে হাসিমুখে দেবীদিদি প্রতিমার গাল দুটি নেড়ে দিয়ে বললে, বোকা মেয়ে ! ঘরকন্নার আবার স্বাদ কী রে ? প্রাণটাই যদি খুঁজে না পাই, দেহটির দাম কতটুকু ?—এই ব'লে সে স্নান করতে চ'লে গেল।

সেদিন কোনোমতে দুটি আহারাদি সেরে দেবীরাণী বেরিয়ে পড়লো। যখন সে ফিরলো তখনও সন্ধ্যা হয়নি। তার পিছনে পিছনে একটি ছোকরা এসে জিনিসপত্র সমেত একটা চাঙারি রেখে চ'লে গেল। দেবীরাণী গিয়েছিল মার্কেটে। চাঙারিতে একগোছা রজনীগন্ধার সঙ্গে দুটি অন্যান্য ফুলের তোড়া। কতকগুলি মরশুমী সুস্বাদু ফল, একখানি অপরাজিতা রংএর শাড়ি, এবং নানাবিধ প্রসাধন-সামগ্রী। দেবীরাণী নিজের হাতেই সেগুলি ঘরে তুলে নিয়ে এলো।

চাঙারিটি দেখেই প্রতিমা গিয়ে ঘরে লুকিয়েছিল। দেবীরাণী হাসিমুখে ঘরে ঢুকে প্রতিমার হাত ধ'রে টেনে আনলো। প্রতিমা রাগ ক'রে বললে, বছর-বছর এসে তুমি এমনি ক'রে বেহিসেবী খরচ ক'রে যাবে, এবার আমি আর শুনবো না, দেবীদিদি !

দেবীরাণী বললে, তোকে না সাজালেই আমার চলবে না রে।

কেন, শুনি ?

আচ্ছা শোনাবো একদিন। এই ব'লে দেবীরাণী তাকে প্রিয়কুমারের পড়ার ঘরে টেনে নিয়ে এলো। পুনরায় বললে, যদি বলি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত তোকে শোনাবো,—তোর ঘুম পাবে না ?

প্রতিমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তার পর বললে, দেবীদিদি ?

কেন রে ?

তোমার কথা কোনদিন আমি বুঝতে পারিনি।

তাহ'লে নিশ্চয় আমি একটা পাগল!—ব'লে দেবীরাণী হেসে উঠলো। কিন্তু সে হাসিতে এবার প্রতিমা যোগ দিতে পারলো না।

দেবীরাণী প্রতিমার সুন্দর ও সুকুমার দেহখানিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জামা ও কাপড় পরিয়ে দিলো। চোখের পাতায় কাজলের মোহ এঁকে দিলো, তার খোঁপায় দিলো ফুল, পায়ে দিলো আলতা। তার পর বললে, পারবিনে ভোলাতে ?

প্রতিমা হেসে বললে, কা'কে ?

দেবীরাণী বললে, স্বামীকে নয়, পুরুষকে।

ওমা, সে কি !

হ্যাঁ রে। স্বামী ত ভুলতে বাধ্য—কিন্তু স্বামীর মধ্যে যে পুরুষের বাসা, তাকে ভোলানো বড় কঠিন, প্রতিমা। কিছু দিয়েই তাকে ভোলানো যায় না —মেয়েমানুষের সমস্ত জীবনের তপস্যাটাও তাদের কাছে কিছু নয়! তারা নির্দয়, হৃদয়হীন,—তারা হিমালয়! যদি ভোলাতে পারিস, বুঝবো আমার এই সাজানো সার্থক। এই ব'লে সে গলাটা একবার ঝেড়ে নিলো।

প্রতিমা বললে, একথা কেন বল্‌ছ, দেবীদিদি ? উনি ত তেমন মানুষ নন্ যে, আমাদের অনাদর করবেন ? অনেক পুণ্যের জোরে আমি ওঁকে পেয়েছি!

দেবীরাণী পিছন দিকে দাঁড়িয়ে প্রতিমার আল্‌গা খোঁপাটা ঠিক ক'রে দিচ্ছিল। কিন্তু প্রতিমার কথায় ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মতো তার চোখ দুটো পলকের জন্য জ্বলে উঠলো, সেটা আর দেখা গেল না। কেবল শান্ত কণ্ঠে বললে, নিশ্চয়, সে একশোবার। তোর মতন পুণ্যবতী ক'জন আছে ভাই!

প্রতিমা স্বস্তিবোধ ক'রে নীরব হয়ে গেল। কিন্তু তার পর, সাজসজ্জার শেষে, দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার ঠিক পথেই প্রিয়কুমার এসে হাজির। স্ত্রীর দিকে চেয়ে সে বললে, একি! ইন্দ্রসভায় আজ নাচের ফরমাস আছে নাকি?

প্রতিমা হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেল ভাঁড়ারের দিকে। দেবীরাণী পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালো প্রায় প্রিয়কুমারের মুখোমুখি। কৈফিয়ৎ স্বরূপ প্রিয়-কুমার বললে, কলেজ থেকে বেরিয়ে আজ যেতে হয়েছিল এক চায়ের পার্টিতে। জানি, অতিথির আজ কিছু অনাদর ঘটে গেছে।

পাথরের পুতুলের মতো দেবীরাণী দরজাটার গায়ের ওপর নতমুখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মৃদুকণ্ঠে ব'লে বসলো, কেবল আজ ত' নয়—চিরদিন!

কথাটার সঙ্গে একটা চাবুকের আঘাত ছিল, কিন্তু প্রিয়কুমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। একরাশ বই টেব্‌লের ওপর রেখে মুখ ফিরিয়ে সে শুধু বললে, আপনার কি কালই যাওয়া স্থির?

না।

আর কতদিন থাকবেন?

যতদিন খুশি।

প্রিয়কুমারের গলার কাছে আতঙ্কের মতো কি যেন একটা ঠেলে উঠলো। কিন্তু সেটাকে চেপে হাসিমুখে সে বললে, কিন্তু বাসনার চিহ্ন প্রতিমার সর্বাঙ্গে এঁকেই কি এখানে দিন কাটাবেন?

দেবীরাণী চুপ ক'রে রইলো।

প্রিয়কুমার পুনরায় বললে, পুরুষকে যন্ত্রণা দেবার নির্ভুল পথ এটা নয়!

দেবীরাণী মুখ তুললো। সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা গেল না তার তীব্র চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল কিনা। সে কেবল অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে বললে, তবে নির্ভুলপথ কোন্‌টা? কেমন ক'রে যন্ত্রণা দিলে তোমার বুক ভেঙে দেওয়া যায়—ব'লে দিতে পারো?—এই ব'লে সে ছুটে সেখান থেকে চলে গেল। ঝরঝরিয়ে তার চোখে জল এসেছিল।

নিজের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে প্রিয়কুমার পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সেদিন সে মাথার কাছে টেব্‌ল-ল্যাম্প রেখে বিছানায় শুয়ে একখানা মোটা ইংরেজি বই মুখের কাছে নিয়ে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। রাত তখন অনেক। ওঘরে প্রতিমা আর দেবীরাণী নিদ্রিত। তার পাশের ঘরে খুড়িমা। এ ঘরে আলোটা জ্বলছে, দরজাটা খোলাই রয়েছে।

পড়তে পড়তে কখন্‌ যে তার দুই চোখে ঘুম এসেছে, কখন্‌ ঘড়ির কাঁটাগুলি ঘুরে ঘুরে শেষরাত্রির দিকে এসে পৌঁছেছে, প্রিয়কুমারের কিছুমাত্র চেতনা ছিল না। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার পেরিয়ে জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে, রাতজাগা পাখী কোথায় হায়রান হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে, কখন্‌ নিঃসাড় অন্ধকার জগৎ তার চক্রপথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে প্রভাতের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল, তাও এই ক্ষুদ্র পরিবারটির অজ্ঞাত ছিল।

সহসা আচমকা এক সময়ে প্রিয়কুমারের ঘুম ভেঙে গেল। কখন্‌ সে ঘুমিয়েছিল, কেন তার ঘুম ভাঙলো ঠিক বুঝতে পারা গেল না। কিন্তু উৎকর্ণ অধ্যাপকের বিশ্লেষণী বুদ্ধি একথা অনুভব করলো, তার আচমকা ঘুমভাঙার একটা সঙ্গত কারণ আছে বৈ কি। ঘরের খোলা দরজা, উজ্জ্বল আলো, ব্রাকেটের ওপর টিকটিকি ঘড়ি, দেয়ালের ছবি, কাপড়ের আল্‌না—

সবগুলো যেন চক্রান্ত ক'রে মুখ বুজে গোপন কথাটা চেপে রয়েছে। মনে হচ্ছে একটা অস্পষ্ট সংবাদ তার অচেতন ঘুমের মধ্যে নিঃশব্দসঞ্চারে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেটার অশরীরী আত্মাটা এখনো তার এই পড়ার ঘরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, ঘড়িতে রাত সাড়ে চারটে বাজে। এতক্ষণ ধ'রে সে ঘুমিয়েছে? এত তার ঘুম?

সহসা বাইরে খুড়িমার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল,—ওখানে কে গা দাঁড়িয়ে? বৌমা নাকি?

পলকের জন্য মৃত্যুর মতো একটা তুহিন স্তব্ধতা। তার পর শোনা গেল, না খুড়িমা, আমি।

কে, রাণু?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

খুড়িমা বললেন, এত রাত থাকতে উঠেছ কেন, রাণু?

তাঁর কণ্ঠে কেমন একটা সংশয়ের আভাষ পেয়ে দেবীরাণী একটু থতিয়ে জবাব দিলো, ঘুমটা ভেঙে গেল রাত থাকতেই। আজ ভোরের গাড়িতে যাবার তাড়া আছে কিনা।

এটা একটা আকস্মিক কৈফিয়ৎ, প্রিয়কুমারের কানে বাজতে লাগলো। দেবীরাণী চ'লে যাওয়া স্থির ক'রে ফেললো একটি নিমিষের মধ্যেই? সে এত অস্থির, এতই অতৃপ্ত?

খুড়িমা বললেন, ওমা, প্রিয়কুমারের ঘরে আলো জ্বলছে কেন? ও কি এখনো ঘুমোয়নি? বৌমা, শুনছ? ও বৌমা—?

প্রতিমা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠলো। উঠে সাড়া দিলো, কেন খুড়িমা?

তোমার এত ঘুম কেন, বৌমা? সমস্ত রাত ধ'রে প্রিয়'র ঘরে আলো জ্বলছে, দরজাটা খোলা—তুমি একটিবার খবর নিতে পারোনি, কেন? এত রাতে রাণু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে বারান্দায়, তারও একটা খোঁজ-খবর

রাখা তোমার উচিত ছিল, বৌমা—খুড়িমা বিরক্ত, উত্তপ্ত ও সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিলেন।

প্রতিমা বাইরে এসে বললে, দেবীদিদি, এখানে দাঁড়িয়ে যে?

দেবীরাণী অসাড় ও চেতনাহীন হয়ে জ্যোৎস্নালোকের দিকে নিমেষনিহত চক্ষে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতিমার প্রশ্নে সে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি ফিরিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, তোমার বাড়িতে এক জায়গায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা, কিংবা রাতজাগার স্বাধীনতা নেই—একথা জানতুম না, প্রতিমা।

তার গলার আওয়াজে প্রতিমা একটু লজ্জিত হয়ে স'রে দাঁড়ালো। বললে, না দিদি, তুমি ঘুমোওনি কিনা তাই বলছি।—আসছি ভাই ওঘর থেকে।

প্রতিমা এলো স্বামীর ঘরে। বিছানার কাছে এসে সে প্রিয়কুমারের পা ঠেলে ডাকলো, কিন্তু একবার ঘুমোলে প্রিয়কুমারের নাকি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে একেবারে বেহুঁশ, তার নাক ডাকছে। পাছে শেষরাতে জাগালে প্রিয়কুমার বিরক্ত হয়, সেজন্য প্রতিমা আর তাকে ডাকলো না। কিন্তু নিজের হাতখানা সরিয়ে নিয়ে প্রতিমা দেখলো, তার হাতে জলের দাগ। নদীয়ার কোন্ এক ক্ষুদ্রগ্রামের সরল মেয়ে সে, নির্বোধ—জলের দাগের কারণটাকে সে তলিয়ে বুঝলো না। আলোটা নিবিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে সে বেরিয়ে এলো। তার মনে কোনো সন্দেহের ছোঁওয়া লাগেনি।

খুড়িমা বললেন, তুমি আর ঘুমিয়ো না, বৌমা। রাণু যাবে ভোরের গাড়িতে—তার জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে দও। বনমালীকে ডেকে উনুনে আগুন দিতে বলো।

শরৎকালের রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। প্রিয়কুমার ঘুম থেকে উঠলো।

শুনলো দেবীরাণী এখনই চ'লে যাবে। সে মুখ হাত ধুয়ে প্রস্তুত হোলো। বনমালী গাড়ি ডেকে আনলো।

দেবীরাণী গাড়িতে ওঠবার আগে প্রতিমাকে আদর করলো, তার পর প্রিয়কুমারের দিকে ফিরে বললে, শুনেছি মরবার পরে মানুষ কোথায় গিয়ে যেন নিজের একটা কৈফিয়ৎ দেয়। আমিও কৈফিয়ৎ দিয়ে বলতে পারবো, সমস্ত জীবন ধ'রে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়েছি, কিন্তু নিরপরাধকে কখনো প্রতারণা করিনি!

প্রিয়কুমার হাসিমুখে বললে, কিন্তু নিরপরাধকে অনিচ্ছায় যারা চিরদিন ধ'রে ঠকাবে, তাদের কি উদ্ধার নেই?

প্রভাতের আলোর মত দেবীরাণী হেসে উঠলো। বললে, বেশ ত, আপনি আর আমি একসঙ্গে গিয়ে যদি মহাকালের বিচারসভায় দাঁড়াতে পারি, তখন এর মীমাংসা হবে!

অদূরে দাঁড়িয়ে খুড়িমা বললেন, তোমার গাড়ির সময় হোলো, রাণু! এসো মা, এসো—সুমতি হোক—দুর্গা—দুর্গা—

দেবীরাণী গাড়িতে উঠে বসলো। গাড়ি ছেড়ে দিলো। সেইদিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রিয়কুমার মনে মনে বললে, সেখানেও এর মীমাংসা হবে না রাণু।

আশাপূর্ণা দেবী

বাংলা দেশের মহিলা লেখিকাদের সম্বন্ধে অনেকেরই মনে ক্ষোভ ছিল যে, তাঁরা কেউ হাসতে বা হাসাতে পারেন না, সবাই ভারী ভারী বই লেখেন, কাঁদেন ও কাঁদান। আশাপূর্ণা সেই ক্ষোভ দূর করেছেন অনেকটা। অথচ তাঁর হাসি কোথাও ভাঁড়ামির হাসি নয়, হো-হো ক'রে উচ্চ হাস্য নয়—বুদ্ধির দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল তাঁর মধুর গল্পগুলি সমস্ত চিত্তকে প্রসন্ন ক'রে তোলে। এ শুধু মহিলা লেখিকা কেন, সমস্ত লেখকের পক্ষেই গর্বের কথা। মানুষের মন যেন এঁর নখদর্পণে—তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বৈচিত্র্যও এঁর চোখ এড়ায়নি। কোনো কোনো সমালোচক এঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, পুরুষের চোখে ইনি মানুষকে দেখেছেন—এটা কম কথা নয়। স্ত্রীলোক হয়েও যদি পুরুষের চোখে পুরুষকে ও মেয়েকে দেখতে পেরে থাকেন ত সেটা তাঁর অসাধারণ মনীষারই পরিচায়ক। সাধারণ গৃহস্থঘরের বধূ হয়ে গৃহিণীপনার সব দায়িত্ব বহন ক'রেও আশাপূর্ণা এ পর্যন্ত প্রচুর লিখেছেন, এবং অনেক ভালো গল্প লিখতে পেরেছেন ইতিমধ্যেই।

আমায় ক্ষমা করো

প্রায় আধখানা গ্রাম জুড়িয়া যে ধ্বংসপ্রায় প্রাসাদশ্রেণী বিগত গৌরবের নিদর্শন বহিয়া ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মত ইতস্তত ছড়াইয়া আছে আজও তাহারা দর্শকের মনে একটা সকরুণ শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলে।

মজুমদার-বংশের অতীত মহিমার মূক সাক্ষী।

একদিন নাকি ইঁহাদের "রাজা" বলিয়া খ্যাতি ছিল। 'বারমহল', 'অন্দরমহল', 'কাছারিঘর', 'নাট-মন্দির', 'দুর্গাদালান', 'ভোগমণ্ডপ', 'রান্না-বাড়ি' ইত্যাদি নামের আড়ালে ভাঙা ইঁটের স্তূপের ভিতর যে অস্পষ্ট ছবি

ভাসিয়া ওঠে তাহার সামনে মাথাটা আপনিই কেমন নত হইয়া আসে, আর আসে একটা 'হায় হায়' ভাব···কেমন ছিল সেই বিচিত্র সমারোহের কোলাহলময় দিনগুলি···কেমনই বা ছিল ইহাদের অধিকারীরা···যাহারা এখানে একদিন জন্ম-মৃত্যু হাসি-কান্না সুখ-দুঃখের অংশ অভিনয় করিয়া গিয়াছে !···

ভাঙা দেয়ালের ফাটলে ফাটলে এখনো কি তাহাদের অতৃপ্ত নিশ্বাস জড়াইয়া আছে ? ভোগের এই অজস্র উপকরণ ফেলিয়া যাওয়ার অতৃপ্তি ?

চৈত্র-বৈশাখের এলোমেলো সন্ধ্যায়—কপাট-খসা জানালার ফোকরে ফোকরে যে আর্তস্বর হাহাকার করিয়া ফিরে—সে কি তাহাদেরি সঞ্চিত দীর্ঘশ্বাস ! চামচিকা ও গোলাপায়রার ঝাঁক ছাড়া এখানে অন্য কোনো জীবিত প্রাণীর অস্তিত্ব বাহির হইতে বিশ্বাস করা শক্ত—বরং বেশি সহজ ভূতের অস্তিত্ব কল্পনা। তবু, আছে।

হয়তো নেহাৎ নিরুপায় বলিয়াই আছে।

অন্দরমহলের মধ্যে যে যে ঘরগুলো এখনো কোনো প্রকারে টিঁকিয়া আছে তাহারি একখানিতে থাকেন 'নতুন গিন্নি'। নবদ্বীপ মজুমদারের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। সত্তরের কাছাকাছি বয়স, মাজাভাঙা থুনথুনে বুড়ি, চোখের চাহনি নিষ্প্রভ, শুধু গলার জোর আছে সমান।

দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার হোঁচোট খাইতে খাইতে কোনো গতিকে বুড়ি নিজের পেটের ব্যবস্থাটুকু করিয়া লয়, আর ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ হইতে শুরু করিয়া পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ দেব-দানব সকলের উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে থাকে।

বিশ্বসংসারে সকলের উপর ওর অদ্ভুত এক বিজাতীয় ঘৃণা। পৃথিবীটাকেই দাঁতে পিষিয়া ফেলিতে পারিলে যেন ওর শান্তি হয়।

রৌদ্রের তাপ অসহ্য হইলে ভাঙা কোমরকে সোজা করিবার ব্যর্থ-চেষ্টায়

কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া চোখের উপর হাত আড়াল করিয়া আকাশমুখী হইয়া তীব্রস্বরে বলে—'মরছো আগুন জ্বেলে? পুড়িয়ে মারছো পৃথিবীকে? তোমার মরণ হয় না অনামুখো? ভর্ দুপুরে শাপ দিই তোমায়—জ্বলে পুড়ে মরো, জ্বলে পুড়ে মরো!'

অবশ্য সূর্যদেবের গায়ে ব্রাহ্মণ-কন্যার অভিসম্পাতের আগুন স্পর্শ করে কি না তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বুড়ির এই অযথা শক্তিক্ষয়ে আলস্য নাই। আবার বর্ষার দিনে একঘেয়ে বৃষ্টির শব্দ ছাপাইয়া অসন্তোষ মুখর হইয়া ওঠে—'ঝাঁটা-খেকো দেবতা কেঁদে মরছেন, কোন্ যমে ধরেছে তোমায়?'

কাক, চিল, ইঁদুর, আরশোলা সকলের উদ্দেশেই প্রতিপক্ষের ভঙ্গীতে বাক্যবাণ বর্ষণ হয়।...উঠানের ওপারে শ্যামাকে দেখা যায়...দুই হাতে এক গোছা সজিনা ডাঁটা ও একটি পাকা বেল, কোঁচড়ে গোটাকয়েক পাতি নেবু। নতুন গিন্নিকে দেখিয়া অপ্রতিভের ফিকা হাসি হাসে...সাধ্য পক্ষে ইঁহার সামনে পড়িতে চায় না সে।

শ্যামাকে দেখিয়াই তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া ওঠে বুড়ি—এই যে পাড়া-বেড়ানী 'খুদ-মাঙুনী' এলেন! সক্কাল বেলাই লোকের দোরে গিয়ে হাত পাততে লজ্জা করে না শামি? অমন পেটে আগুন ধরিয়ে দে, আগুন ধরিয়ে দে! ভাতার-পুতের সংসার নয়—একটি পোড়া পেট, তার জন্যে এত আহিঙ্খে? ছিঃ ছিঃ, আমি হ'লে গলায় দড়ি দিতুম।

শ্যামার যে এ বাড়িতে সত্যকার কি দাবী আছে সেটা খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত—হয়তো অতি সূক্ষ্ম একটু সম্বন্ধের রেশ থাকিলেও থাকিতে পারে, হয়তো কেবলমাত্র আশ্রয়হীনতার দাবীতেই আছে।

অথচ এতবড় ভাঙা বাড়িতে তাহার মন টেঁকে না—তাই সারাদিন বেড়ায়—সময়ে অসময়ে লোকের উপকার করিতেও ছাড়ে না, এবং ভদ্রতার

আবরণে ভিক্ষাবৃত্তি করিয়াই তাহার দিন চলে।

আরো একজন বাসিন্দা আছে—সে হৈমন্তী।

প্রেতপুরীর অন্ধকার গহ্বরেও কি সোনার প্রদীপ জ্বলে? জ্বলিলে হয়তো তুলনা করিবার মতো বস্তু একটা মিলিত হৈমন্তীর।

এ বাড়ির শেষ বংশধর সমুদ্রনারায়ণের স্ত্রী হৈমন্তী, সৌন্দর্য আর সুলক্ষণের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া আনা মেয়ে। কিন্তু কোষ্ঠীকারদের শাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া হৈমন্তীর জীবন-ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে অদ্ভুতভাবে।

নিতান্ত দরিদ্র ঘর হইতে যখন এ বাড়িতে বধূবেশে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনো—বাজনার শেষে সুরের রেশের মতো পূর্বগৌরবের কিছু জের আছে। জীর্ণ জামিয়ারের আংরাখা গায়ে দিয়া আর চওড়া কল্কাপাড় শান্তিপুরী ধুতি পরিয়া দাদাশ্বশুর বিশ্বনারায়ণ রুপার থালায় পাঁচখানি আকবরী মোহর দিয়া কন্যা আশীর্বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন।

হৈমন্তী পশ্চিমের মেয়ে,—দরিদ্র পিতার ঘর হইতে সে প্রচুর ঐশ্বর্য বহিয়া আনিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু আনিয়াছিল অনবদ্য রূপ আর অপূর্ব সঙ্গীতানুরাগ।

এই বনেদী জমিদারের ঘরে মলপরা নোলোকপরা, অষ্টাঙ্গ গহনায় মোড়া মেয়েদের মাঝখানে হৈমন্তী যেন একটা আবির্ভাব!

তা সমুদ্র তাহার মান রাখিয়াছিল, সনাতন নিয়মের গণ্ডী কাটাইয়া তাহার জন্য রাখিয়াছিল অনেকখানি আকাশ, অনেকটা আলো। কিন্তু কয়দিনই বা? উৎসববাড়ির হাজারবাতির ঝাড়ের মতো নিমিষে মিলাইয়া গেল সেই সমারোহের দিনগুলি।...

সেদিন চাঁদ উঠিয়াছিল...সদ্যফোটা চাঁপাফুলের মদির গন্ধে বাতাস উন্মনা

…দিঘির ঘাটের বাঁধানো চাতালে হৈমন্তী বসিয়াছে সেতার হাতে… জ্যোৎস্নায় মাজা দেহ…পরনে নীলাম্বরী…পায়ের কাছে সমুদ্রনারায়ণ…

হৈমন্তী বলিয়াছিল—আজ আর বাজাতে ভালো লাগছে না, কি জানি কেমন যেন ভয় করছে। মনে হচ্ছে—

—কি মনে হচ্ছে বল তো?

—মনে হচ্ছে এত সুখ বুঝি সইবে না—বুকের ভিতরটা কেমন যেন করছে। মনে হচ্ছে এই বুঝি শেষ—

নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে কথার শেষ হারাইয়া গিয়াছিল—সমুদ্র হাসিয়া বলিয়াছিল—বুকের এত কাছে থেকে ভয় কেন হৈম? কিসের ভয়? ওটা দক্ষিণে হাওয়ার গুণ, কবিরা তাই বলেন মাতাল বাতাস। তোমার সেই সুরটা বাজাও…সেদিন যেটা ছাতে বসে বাজালে।

হৈমন্তী ধীরে ধীরে বাজনাটা তুলিয়া লইয়াছিল…কিন্তু হাত খুলিল না, সুর কাটিয়া গেল বার বার…কাতরভাবে বলিয়াছিল—আজ থাক্—শুধু তুমি আমার কাছে এসো, খুব কাছে।

—আরো কাছে? সমুদ্র হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু হাসির সুর মিলাইবার আগেই বাড়ির ভিতর হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিল ক্ষীরোদা ঝি—দাদাবাবু, সর্বনাশ হয়েছে—

—কি রে ক্ষীরোদা, ব্যাপার কি?

—ইন্দির-দাদাবাবু নাকি বাগদীপাড়ায় গিয়ে কি কেলেঙ্কার করেছিল, তারা পাড়া ঝেঁটিয়ে লাঠি নে' তেড়ে এসেছে—

মুহূর্তে মাথার ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল…আবার এই কাণ্ড? এই সেদিন ইন্দ্রের জন্য কত হাঙ্গামা কত অপমান সহিতে হইল। পুলিশকে আক্কেলসেলামী দিতে গিয়া সমুদ্রের মাথাটা হেঁট হইয়া গিয়াছিল। পিসির ছেলেকে লইয়া এত ঝঞ্ঝাট পোহানোর দায় কিসের?

বাড়ির মধ্যে ঢুকিতেই ভীত ইন্দ্রনাথ ছুটিয়া আসিয়া কাতরভাবে বলিল,
—ছোড়দা, তোমার পায়ে পড়ি বাঁচাও, ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে—

—ওরা ? ওদের হাতে পড়বার আগে আমিই তোমায় খুন করবো রাস্কেল—

আচমকা ধাক্কা খাইয়া ইন্দ্র উঁচু রোয়াকের উপর হইতে ছিটকাইয়া পড়িল শানবাঁধানো উঠানে। আশ্চর্য ! পড়িল আর উঠিল না।

সমুদ্রকে জব্দ করিবার জন্য সত্যই খুন হইয়া গেল ইন্দ্র ?

জোয়ান ছেলে, স্বাস্থ্যসবল দেহ—পড়িয়া মরিয়া যায় ? হয়তো আশঙ্কায় আর উত্তেজনায় স্নায়ুশিরা টান হইয়াছিল···এতটুকু আঘাতেই ছিঁড়িয়া খান খান হইয়া গেল !

এখনো সে দৃশ্য চোখের উপর ভাসিয়া বেড়ায় হৈমন্তীর। উঠানের মাঝখানে ইন্দ্রের মৃতদেহ ঘিরিয়া বাগদী প্রজাদের নীরব জনতা, একজনের হাতে একটা মশালের আলো দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে—দুরন্ত বাতাসে তাহার সঞ্চরণশীল আলোছায়ায় সমুদ্র মুহূর্তে মুহূর্তে যেন হারাইয়া যাইতেছে।

চাঁদ বোধ করি তখন অস্ত গিয়াছে।

কেমন করিয়া সেই বাগদীদের সাহায্যেই লাশ সরানো হইল, কেমন করিয়া তাহাদের নির্বন্ধে সেই রাত্রেই সমুদ্র গ্রাম ছাড়িয়া ফেরার হইল, সে সব কথা এখন আর হৈমন্তীর বোধ করি ভালো মনে পড়ে না।

শুধু সমুদ্রের শেষ কথাটা মনে পড়ে···'পুলিশের হাতে ধরা দেবার সাহস খুঁজে পাচ্ছি না হৈম, তোমাকে বিধবা করতে পারব না···পারব না তোমায় ফেলে মরতে···'

তাই দীর্ঘ এক যুগ বৈধব্য আর সাধব্যের অদ্ভুত ত্রিশঙ্কুলোকে কাটাইয়া আসিতেছে হৈম। আর মাস দুই গেলেই সিঁদুর মুছিয়া থান ধরিবার ব্যবস্থা, এক যুগ কাটিয়া গেলে নাকি নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

আঠারো বছর হইতে ত্রিশ বছরের দরজায় আসিতে যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে হৈমন্তীকে, সে কি এতই ক্লান্তিহীন ?

খুনীর স্ত্রী, ফেরারী আসামীর স্ত্রী, এই ঘৃণ্য পরিচয় লইয়া এতদিন বাঁচিয়া আছে হৈমন্তী কি হিসাবে ?

হয়তো মরিবার সাহস সেও খুঁজিয়া পায় নাই।

সমুদ্র যদি কোনদিন ফিরিয়া আসে···যদি ডাক দেয়···সাড়া দিবে কে ?

শবরীর প্রতীক্ষার মতোই বুঝি ধৈর্যহীন প্রতীক্ষা হৈমন্তীর।

তবু এ বাড়িতে টিঁকিয়া থাকা আশ্চর্য বই কি। কেবলমাত্র শ্যামা আর নতুন গিন্নির মতো লোকের আবহাওয়ায় হৈমন্তীর মতো মেয়ে এতদিন কাটাইল কেমন করিয়া, যেখানে রুচি প্রবৃত্তি শিক্ষা পদে পদে ব্যাহত হইতে থাকে ? দারিদ্র্য সহ্য করা সহজ, কিন্তু নির্লজ্জ নগ্নতা সহ্য করা কঠিন নয় কি ?···

সমুদ্রর ফটোয় টাটকা মালাগাছটি পরাইয়া বাসি মালাটি খুলিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হৈমন্তীর নিত্য কাজ। নতুন গিন্নির যে জানা নাই এমন নয়, তবু খিড়কির দরজায় হৈমন্তীর শাড়ির পাড়ের শেষাংশটুকু মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নতুন গিন্নি ওদিককার দালান হইতে চীৎকার করিয়া শ্যামাকে প্রশ্ন করেন—মেমসায়েবটি কোথায় হাওয়া খেতে বেরুলেন লা শামি ?

—কি জানি ! দিঘিতে বুঝি—

—'কি জানি' কি লা ? জানিস না তুই ? ন্যাকা !—চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা, আর শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। কিন্তু এও বলি মা, ঘরের বউ ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে বাড়ির বার হওয়া কিজন্যে ? মালা গাঁথছেন—ফুল ভাসাচ্ছেন—কত রঙ্গই জানেন ! এই তো—আমার যোলো বছর বয়সে স্বোয়ামী গিয়েছিল —বলুক দিকিন্ কেউ, কোনদিন আদিখ্যেতা করতে দেখেছে ?

তাঁহাকে ষোলো বছর বয়সে দেখিবার সৌভাগ্য যাহাদের হইয়াছিল—তাহারা অবশ্য কেহই উপস্থিত নাই, তবু শ্যামা তোষামোদের ভঙ্গীতে সায় দেয়—

—তোমাদের সঙ্গে কার তুলনা দিদিমা—

দিদিমা বিরক্তিকুঞ্চিত মুখে বলিয়া ওঠেন—খোসামোদ করিসনে শামি, খোসামোদ শুনলে গা জ্বলে যায়।

নিঃশঙ্ক পথিককে এইরূপ আকস্মিক আক্রমণ করিয়া বসা তাঁহার স্বধর্ম।

শ্যামা অপ্রতিভ মুখে বসিয়া থাকে, চট্ করিয়া উঠিতে পারে না, এবং আলোচনাটা ভিন্ন খাতে বহাইতেই বোধ করি একটা নতুন সংবাদের অবতারণা করে।

—সকালবেলা আমাদের দিঘির ঘাটের ওদিক থেকে আসতে একটা মানুষ দেখলাম দিদিমা—কোট 'পেণ্টুল' পরা লম্বা জোয়ান লোকটা, গোরা-ই হবে নাকি কে জানে, বকুলগাছের ওদিকটায় ঘুর ঘুর করছিল,—দেখে কেমন ভয় ভয় করলো, পালিয়ে আসতে পথ পাই না—মনে হ'ল, নতুন এসেছে গাঁয়ে—

—তা' মনে হবে বই কি, তোমার তো আর গাঁ-সুদ্ধু চিনতে কাউকে বাকি নেই। বলি, পালিয়ে এলি—বললি না কিছু?

—আমি কি বলবো বাবা! কোট-পেণ্টুল দেখলে আমার ভয় করে।

—কচি খুকি! মেয়ে-ঘাটে পুরুষ আসে কোথা থেকে তার হিসেব নেই? আজ এসেছে কি রোজ আসে কে জানছে? ও-সব মালা-ভাসানোর লীলাখেলা কিনা তাই বা কে জানে? কালামুখী তলে তলে কী কীর্তি করছে তা' ভগবানই বলতে পারেন। সোয়ামী যার খুনের দায়ে দেশত্যাগী, তার পরিবারের এখনো সেমিজ কামিজ প'রে পটের ছবি হয়ে বেড়াতে লজ্জা করে না? ধন্যবাদ!

নতুন গিন্নির মর্যাদা রাখিতেও—হৈমন্তী সম্বন্ধে এতবড় কথাটায় স্পষ্ট অভিমত দিতে মুখে বাধে শ্যামার। বুড়ো হয়েছি, কোমর পড়ে গেছে, চারিদিকে চোখ রাখবার ক্ষ্যামতা নেই, নইলে দেখিয়ে দিতাম সবাইকে—বলিয়া নতুন গিন্নি হাঁফাইতে থাকেন।

ঘাটের পথ হইতে ফিরিয়া হৈমন্তী মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—কাগজ এখনো দিয়ে যায়নি শ্যামা ঠাকুরঝি?

—কই, না।

নতুন গিন্নি কাঠের উনানে ফুঁ পাড়িতে পাড়িতে ঘরের ভিতর হইতে বলেন—মেমসায়েবের রোজ খবরের কাগজ না পড়লে চলে না—ধন্যি বাবা, আমি হ'লে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরতাম—ছিঃ! ঘাটে পথে পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ করে বেড়াবার সাহস কি অমনি আসে? চব্বিশ ঘণ্টা কাগজ কেতাব নিয়ে থাকলেই বুকের পাটা বাড়ে।

হৈমন্তী বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া দুই দণ্ড শ্যামার মুখের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যায়।

হৈমন্তী কবে কাহার সঙ্গে আলাপ করিল? ঘৃণায় লজ্জায় পৃথিবীর বুক হইতে নিজেকে তো প্রায় লুপ্ত করিয়াই রাখিয়াছে। শুধু একখানি খবরের কাগজের সেতু দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে এতটুকু একটু যোগসূত্র কিসের আশায় যে রাখিয়াছে সে কি নিজেই জানে? বুভুক্ষুর মতো তন্ন তন্ন করিয়া সমস্তটুকু না পড়িলে তৃপ্তি হয় না কেন কে বলিবে?

অথচ, পড়িয়াই কি তৃপ্তি হয়?

কিন্তু নতুন গিন্নির মিথ্যা দোষারোপকে তো আর মিথ্যা বলা চলে না—সন্ধ্যার অন্ধকারে দোতালার বারান্দার এক কোণে হৈমন্তী অমন থর থর করিয়া কাঁপে কেন—শ্যামা-বর্ণিত সেই 'সাহেবের মতন' লোকটার সামনে দাঁড়াইয়া? অমন ভয়কাতর অস্থির ভাব কেন দু'জনের?

অমন আকুল আগ্রহে সে হৈমন্তীকে বুকের উপর জড়াইয়া ধরিল কোন্ হিসাবে ? কে সে ? সমুদ্রনারায়ণ ? সমুদ্র এখনো বাঁচিয়া আছে ?…

অনেকক্ষণ পরে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া হৈমন্তী কম্পিত কণ্ঠে কহিল—লুকিয়ে পালিয়ে যাবো ? লোকে কি বলবে ?

—লোকে যা খুশি বলুক না হৈম, ক্ষতি কি ? তোমাকে নিয়ে যাবো আমার সেই নতুন রাজত্বে, জঙ্গল কেটে সেখানে গড়ে উঠছে নতুন শহর, সেইখানে নতুন করে গড়বো আমাদের সংসার। সেখানে আমি সমুদ্র নয়, আমি মিস্টার মুখার্জি !

—নাম বদলেছ ?

—বদলাবো না ? বা রে ! পুলিশের ভয়ে নিজেকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে—তুমি যখন চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে থেকেছ, আমি তখন প্রচণ্ড রৌদ্রে ছুটোছুটি করেছি কুলিমজুরের কাজ নিয়ে।…

দীর্ঘকাল জাপানে আমেরিকায় কাটাইয়া অনেক ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া সমুদ্র অবশেষে কেমন করিয়া আজ একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ফরেস্ট অফিসার হইয়া বসিয়াছে, সঞ্চয় করিয়াছে প্রচুর অর্থ, তাহারই ইতিহাস শুনাইতে বসে হৈমন্তীকে…পাহাড়ের কোলে জঙ্গল ঘেঁষিয়া তাহার বাড়িখানি, আরামের বিলাসের সমস্ত উপকরণ আনিয়া বোঝাই করিয়াছে হৈমন্তীর জন্য, শুধু হৈমন্তীকে ঘিরিয়াই তাহার এতদিনের স্বপ্ন আর সাধনা।

—একবারও তো খোঁজ নিলে না,—যদি মরে যেতুম ?

—কক্ষনো না, আমি নিশ্চয় জানতাম, হৈম, আবার আমাদের দেখা হবে, আমার তপস্যা ব্যর্থ হবে না।

হৈমন্তীও সমুদ্রর মতন অমন সুন্দর করিয়া বলিতে চায় কিন্তু বলিতে পারে না, বুকের ভেতর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে পারে শুধু।

কান্না আর কথার মধ্য দিয়া রাত্রি গভীর হইতে থাকে…শেষরাত্রে

হৈমন্তীকে লইয়া পলাইয়া যাইবে সমুদ্র। রোমাঞ্চকর সেই কল্পনায় মুখর হইয়া ওঠে সে—পরের বৌ নিয়ে পালানোর তো নতুনত্ব নেই হৈম। তাই নিজের বৌ নিয়ে পালাবো আমি, বেশ চমৎকার মৌলিক হবে না ব্যাপারটা?—তুমি অমন কাঁদছো কেন বল তো? কত পাহাড়-জঙ্গল ডিঙিয়ে কত অগাধ সমুদ্র পার হয়ে ফিরে এলাম তোমার কাছে—সারা রাতটুকু কেঁদেই নষ্ট করবে?···আচ্ছা এদিকে কেউ এসে পড়বে না তো? এতদিন পরে আবার ধরা পড়তে রাজী নই কিন্তু।

—কেই বা আছে? নতুন ঠাকুমা সিঁড়ি উঠতে পারেন না। শ্যামা ঠাকুরঝির ভূতের ভয়, সন্ধ্যে হ'লে ঘরের বার হয় না।

—তা হ'লে আজকের রাতটুকু নির্ভয়ে আশ্রয় পেতে পারি তোমার ঘরে?

ঘরে খিল লাগাইয়া সাবধানে আলো জ্বালে হৈমন্তী।

—ঘরের চেহারাটা প্রায় একই রকম রেখেছ দেখছি! কি আশ্চর্য লাগছে হৈম,—সেই পালঙ্ক, সেই আয়না দেরাজ ছবি আলমারি, সেই জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছে তোমার মুখে, সেই তুমি প্রায় তেমনিই সুন্দর রয়ে গেছ, যেন কিছুই পরিবর্তন ঘটেনি তোমার জীবনে, যেন কিছুদিনের জন্যে শুধু বিদেশে ঘুরে এলাম—অথচ কত ঝড় বয়ে গেল আমার জীবনে···

টুকরো কথা···টুকরো হাসি···

—এ ছবি কার? গুরুদেব-টেব নয় তো? কি আশ্চর্য, এই হতভাগার ছবিতেও মালা ঝোলে! নিলাম এটা আমি, আজ আমার পাওনা। বিশ্রী এই খাকির পোশাকে ফুলের মালা স্যুট করে না, কি বল?···কাপড়?···ধুতি? ধুতি কি আমি শার্টের পকেটে নিয়ে বেড়াচ্ছি?···তুমি দেবে? আমার জামা-কাপড় তুলে রেখেছ এতকাল ধরে? হৈম···হৈম···

—তুমি কি কাউকেই দেখা দেবে না? নতুন ঠাকুমা, শ্যামা, ক্ষীরোদা—কাউকে বলব না?

—পাগল হয়েছ ? বললে চাপা থাকবে না, স্টেশনে ছলিয়া বেরিয়ে যাবে —রূপকথার রাজপুত্তুর পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চেপে এসে রাতারাতি দুঃখিনী রাজকন্যাকে নিয়ে উধাও !···দেখছো···খুব বুড়ো হয়ে যাইনি কিন্তু···হৈম, এত সুখ কি আমার জন্যে সত্যিই তোলা ছিল ?···

কথার শেষ নাই, রাত্রির শেষ আছে। পাণ্ডুর চাঁদের ফ্যাকাসে হলদে আলো ভোরের নতুন আলোর কাছে সহসা কোন্ ফাঁকে আত্মসমর্পণ করিয়া বসিবে কে জানে।

হয়তো একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল···তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া সমুদ্র হৈমন্তীকে ডাকিয়া তোলে—মিসেস মুখার্জি, উঠুন—তৈরী হয়ে নিন, চারটে চল্লিশের ট্রেন ধরতে হবে।···অবাক হয়ে তাকাচ্ছো কি ? মনে নেই আমি আর শ্রীল শ্রীযুক্ত সমুদ্রনারায়ণ মজুমদার নয়—মিস্টার এস্ মুখার্জি ? কাজেই তুমি মিসেস মুখার্জি।···তোমার ওই আধা-ধুতির মতো বিশ্রী শাড়িটা আমার ভারি খারাপ লাগছে কিন্তু, ভালো একটা কিছু প'রে নাও চট করে।

—ভালো আর কী আছে ? হৈমন্তী ম্লান হাসে।

আশু বৈধব্যের জন্য প্রস্তুত হইতে চওড়াপাড় শাড়ি অনেকদিন ছাড়িয়াছে সে।

—তবে থাক্, যা আছে থাক্, মনের সাধ মিটিয়ে সাজাবো এর পরে—শুধু দেরি করে ফেলো না লক্ষ্মী রাণী আমার, সকাল হয়ে গেলে······ভাবো অবস্থাটা !

হৈমন্তী শূন্য দৃষ্টি মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখে···এই তাহার চির-পরিচিত আবেষ্টন, তাহার ধ্যান, ধ্যানের দেবতা, শুচিসুন্দর নির্মল জীবনখানি এই মুহূর্তে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে! শুধু মালা গাঁথিয়া ফুল ভাসাইয়া বাকি জীবনটুকু কাটানো যায় না ? সহসা সমুদ্রের এই রূঢ় পোশাকপরা বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহখানা হৈমন্তীর নির্জন একক শয্যায় বেমানান অশুচি লাগে।

হৈমন্তীর জীবনে সমুদ্র কি অবাস্তর নয়? সত্যকার রক্তমাংসে গড়া সমুদ্র, পুরুষের দাবী লইয়া যে ডাক দিল?

ছবি লইয়াও তো দিন কাটিতেছিল মন্দ নয়। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তীকে লোকে বলিবে কী? শ্যামা আর ক্ষীরোদা যখন পাড়ায় পাড়ায় রটাইয়া আসিবে হৈমন্তীর নিরুদ্দেশের খবর?

—আমায় ক্ষমা করো!

কে বলিল? হৈমন্তী? সমুদ্রের পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া যে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে?

হতবুদ্ধি সমুদ্র শুধু প্রশ্ন করিতে পারে—যাবে না?

—আমায় ক্ষমা করো!

—কি আশ্চর্য, বলছো কি তুমি! সিদ্ধির দরজায় এসে আমার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে? হৈম, পাগলামি কোরো না।

—তবে তুমি পরিচয় দিয়ে দিনের আলোয় নিয়ে চলো।

—তার মানে, সাধ করে ফাঁসির দড়ি গলায় পরি? রাত্রের অন্ধকারে লুকিয়ে যাবার সাহস তোমার নেই? আমার সঙ্গেও না? তুমি কী বলছো বুঝতে পারছো না হৈম,—ফিরিয়ে দেবে আমাকে? মিথ্যা দুর্নামকে এত ভয়?

—আমায় ক্ষমা করো!

হাঁ, সমুদ্র ক্ষমা করিয়াছে বই কি। রাত্রির অন্ধকারে ভোজবাজির মতো মিলাইয়া গিয়াছে ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা মুছিয়া দিয়া।

কিন্তু হৈমন্তী এ করিল কী!

মাতালের মতো কতক্ষণ পড়িয়া ছিল কে জানে, হুঁশ হইল শ্যামার তীক্ষ্ণ

ব্যঙ্গের সুরে—বলি বৌদি কি আজকাল বুট প'রে বিড়ি সিগারেট খেয়ে বেড়াচ্ছ নাকি? সারা দালানে জুতোর ছাপ, দেশলাই কাঠি, পোড়া সিগারেট, বাকি আর কিছু রইল না—জরিপেড়ে ধুতিচাদরও কি রাত-বিরেতে পরো নাকি? হা গোবিন্দ, হা গোবিন্দ!···নতুন দিদিমা বোঝে ঠিক।

এবং খানিক পরে উদ্দাম হইয়া ওঠে নতুন গিন্নির কণ্ঠস্বর—খবরদার বলে দিচ্ছি শামি, ও যেন লক্ষ্মীর ঘরের ছায়া মাড়াতে না আসে, ঠাকুরদালানের পৈঁঠেয় পা ঠেকায় না। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দূর করে দিতে হয় অমন বৌকে, বুকে বসে দাড়ি ওপড়ানো? হরিনারায়ণ মজুমদারের ভিটেয় এখনো সন্ধ্যে পিদিপ পড়ছে—এত অনাচার ধর্মে সইবে না, ধর্মে সইবে না!

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অচিন্ত্যকুমার একবার এঁর গল্প সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে 'সবচেয়ে যা বিস্ময়কর তা হচ্ছে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী, তা যেমন বিস্তৃত, তেমনি অন্তঃপ্রেরিত।' গজেন্দ্রকুমারের রচনা সম্বন্ধে এ মন্তব্যটি অতি সার্থক। জীবন সম্বন্ধে এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা খুব কম লোকেরই আছে। দেখেছেন বিস্তর এবং আপনার রসে সে দেখাকে রসিয়ে নিতে পেরেছেন। মানুষের মনের যত বিচিত্র অনুভূতি এবং বাঁক কল্পনা করা যায় তার কোনটাই যেন এঁর চোখ এড়ায়নি। যারা খুব কাছে থাকে, তাদেরও ইনি অবহেলা করেননি। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলাদেশে ছোটগল্পের যে উচ্চ আসন দিয়ে গেছেন, সে আসনের মর্যাদা ইনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছেন। ১৯০৯ সালে এঁর জন্ম, ইনিও ভ্রমণ করেছেন বিস্তর, যদিচ শহরেই জীবনের অধিকাংশ দিন কেটেছে তবু বাংলাদেশের পল্লী সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে।

আত্মহত্যা

শকুন্তলা প্রদীপটি জ্বালিয়া লইয়া ঘরে ঘরে সন্ধ্যা দিয়া বেড়াইতেছিল, সহসা সন্ধ্যা আসিয়া সংবাদ দিল, দিদি, অমলদা আসছে!

মুহূর্তের জন্য শকুন্তলার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াই একেবারে ছাইএর মত বিবর্ণ হইয়া গেল। চৌকাঠের উপরই দাঁড়াইয়া পড়িয়া সে কহিল, সে কি রে?···ধ্যেৎ!

—হ্যাঁ গো দিদি, সত্যি। ঐ গলির মোড় পেরোচ্ছে দেখে এলুম, তুমি জানলা দিয়ে দেখো না, এতক্ষণে বোধহয় এসে পড়েছে—

কিন্তু জানলা দিয়া আর দেখিতে হইল না, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই একটি

অত্যন্ত সুপরিচিত কণ্ঠের ডাক শকুন্তলার কানে আসিয়া পৌঁছিল, আরে, এরা সব গেল কোথায়—ও সন্ধ্যা, বাড়ি ছেড়ে ভাগলি নাকি ?

শকুন্তলা অকস্মাৎ যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, একবার নিজের পরনের কাপড়টার দিকে আর একবার আসবাবগুলার দিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া আকুলকণ্ঠে কহিল, সন্ধ্যা, লক্ষ্মী দিদি আমার, ওকে একটু ছাদে বসা, হঠাৎ যেন ঘরে আনিস নি—যা ভাই !

এবং পরক্ষণেই প্রায় ছুটিয়া আর একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল।

সন্ধ্যা কিন্তু তখনই নীচে নামিতে পারিল না, দিদির এই আকস্মিক ভাবান্তরের কোনো কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া কতকটা মূঢ়ের মতই দাঁড়াইয়া রহিল। অমল তাহার বড়দিদির দেবর এবং এ বাড়ির সকলেরই প্রিয় অতিথি। বিশেষ করিয়া, সন্ধ্যা তাহার জ্ঞান হইবার পর হইতেই দেখিয়া আসিতেছে যে, এই প্রিয়দর্শন এবং প্রিয়ভাষী তরুণটিকে দেখিলে তাহার মেজদি একটু বেশিই খুশি হয়। তাহার জ্ঞান অবশ্য বেশিদিন হয়ও নাই—বছর দুই-তিন হইবে—কিন্তু তখন ছিল অমল কিশোর মাত্র, এখন সে যৌবনে পা দিয়াছে, যদিও তাহার মুখের মধ্য হইতে কৈশোরের কমনীয়তা এখনও বিদায় লয় নাই, দেখিলে কেমন একটা স্নেহের সঞ্চার হয় মনে মনে। সন্ধ্যাও 'অমলদা'কে ভালোবাসিত, সুতরাং সে অনেকদিন পরে তাহাকে দেখিতে পাইয়া খুশি-মনেই দিদিকে সংবাদটা দিতে আসিয়াছিল—হঠাৎ দিদির এই অদ্ভুত আচরণে অত্যন্ত দমিয়া গেল—কেমন যেন একটু অপ্রস্তুতভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। ততক্ষণে অমল উপরে উঠিয়া আসিয়াছে। আন্দাজে আন্দাজে ছাদটা পার হইয়া একেবারে দুয়ারের কাছে আসিয়া কহিল, একি রে, এখানে এমন চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? ভূত দেখেছিস নাকি ? মাউই-মা কৈ ? আর তোর মেজদি—?

সন্ধ্যা ঢোঁক গিলিয়া কহিল, মা গা ধুতে গেছেন আর মেজদি সন্ধ্যে

দিচ্ছে—আ—আপনি বসুন না অমলদা। চলুন, আমি মাদুর পেতে দিচ্ছি ছাদে—

—ইস, ভারি যে খাতির করতে শিখেছিস দেখছি! যা যা, আর মাদুর পাততে হবে না, আমি এখানেই বসছি।

সন্ধ্যা কোনো প্রকার বাধা দিবার পূর্বেই সে সেই প্রকাণ্ড ভাঙা তক্ত-পোষটায় অতিশয় মলিন শয্যার উপরেই বসিয়া পড়িল। কহিল, আমার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না, এখন তোমার মেজদিকে সংবাদ দাও, তিনি দয়া ক'রে আমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যান্। তাঁকে বলো যে, এ ঘরটাও তাঁর সন্ধ্যে দেওয়ার এলাকার মধ্যে পড়ে—

কিন্তু ইহার পূর্বের একটা ইতিহাস আছে; প্রায় সব গল্পেরই থাকে।

শকুন্তলার বাবা হরিপ্রসাদবাবুরা চার ভাই, তাহার মধ্যে হরিপ্রসাদ এবং তাঁহার মেজো ভাই জ্যোতিঃপ্রসাদ উপার্জন করিতেন, আর দু-ভাই দেশের বাড়িতেই বসিয়া খাইতেন। জমিজমা যাহা কিছু ছিল তাহাতে ভাতটা হইত, বাকি হরিপ্রসাদ জ্যোতিঃপ্রসাদের অনুগ্রহে চলিত। হরিপ্রসাদ কাজ করিতেন ভালোই, প্রায় শ'খানেক টাকা মাহিনা পাইতেন। কিন্তু মানুষটি খুব শৌখিন ছিলেন বলিয়া সঞ্চয় প্রায় কিছুই করিয়া যাইতে পারেন নাই। কলিকাতায় বাসাভাড়া দিয়া, এখানে মাসিক দশ টাকা হিসাবে পাঠাইয়া, ভালো মাছ এবং ল্যাংড়া আম খাইয়া, ছেলেমেয়েদের ভালো জামা-কাপড় পরাইয়া ও স্কুলের খরচ জোগাইয়া বরং প্রতি মাসে তাঁহার কিছু ঋণই হইত। বলা বাহুল্য যে, জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে যে ঋণ তিনি করিয়াছিলেন তাহার কিছুই তিনি শোধ দিতে পারেন নাই। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা ছিল. হয়ত বা সেই উন্নতির পথ চাহিয়াই নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া ছিলেন, ইহারই মধ্যে যে জীবনের অধ্যায়ে

পূর্ণচ্ছেদ পড়িতে পারে তাহা তিনি ভাবেন নাই।

কিন্তু কার্যত তাহাই ঘটিল। হঠাৎ তিনদিনের জ্বরে যখন তিনি মারা গেলেন তখন শ্মশান-খরচার জন্যই অলঙ্কার বাঁধা দিতে হইল। অফিসে যে ঋণ ছিল তাহাতেই প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা শেষ হইয়া গেল। গৃহিণীর সামান্য অলঙ্কার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহেই গিয়াছিল, কন্যাদের কাহারও ও-বস্তু ছিলই না—সুতরাং ঘটি-বাটি বেচিয়াই, বলিতে গেলে, স্বামীর শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া ভদ্রমহিলা দুই কন্যা ও এক শিশুপুত্রের হাত ধরিয়া দেশের বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন।

হরিপ্রসাদের ভাইএরা অকৃতজ্ঞ নন, তাঁহারা যথাসাধ্য যত্নের সহিতই ইঁহাদের গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সাধ্য আর কতটুকু? জ্যোতিঃ-প্রসাদ ভাইদের যা সাহায্য করিতেন তাহার উপর আর পাঁচটি টাকা বাড়াইয়া দিলেন, তাহার বেশি আর তাঁহার সাধ্য ছিল না। কিন্তু তাহাতে চারিটি প্রাণীর ভরণপোষণ চলে না। শকুন্তলা সেকেণ্ড ক্লাশে পড়িতেছিল, তাহার আর সন্ধ্যার পড়াশুনা ত বন্ধ হইলই, তাহাদের ছোটভাই অভয়েরও লেখা-পড়া শিখিবার কোনো সম্ভাবনা রহিল না। শুধু উদরান্নের জন্যই শকুন্তলা ও তাহার মায়ের অনেকগুলি ভালো ভালো শাড়ি আবার দোকানে চলিয়া গেল। শকুন্তলার ভগ্নীপতির অবস্থাও এমনকিছু সচ্ছল নয়, আর সেখানে হাত পাতাও তাঁহাদের আত্মসম্মানে বাধে।

এ আজ প্রায় মাস দুয়েকের কথা। ইহার মধ্যে জামাতা বিমল বার দুই ইহাদের খবর লইতে আসিলেও অমল আসিতে পারে নাই। তাহার পরীক্ষা ছিল সামনে, সেইজন্যে সে কলিকাতাতেই থাকিত, দেশে আসিবার তাহার প্রয়োজন ছিল না। কলিকাতায় থাকিতে সে প্রায় নিয়মিতভাবেই ইহাদের বাড়িতে আসিত, শকুন্তলার সহিত তাহার একটা বেশ সখ্যের সম্বন্ধই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। শকুন্তলার পড়াশুনার আগ্রহ ছিল খুব বেশি, অমলের

দ্বারা সেদিকে অনেকটা সাহায্য হইত, অমলেরও এই প্রিয়ভাষিণী বুদ্ধিমতী মেয়েটির সাহচর্য ভালোই লাগিত—যদিচ রূপগৌরব শকুন্তলার বিশেষ ছিল না।

এ-হেন অমলকে আজ এতদিন পরে আসিতে দেখিয়া শকুন্তলা বিব্রত হইয়া পড়িল তাহার কারণও ঐ দারিদ্র্য। অমল ছেলেটি শৌখিন, যেমন আর পাঁচজন কলেজের ছেলে হইয়া থাকে—সিল্কেরপাঞ্জাবী-স্নো-পাউডার-হাত-ঘড়ির একটা পুতুল! বিশেষ করিয়া ইদানীং যখন সে শকুন্তলাদের বাড়িতে আসিত তখন তাহার প্রসাধনের পারিপাট্য আর-একটু বৃদ্ধি পাইত। সেই অমলকে এই অপরিসীম দারিদ্র্যের মধ্যে কল্পনা করিয়া শকুন্তলা লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। শুধু কি তাই, তাহার নিজের পরনে যে কাপড়টা আছে সেটাও বোধহয় পনেরো দিন সাবানের মুখ দেখে নাই—পয়সার অভাবে সোডা-সাজিমাটিও আনানো যায় নাই।

সে এপাশের ঘরে আসিয়া ব্যাকুলভাবে আলনার দিকে চাহিল। না, ভদ্র কাপড় একখানাও নাই। হয়ত এখনও বাক্সটা খুঁজিলে একখানা ফরসা কাপড় বাহির হইতে পারে কিন্তু তাহার চাবিও মায়ের কাছে, তাছাড়া মাকে কৈফিয়ৎই বা কী দিবে? মা যদি হঠাৎ বলিয়া বসেন যে, 'অমল ঘরের ছেলে, ওকে দেখে ফরসা কাপড় পরবার কি দরকার হ'ল?' তখন কী বলিবে সে?...

অকস্মাৎ শকুন্তলার আপাদমস্তক ঘামিয়া উঠিল। এপাশে একটা ঈষৎ জীর্ণ নীলাম্বরী শাড়ি আলনার উপর কোঁচানো আছে বটে কিন্তু সেটাও কয়দিন ব্যবহারের পর তুলিয়া রাখার ফলে তেলে-ময়লায় দুর্গন্ধ ছাড়িয়াছে—অথচ যেটা সে পরিয়া আছে সেটা এতই ময়লা যে, কোনমতে ঘরের লোকের কাছেও পরিয়া থাকা যায় না। নীলাম্বরীতে দুর্গন্ধ হইলেও ময়লা বোঝা যায় না, এই একটা সুবিধা—

পাশের ঘর হইতে আবার অমলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ব্যাপার কি? তোমার মেজদি আর নরলোকের মুখদর্শন করবেন না নাকি? হলা সহি সউন্তলে, দীনজনকে দয়া করো—এ ঘরেও একটা আলো দাও!

শকুন্তলার কানের কাছটা অকারণেই গরম হইয়া উঠিল। শকুন্তলা নামটা লইয়া অমল যতদিন যতবারই ঠাট্টা করিয়াছে, ততবারই শকুন্তলা এম্‌নি একটা উষ্ণতা অনুভব করিয়াছে—এবং কে জানে কেন, ততবারই তাহার মনে হইয়াছে যে, অমল নিজেকে দুষ্মন্ত বলিয়া পরিহাসটা সম্পূর্ণ করিতে চায় কিন্তু পারে না, লজ্জায় বাধে—

সে প্রায় মরীয়া হইয়াই নীলাম্বরীটা টানিয়া লইল। কিন্তু না, এ বড়ই দুর্গন্ধ, বহু দূর হইতেও পাওয়া যাইবে!…অগত্যা সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আরক্তমুখে লণ্ঠনটা লইযা সেই অবস্থাতেই এ ঘরে পা দিল।

—আরে আসুন আসুন, দেবী শকুন্তলে! তবু ভালো যে, এতক্ষণে অভাজনদের মনে পড়ল—

কিন্তু এই চাপল্য এবং অমলের পারিপাট্যযুক্ত প্রসাধন এই আবহাওয়ার মধ্যে এতই বেমানান ঠেকিল, অন্তত শকুন্তলার কাছে, যে সমস্ত ব্যাপারটা যেন চাবুকের মতো তাহাকে আঘাত করিল। জরাজীর্ণ প্রকাণ্ড ঘর, বোধ হয় ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তাহাতে চূণের কাজ পর্যন্ত হয় নাই—জানলা দরজার অর্ধেক নাই—আর তাহার মধ্যে পায়াভাঙা বিরাট এক তক্তাপোষ কোনমতে সাজানো ইঁটের উপর দেহ রক্ষা করিয়া ঘরের অর্ধেকটা জুড়িয়া আছে। তাহার উপর কয়েকটি কাঁথা ও তোষকের অতিশয় মলিন একটা শয্যা এবং তাহারও উপরে অসংখ্য ছারপোকার দাগে কলঙ্কিত একটা শতচ্ছিন্ন মশারি খানিকটা ঝুলিয়া আছে। ঘরের মেঝে খানিকটা সিমেণ্ট ও খানিকটা খোয়াতে বিচিত্রিত। এ পাশে একটা ভাঙা র‍্যাকে শকুন্তলার পিতামহের আমলের খানকতক পুঁথি ও বই কীটদষ্ট ও ধূলিমলিন অবস্থায় স্তূপাকার করা, ওধারে

বিভিন্ন তাকে কতকগুলো ডেয়ো-ঢাকনা, ভাঙা ফুটা জিনিসের বিচিত্র সমাবেশ। সমস্তটা জড়াইয়া এমনই শ্রীহীন এবং লজ্জাকর যে, নিমেষমাত্র সেদিকে চাহিয়া লজ্জায় অপমানে শকুন্তলার মুখটা প্রথমে আরক্ত পরে বিবর্ণ হইয়া গেল। সে কিছুতেই মুখ তুলিয়া অমলের দিকে চাহিতে পারিল না। ঘরে ঢুকিবার সময়েই একবার শুধু সিল্কের পাঞ্জাবী, সোনার বোতাম এবং রুপালী ঘড়ির একটা মিলিত দীপ্তি বিদ্যুৎঝলকের মতো চোখের সম্মুখ দিয়া খেলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু মানুষটার দিকে সে চাহিতে পারে নাই। সে লণ্ঠনটা ঘরের মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়া কোনমতে ঢোঁক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, অমলদা, ভালো আছেন ? বসুন, মাকে ডেকে দিচ্ছি—

তাহার পরক্ষণেই, অমল কোনো কথা বলিবার পূর্বেই, সে দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অমল অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এই মেয়েটি বিশেষ করিয়া তাহার আগমনে খুশি হয়, খুশি কেন উজ্জ্বল হইয়া ওঠে, ইহাই সে জানিত, কিন্তু আজ এ কী হইল ? সে যতটা সম্ভব পুরাতন দিনের কথা ভাবিয়া দেখিল, কৈ শকুন্তলার রাগ করিবার মতো কোনো ঘটনা ঘটে নাই। …সে তাহার দাদার মুখে ইহাদেব অবস্থার কথা সবই শুনিয়াছিল, সুতরাং দারিদ্র্যের এই শোচনীয় রূপ তাহাকে আঘাত করিলেও বিস্মিত করিতে পারে নাই, কাজেই এইটাই যে শকুন্তলার ভাবান্তরের কারণ হইতে পারে, তাহা তাহার একবারও মনে হইল না।

শকুন্তলা নীচে নামিয়া আসিয়া কুয়াতলাতে গিয়াই মাকে সংবাদ দিল, মা, অমলদা এসেছেন।

—কে এসেছেন ? অমল ? ও—আমাদের অমল ! এগজামিন দিয়ে দেশে এসেছে বুঝি !…বসাগে যা তুই, আমার হয়ে গেছে আমি যাচ্ছি—। কতদিন দেখিনি ছেলেটাকে !

শকুন্তলা তবুও দাঁড়াইয়া রহিল। মায়ের আর একটা দরকারী কথা মনে

পড়িল, কহিলেন, ঘরে ত বিশেষ কিছু নেই। ছাখ্ দিকি, কৌটোটায় সুজি পড়ে আছে কি না, তাহ'লে উনুনটা ধরিয়ে একটু সুজি ক'রে দে, আর এক পেয়ালা চা—। ভাগ্যিস খোকার দুধটা সাবুর সঙ্গে মিশিয়ে ফেলিনি—

অকস্মাৎ শকুন্তলার কণ্ঠস্বর তীব্র হইয়া উঠিল, তুমি কি পাগল হ'লে মা ? ঐ ঘি-হীন সুজি, আর ঐ জঘন্য চা—ও আর খাওয়াবার চেষ্টা ক'রো না ! ওসব হাঙ্গামা ক'রে কাজ নেই।

মা অবাক হইয়া কিছুক্ষণ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, পাগল আমি হয়েছি, না তুই হয়েছিস ? অমল আমার পেটের ছেলের মতো, ওর কাছে আবার লজ্জা কি ? আর ও না জানেই বা কি ?···ওর কাছে আমার ঢাকবার ত দরকার নেই কিছু।···মেয়ের যত বয়স বাড়ছে তত যেন ন্যাকা হচ্ছেন। যাও, যা বলছি তাই করো গে—

মায়ের মেজাজ শকুন্তলা জানিত, প্রতিবাদ তিনি একদম সহিতে পারেন না। অগত্যা রান্নাঘরে গিয়া উনানে আঁচ দিবার চেষ্টা করিতে হইল ; কিন্তু তাহার যেন ইচ্ছা হইতেছিল ছুটিয়া কোথাও চলিয়া যায় কিংবা কুয়াতে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহার মন, তাহার দেহ সব যেন কেমন স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। আর কিছুরই বোধ ছিল না, শুধু অনুভূতি ছিল একটা দুর্নিবার লজ্জার—

সে উনানে আগুন দিয়া বাহিরে আসিল না, ধোঁয়ার মধ্যেই বসিয়া রহিল। অমল বি-এ পড়িতেছে, খুব সম্ভব পাশও করিবে, সে সুশ্রী, সচ্চরিত্র —সুতরাং তাহার বাবা যে বিবাহে রীতিমত অর্থ দাবী করিবেন তাহা সুনিশ্চিত। শকুন্তলার সহিত তাহার বিবাহের যে কোনো সম্ভাবনা নাই তাহা শকুন্তলা নিজেই জানিত : শুধু রূপা নয়, অমলের বাবা ছোট ছেলের বিবাহে

রূপও চান। সেকথা সে কখনও বোধহয় ভাবে নাই, আশা করা ত দূরের কথা। তবু, তবু আজ কে জানে কেন, তাহার মনে হইতে লাগিল যে তাহার বুকের অনেকখানি যেন কে দলিয়া পিষিয়া নির্মমভাবে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তীব্র একটা আশাভঙ্গের বেদনাতে তাহার চিত্ত যেন মূর্ছাহত!

তবে কি, তবে কি মনের অজ্ঞাতসারে, মনেরই কোন্ সঙ্গোপনে সে আশার স্বপ্ন দেখিয়াছিল? কলিকাতায় যখন অমল নিয়মিত তাহাদের বাড়ি আসিত, সেই পাঠচর্চার সঙ্গে সঙ্গে চালাইত সাহিত্যচর্চা। প্রকাশ্যে, সকলকার সামনেই চলিত তাহাদের গল্প, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কৈ, কখনও ত প্রণয়ের আভাষমাত্র তাহাদের কথাবার্তায় প্রকাশ পায় নাই। দুই-একবার সে অমলের সঙ্গে বেড়াইতে গিয়াছে, একবার বোটানিক্যাল গার্ডেনে, আর একবার দক্ষিণেশ্বরে—কিন্তু তখনও ত কেহ রঙীন হইয়া উঠিবার চেষ্টা করে নাই। অমল তাহাকে বলিত 'বন্ধু'—সেই বন্ধুত্বতেই তাহারা সুখী ছিল। তবে? সেদিন কোথাও, কোনো কল্পনাতে কি তাহার রঙ ধরে নাই?…

অকস্মাৎ তাহার কর্ণকপোল উত্তপ্ত করিয়া বাবার অসুখের পূর্বে শেষ নিভৃত দিনটির কথা তাহার মনে পড়িল। অনেক রাত্রে অমল বাড়ি ফিরিতেছিল, সে এক হাতে পান আর এক হাতে আলো লইয়া সদর দরজা পর্যন্ত তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। বিদায়ের আগে পান দিতে গেলে অমল হাত পাতিয়া লয় নাই, নিজের মুখের কাছে তাহার পান-সুদ্ধ হাতটা তুলিয়া ধরিয়াছিল; অগত্যা শকুন্তলা পানটা তাহার মুখে পুরিয়া দিতে যায়, আর সেই সময় দিয়াছিল অমল তাহার আঙুলে ছোট্ট একটি কামড়। সামান্য ঘটনা, ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়—ছেলেমানুষি অমল অহরহই করিত—তবু শকুন্তলা সেদিন ঘামিয়া উঠিয়াছিল, বহুরাত্রি পর্যন্ত ঘুমাইতে পারে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে আরও একটা কথা তাহার মনে পড়িল; ঐ শেষের

দিকেই—আকস্মিক বজ্রপাতে তাহার সুখের বাসা পুড়িয়া যাইবার ঠিক আগেই, রসিকতার ছলে অমল দিয়াছিল তাহার বাহুমূলে সজোরে এক চিমটি। তখন সে আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল বটে, মায়ের কাছে নালিশ করিতেও ছাড়ে নাই—কিন্তু তবু, তাহার বেশ মনে আছে, সেই বেদনাটা তাহার যেন ভালোই লাগিয়াছিল এবং সেই কালশিরার দাগটা মিলাইয়া যাইতে সে যেন একটু ক্ষুণ্ণই হইয়াছিল—

সহসা তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইল অমলেরই কণ্ঠস্বরে, কিন্তু এর আজ হ'ল কি?

পরক্ষণেই রান্নাঘরের দোরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—ও মা গো, এই একঘর ধোঁয়ার মধ্যে চুপটি ক'রে বসে আছ! পাগল নাকি?

এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া একটা হাত ধরিয়া তাহাকে হিড় হিড় করিয়া টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিল। শকুন্তলা ইহার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, সে এই আকর্ষণের বেগ সামলাইতে না পারিয়া একেবারে গিয়া পড়িল অমলের ঘাড়ে। মুহূর্ত মাত্র, তাহার পরই সে নিজেকে সংবরণ করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তাহার দেহ-মনের এই আঘাতের আকস্মিকতা তাহাকে ক্রুদ্ধ করিয়া তুলিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কঠিন স্বরে বলিল, আমরা গরিব ব'লে কি আমাদের মান-ইজ্জৎও থাকতে নেই মনে করেন?

এ কী হইল? অমল নিজেই ব্যাপারটার জন্য অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল সত্যকথা, কিন্তু এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না। বিশেষত এমন ঘটনা আগেও বহু ঘটিয়াছে, শকুন্তলা রূঢ় কখনই হয় নাই। মৃদু অনুযোগ করিয়াছে, হয়ত বা একটা চড় চাপড়ও দিয়াছে, অধিকাংশ সময়েই উহাকে ছেলেমানুষি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছে। কিন্তু—

অমল আহতকণ্ঠে কহিল, ছি!…তোমার আজ হয়েছে কি বলো ত! এমন করছ কেন?

বহুক্ষণের অপমান লজ্জা ও বেদনায় তাহার কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া আসিতেছিল। তবু সে প্রাণপণে নিজেকে সংযত করিয়া কহিল, কিছু হয়নি আমার, আপনি যান, ঘরে গিয়ে বসুন গে। আমি যাচ্ছি—

সে আবার রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল। উনান তখন প্রায় ধরিয়া আসিয়াছে, জোর করিয়া সে কাজে মন দিল—

একটু পরেই মা আসিয়া বলিলেন, ওরে সন্ধ্যা, তোর অমলদাদাকে এই ছাদেই একটা মাদুর দে না, এখানে বসুক—ঘরে যা গরম!…চা হ'ল শকুন্তলা?

অমল মৃদুকণ্ঠে জানাইল, চা থাক্ না মাউই-মা, আবার ওসব হাঙ্গামা কেন?

মায়ের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল, হাঙ্গামার আর সামর্থ্য কোথায় বাবা, এখন শুধু একটু চা দেওয়া, তাই কষ্টকর! কিন্তু তাও যদি তোমাদের সামনে একটু না দিতে পারি ত বাঁচব কি ক'রে?

অমল আর কথা কহিল না। মা রান্নাঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, আর কত দেরি রে?

শকুন্তলা ক্লান্তকণ্ঠে কহিল, তুমি একটু ক'রে দাও না মা, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে—

মা উদ্বিগ্নভাবে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, কি হ'ল আবার তোমার? পারিনে বাবা ভাবতে—

শকুন্তলা কথার জবাব না দিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া বিনা বাক্যে অমলকে পাশ কাটাইয়া নীচে নামিয়া গেল। মা হালুয়া ও চা প্রস্তুত করিতে করিতে অনেক কথাই বলিয়া যাইতে লাগিলেন, অমল কিন্তু একেবারে স্তব্ধ

হইয়া বসিয়া রহিল। সে কি ইহারই জন্য দীর্ঘ ছয়মাস দিন গনিয়াছে! শকুন্তলা যে তাহার মনের কতখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল তাহা এই দীর্ঘদিন বিচ্ছেদের আগে বুঝিতে পারে নাই। তাহারা দেশে চলিয়া আসিবার পর কলিকাতার আকাশ-বাতাস যখন বিবর্ণ-বিস্বাদ ঠেকিল তখনই প্রথম বুঝিতে পারিল। কিন্তু তখন আর দেশে ফিরিবার কোনো অজুহাতই ছিল না বলিয়া কোনমতে তাহাকে এই দিনগুলি কাটাইতে হইয়াছে। সবার গোপনে নির্জনে বসিয়া সে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখিয়াছে আবার কবে প্রথম এই মধুরভাষিণী মেয়েটির দেখা পাইবে! অথচ—

সে অনেক ভাবিয়াও নিজের কোনো অপরাধ খুঁজিয়া পাইল না। মনে পড়ে কলিকাতা ছাড়িয়া আসিবার দিনটিতে সে স্টেশন পর্যন্ত উহাদের সঙ্গে আসিয়াছিল। গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াও শকুন্তলা কত গল্প করিয়াছে, মায় সাহিত্যচর্চা পর্যন্ত বাদ যায় নাই। শরৎবাবুর কী একখানা উপন্যাস দেশে ফিরিবার সময় অমলকে সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিয়াছিল—অমল সেকথা ভোলে নাই, বই কিনিয়াই আনিয়াছে। বিদায়ের পূর্বে অমলই যেন একটু মুষড়াইয়া পড়িয়াছিল, শকুন্তলা তাহা লক্ষ্য করিয়া নানা হাস্য-পরিহাসে শেষ-মুহূর্তগুলিকে উজ্জ্বল ও সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। কোথাও ত কোনো অসঙ্গতি, কোনো ছন্দ-পতন হয় নাই! তবে?

শকুন্তলার কাকীমা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন; তিনি ফিরিয়া আসিয়া অমলের পাশে বসিলেন, তাঁহার ছেলেমেয়েরাও ঘিরিয়া ধরিল। এই ছেলেটি এ বাড়ির সকলেরই প্রিয়—অনেকদিন পরে তাহাকে পাইয়া তাঁহারা কলরব করিয়া উঠিলেন। কিন্তু অমলের তখন এ সব অসহ্য বোধ হইতেছে, সে যেন পালাইতে পারিলে বাঁচে! কোথাও নির্জনে বসিয়া তাহার একটু নিশ্বাস ফেলা দরকার—

চা ও খাবার শীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিল, তাহার তখন খাইবার মতো অবস্থা নয়, তবু পাছে সন্ধ্যার মা ক্ষুণ্ণ হন, তাই কোনমতে খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল।

—এরই মধ্যে চললে বাবা ?

—হ্যাঁ মাউই-মা, আবার কাল আসব। আজই এসেছি, গরমে ট্রেনে বড় কষ্ট হয়েছে। সকাল ক'রে শুয়ে পড়ব।

কিন্তু তবুও অমল তখনই যাইতে পারিল না, একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, শকুন্তলাকে ত দেখতে পাচ্ছি না, তার জন্যে এই বইটা এনেছিলুম—

কি জানি বাবা, তার আজ কী হ'ল !···ওরে সন্ধ্যা, এই বইটা তুলে রাখ্ ত—মেজদির বই।—আর বই ! এখানে এসে ও পাট ত নেই-ই একেবারে। এখন কি ক'রে যে জাতধর্ম বাঁচবে তাই শুধু ভাবছি বাবা, একটা দোজ-বরে তেজ-বরে পেলেও বেঁচে যাই—

কথাটা সজোরে অমলকে আঘাত করিল। এ ব্যাপারটা সে ভাবেই নাই। সত্যই ত, শকুন্তলার বিবাহের বয়স ত অনেকদিনই আসিয়াছে—

সে 'তাহ'লে আসি' বলিয়া নীচের দিকে পা বাড়াইল। আশা ছিল বিদায়ের পূর্বে অন্তত শকুন্তলার দেখা মিলিবে, কিন্তু কোথাও তাহার কোনো সম্ভাবনা রহিল না।

ওরে তোর অমলদাকে আলোটা দেখালি না ?—মা কহিলেন।

না, আলোর কোনো দরকার নেই, আলো রয়েছে—

অমল তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিল। নীচের তলাটা যেমন অন্ধকার তেমনি ভাঙা ও স্যাঁৎসেতে। এখানে প্রায় কেহই থাকে না, শুধু কাঠ-কুটা আবর্জনা রাখা হয়। সেখানে সে কাহাকেও দেখিবার আশা করে

নাই, কিন্তু একেবারে সদরের কাছে গলিপথটায় গিয়া দেখিল একটি কেরো-সিনের ডিবা পাশে রাখিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে শকুন্তলা, দৃষ্টি তাহার কম্পমান দীপশিখার উপর নিবদ্ধ।

অমল কাছে যাইতেই সে চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। অমল আরও কাছে আসিয়া তাহার স্বেদসিক্ত হাত দুইটি জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে ধরিয়া কহিল, কী হয়েছে কিছুতেই বলবে না কুন্তলা? কেন তুমি এমন বিরূপ হয়ে রইলে আমার ওপরে?

কুন্তলা! অমলের আদরের ডাক। অকস্মাৎ একটা প্রবল কান্না যেন শকুন্তলার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। ক্ষীণ আলোক, তবু তাহাতেই অমলের চক্ষু দুইটি বড় করুণ, বড় অসহায় ঠেকিল। শকুন্তলার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু সেই করুণ দৃষ্টির পিছনে যে সিল্কের পাঞ্জাবী ও সোনার বোতাম ঝল্‌মল্ করিতেছিল সেটাও চোখে পড়িতেই সে আবার নিজেকে কঠিন করিয়া লইল। ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়াইয়া লইয়া শান্ত উদাসকণ্ঠে কহিল, কিছুই হয়নি অমলদা। আমরা বড় গরিব, দিনরাত অভাবের সংসারে খাটতে হয়, তাই হয়ত সব সময়ে হাসিমুখ রাখতে পারি না। তাতে যদি ত্রুটি হয়ে থাকে ত মাপ করবেন।

অমলের ওষ্ঠ দুইটি কিছুক্ষণ নীরবে কাঁপিবার পর স্বর বাহির হইল—বিনা অপরাধে কেন যে বারবার এমন আঘাত করছ শকুন্তলা, বুঝতে পারছি না। থাক্—তুমি শান্ত হও, তারপর একদিন আমার দুষ্কৃতির কথা শুনব—

কিন্তু তবু সে চলিয়া যাইতে পারিল না। শুধু শকুন্তলা অহেতুক একটা ক্রোধে যেন জ্ঞান হারাইল, কঠিনকণ্ঠে কহিল, আর, আপনি যখন-তখন আমার গায়ে অমন ক'রে হাত দেবেন না। আমরা বড় গরিব, মায়ের এক পয়সা পণ দেবার সামর্থ্য নেই তা ত জানেনই। কেউ যদি ভিক্ষে দেবার মত ক'রে গ্রহণ করে তবেই তিনি কন্যাদায়ে মুক্ত হবেন। তার ওপর যদি কোনো

বদনাম ওঠে, তাহ'লে ভিক্ষাও কেউ দিতে চাইবে না, এটা আপনার বোঝা উচিত।

সেই শকুন্তলা! সংসারের কোনো ক্লেদ যাহাকে কোনদিন স্পর্শ করে নাই! অমল আর দাঁড়াইতে পারিল না। শুধু কপাটটা খুলিবার পূর্বে একবার স্খলিতকণ্ঠে সে কহিল—কিন্তু আমার দ্বারা যে কোনো সাহায্যের সম্ভাবনা নেই তাই বা কি ক'রে জানলে কুন্তলা? শুধু অনিষ্টই করতে পারি, উপকার কিছু করতে পারি না?

না, না, না—চাপা গলায় শকুন্তলা যেন আর্তনাদ করিয়া উঠিল—আপনি যান্—বাড়ি যান্। আমার কোনো উপকার করা আপনার দ্বারা সম্ভব নয়। আপনি যান্।

অমল বাহির হইয়া গেল। তাহার পদশব্দ কপাটের ওপারে মিলাইয়া যাইতে হঠাৎ যেন শকুন্তলার তন্দ্রা ভাঙিল। সে চমকিত ব্যাকুল ভাবে একবার বাহিরের দিকে চাহিল—সেখানে শুধুই অন্ধকার।...অমল সত্যই চলিয়া গিয়াছে।...

কপাটটা বন্ধ করিয়া দিয়া শকুন্তলা অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর মাটির উপর লুটাইয়া পড়িয়া, অমল শেষ যেখানে দাঁড়াইয়া তাহার সহিত কথা কহিয়াছিল, সেইখানে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মনে হইল আজ সারারাতের মধ্যে এ কান্না যেন থামিবে না।

উপরে তখন শকুন্তলার মায়ের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল।

সুমথনাথ ঘোষ

ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের বিচিত্র জটিলতা সুমথনাথ ঘোষকে প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করে, তাই বিচিত্র মানুষের আরও বিচিত্র মানসিক দ্বন্দ্বের ইতিহাসকেই তিনি তাঁর ছোটগল্পের প্রধান উপজীব্য করেছেন। গল্পগুলি এঁর মোটেই ঘটনাপ্রধান নয়—মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতে সমৃদ্ধ। যে সব ছোটখাট ঘটনা আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন বা সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হয় তার পিছনে ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের যে মর্মান্তিক ইতিহাস লুকানো থাকে—তারই বেদনা এঁকে সাহিত্যরচনায় উদ্‌বুদ্ধ করেছে। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে 'বাঁকাস্রোত' এবং 'সর্বংসহা' সমধিক বিখ্যাত। ১৯১০ সালে এঁর জন্ম। ইনি নানা ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সম্প্রতি এক গ্রন্থ-প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম স্বত্বাধিকারী।

অভিমান

ছাত্রাবস্থায় হরিবিলাসবাবু তাঁহার একমাত্র পুত্র অমলের বিবাহ দিলেন। সবাই নিষেধ করিল কিন্তু তিনি কাহারো কথা শুনিলেন না।

আত্মীয়-স্বজনরা তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন। অমলের বর্তমান, অমলের ভবিষ্যৎ, নারীসংসর্গে লেখাপড়ার অবনতি, মূর্খ অপোগণ্ড পুত্রের শোচনীয় পরিণাম, স্বাস্থ্যহীনতাবশত ক্ষয়রোগ ও অনতিবিলম্বে মৃত্যুর আশঙ্কা প্রভৃতি যত রকমের কুৎসিত ও ভয়াবহ কুফল অপরিণত বয়সে বিবাহ দিলে ঘটিতে পারে তাহার সবগুলি তাঁহারা ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ঋষির মত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। বস্তুত হরিবিলাসবাবুও জানিতেন যে অমলের এখনো বিবাহের বয়স হয় নাই, হাইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে সে পড়ে, ষোলো পূর্ণ হইয়া সবে সতেরো বছরে পড়িয়াছে, তাহার উপর রোগা একহারা

চেহারা, স্বাস্থ্যও বিশেষ ভাল নয়—তবুও যে তিনি কেন সকলের কথা অগ্রাহ্য করিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়া বসিলেন সেকথা জানিতে হইলে, সকল সামাজিক বিধি-নিষেধেরও উপরে মানুষের যে চিররহস্যাবৃত মন তাহার কিছু খবর রাখিতে হয়।

অবশ্য রহস্য চিরকাল রহস্যই রহিয়া যায় এবং গোপনতা গোপনই থাকিয়া যায়, যদি উহা কাহারো কাছে প্রকাশ করা না যায়। কারণ অন্তরঙ্গ বলিতে যাহা বুঝায় হরিবিলাসবাবুর সেরকম একজনও ছিল না। সকলের সঙ্গে যেমন তিনি মিশিতেন, আবার সকলের নিকট হইতে তেমনি দূরেও থাকিতেন। সমাজের মধ্যে থাকিয়াও যেন তিনি ছিলেন অসামাজিক, বহুর মধ্যে যেন একাকী। এবং এক্ষত্রে হয়ত তাহাই হইত যদি না সেদিন বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক-বিতরণ দেখিতে গিয়া একটি ছোট মেয়ের গান শুনিয়া তাঁহার চোখে জল দেখা দিত এবং তাহাকে একটি স্বর্ণপদক তিনি উপহার দিয়া বসিতেন।

সেই মেয়েটির চাহনি, সেই মেয়েটির কণ্ঠস্বর, সেই মেয়েটির চালচলন সারাক্ষণ তাঁহার সমস্ত চৈতন্যকে এরূপ অভিভূত করিয়া রাখিল যে, তিনি সভাভঙ্গ হইবার পর কাহারো সহিত কোনো বাক্যালাপ না করিয়া একেবারে সোজা নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন এবং বহুদিনের বিবর্ণ একখানি খাম নিজের 'ক্যাসবাক্স'র তলা হইতে বাহির করিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন।

হরিবিলাসবাবুর হাত কাঁপিতে লাগিল, চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। সতেরো বৎসর পরে এই প্রথম তিনি স্ত্রীর ফটো বাহির করিলেন। এখানি তাঁহাদের বিবাহের ফটো—তাঁহারি কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন তাঁহার স্ত্রী, নববধূবেশে।

ছয় মাসের শিশুপুত্র অমলকে রাখিয়া তাঁহার স্ত্রী যেদিন স্বর্গে যান সেই-দিন হইতে আজ পর্যন্ত কখনো তিনি সাহস করিয়া এই ছবিখানির দিকে

তাকাইতে পারেন নাই। এবং বহুলোকের অনুরোধসত্ত্বেও আর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নাই।

হরিবিলাসবাবু খামের ভিতর হইতে ধীরে ধীরে সেই ছবিখানি বাহির করিলেন এবং আজকের এই বালিকাটির সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর মুখের অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখিয়া চমকাইয়া উঠিলেন। তেইশ বৎসর পূর্বে যেদিন এই ছবিখানি তুলিয়াছিলেন সেদিনের কথা মনে পড়িয়া তাঁহার চোখ দিয়া দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

এই ছবিখানি তাঁহারি স্ত্রী সযত্নে সিন্দুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, লজ্জায় কাহারো সামনে কোনদিন বাহির করিতে দেন নাই। হরিবিলাসবাবু যেন ইহার ভিতর দিয়া আবার বহুদিন পরে তাঁহার স্ত্রীর স্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলেন। এমন সময় হঠাৎ পিতাকে কি বলিবার জন্য অমল সেই ঘরে ঢুকিল, কিন্তু 'বাবা' বলিয়া ডাকিয়াই তাহার মুখের কথা মুখে মিলাইয়া গেল। হরিবিলাসবাবু এমনভাবে অপলক দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন যে, অমল কেমন ভড়কাইয়া গেল।

হরিবিলাসবাবু যেন পুত্রকে আজ নূতনরূপে দেখিলেন। তেইশ বৎসর পূর্বে তাঁহার যে চেহারা ছিল তাহার সঙ্গে অমলের চেহারার এমন অদ্ভুত মিল দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

ভীত ও অস্ফুট কণ্ঠে অমল বলিল, বাবা, তোমার কি অসুখ করেছে?

নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, অসুখ—হ্যাঁ—না, না! বলিয়া ছবিখানি তৎক্ষণাৎ সিন্দুকের মধ্যে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিলেন।

সেদিন হইতে কেন জানি না তাঁহার জেদ চাপিল যেমন করিয়া হউক সেই বালিকাটির সহিত অমলের বিবাহ দিবেন।

মেয়েটির নাম মেনকা। পিতৃমাতৃহীন হইয়া কাকার সংসারে মানুষ হইতেছিল—অপ্রয়োজনীয় জিনিসের মতো। তাই হরিবিলাসবাবু যখন

বিনাপণে পুত্রের জন্য তাহার পাণিপ্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন মেনকার কাকা তখন ভ্রাতুস্পুত্রীর অল্প বয়সের কথা একবারও চিন্তা করিলেন, না বরং আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বর্তমান বিবাহ-প্রথার কুফল ও সেকালের গৌরীদানের মহিমা কীর্তন করিতে করিতে মেনকার অবাঞ্ছিত ভার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

দশ বৎসরের বালিকা, বধূবেশে কাঁদিতে কাঁদিতে হরিবিলাসবাবুর ঘরে আসিয়া উঠিল।

অমল পিতাকে দেবতার মতো ভক্তি করিত। কোনদিন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কোনো কথা বলে নাই। পিতার ইচ্ছাই ছিল তাহার ইচ্ছা। সেইজন্য তাহার বিবাহের দিন হইতে পিতাকে পূর্বাপেক্ষা হর্ষোৎফুল্ল দেখিয়া তাহার মন খুশিতে ভরিয়া উঠিল। কি যেন একটা বিষাদের ছায়া সে বাল্যকাল হইতে তাহার পিতার মুখে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল! সর্বদা যেন একটা দুঃসহ ভার তিনি অন্তরে লুকাইয়া রাখিতেন। তাই বহুকাল পরে পিতার মনের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া অমল যতখানি খুশি হইল তাহার চেয়েও বেশি হইলেন তাহার খুড়ি, মাসি, পিসি, বিধবা ভগিনী প্রভৃতিরা।

যেদিন হরিবিলাসবাবুর স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছিল সেই দিন হইতে কে যেন তাঁহার অন্তরের সমস্ত সুখশান্তি হরণ করিয়া লইয়াছিল। বাড়িতে কেহ তাঁহাকে হাসিতে দেখে নাই, কেহ তাঁহাকে কোনো আনন্দ-উৎসবে যোগদান করিতে দেখে নাই। চাকরি না করিলে নয়; সংসারের এতগুলি প্রাণী অনাহারে মরিবে, তাই যেন যন্ত্রচালিতের মতো তিনি নিয়মিত অফিসে যাইতেন এবং অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া চুপচাপ ঘরে বসিয়া বই লইয়া পড়িতেন। অসাধারণ গাম্ভীর্য দিনরাত তাঁহাকে ঘিরিয়া থাকিত।

সংসারের কোনকিছুর দিকে তিনি ফিরিয়া চাহিতেন না। ঝি-চাকর, রাঁধুনী-বামুন, বিধবা বোন, ভাগ্নে-ভাগ্নী, উপার্জন-অক্ষম ভাই ও তাহার স্ত্রী,

ভাইপো, ভাইঝি, পিস্‌তুতো ভাই, মাস্‌তুতো বোনের জামাই—ইহাদের লইয়া সংসার দিনরাত মুখরিত হইয়া থাকিত। তাহাদের স্বার্থসংঘাত-জনিত কোলাহল হইতে তিনি সর্বদা নিজেকে দূরে রাখিতেন। শুধু মাসের প্রথমে মাহিনা পাইয়া খরচের জন্য মোটা রকমের একটা টাকা বিধবা বোনের হাতে তুলিয়া দিতেন, ইহা ছাড়া প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে সংসারের ফাঁকে ফাঁকে অতিরিক্ত অর্থ গুঁজিয়া দিয়া এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারের ভিত্তিটাকে কোনরকমে রক্ষা করিয়া যাইতেন।

এমনি করিয়া সতেরো বৎসর চলিয়া আসিতেছিল।

কিন্তু যেদিন একমাত্র পুত্র অমলের বিবাহ দিয়া হরিবিলাসবাবু পুত্রবধূ ঘরে আনিলেন সেইদিন হইতে যেন এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল। তিনি ধীরে ধীরে নিজের হাতে আবার সংসারের ভার তুলিয়া লইলেন। নূতন আশা, নূতন উদ্যম, নূতন প্রেরণায় তাঁহার সারা দেহ সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

আত্মীয়স্বজন যাঁহারা এতদিন বিনাবাধায় সংসারের কর্তৃত্ব করিতেন তাঁহারা চোখের জল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, আহা, বৌ নিয়ে বাছা যেন আবার সংসারী হয়, ভগবান যেন তাই করেন। বাছার কষ্ট দেখলে বুক ফেটে যায়।

হরিবিলাসবাবু ছয়শত টাকা বেতনে পাটনার সরকারী দপ্তরে চাকরি করিতেন। সরকার-দত্ত স্বল্পপরিসর কোয়ার্টারে এতদিন কোনরকমে ছাগলের খোঁয়াড়ের মতো বহুজনপরিবৃত হইয়া দিনাতিপাত করিতেছিলেন। আজ হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, এই জঘন্য আলোবাতাসহীন ঘরগুলি যেন তাঁহার শ্বাসরোধ করিয়া ধরিতেছে। কেরানী বলিয়া কি তিনি মানুষ নহেন! এই দাসমনোবৃত্তির প্রতি ঘৃণায় তাঁহার মন রি-রি করিয়া উঠিল। এতদিন কেমন করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বাস করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এতদিন কি তাঁহার মধ্যে মনুষ্যত্ব ছিল না?

পরদিন অফিসে যাইয়াই তিনি এক দরখাস্ত করিয়া বসিলেন টাকা ধার লইবার জন্য এবং অল্পদিনের মধ্যে গঙ্গার ধারে এক বিরাট অট্টালিকা নির্মাণ করাইলেন।

এদিকে শ্বশুরকে পাইয়া মেনকা যেন পিতা ও মাতার শোক একসঙ্গে ভুলিল। ছোটখাট আদরে-আবদারে সে সর্বদা হরিবিলাসবাবুকে ব্যস্ত করিয়া তুলিত। তিনিও সব কাজ ফেলিয়া বৌমার তুচ্ছতম আদেশটি আগে প্রতি-পালন করিতে ছুটিতেন—যেন ইহা তাঁহার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

মেনকাকে পাইয়া হরিবিলাসবাবুরও আবাব নূতন জীবন-যাত্রা সুরু হইল। বৌমা ফুল ভালবাসে বলিয়া তিনি বাড়ির চারিপাশে বিরাট ফুলের বাগান করাইলেন। বৌমা রাজহাঁস দেখিতে ভালবাসে বলিয়া বাগানের মাঝে একটি পুষ্করিণী কাটাইয়া তাহাতে রাজহাঁস ছাড়িয়া দিলেন। বৌমা হরিণ ভালবাসে বলিয়া ছোট ছোট কতকগুলি হরিণ কিনিয়া আনিয়া বাগানে ছাড়িয়া রাখিলেন। মেনকা কখনো হরিণের পিছু পিছু সেই বাগানের মধ্যে ছুটিয়া বেড়াইত, কখনো বা হাঁসগুলিকে ঢিল মারিয়া ব্যস্ত করিয়া তুলিত। হরিবিলাসবাবুও তাহার পিছু পিছু বাগানে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন—তিনি যেন ছিলেন তার খেলার সাথী! যদি তিনি কোনদিন অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন মেনকা জোর করিয়া তাঁহাকে টানিতে টানিতে বাগানে লইয়া যাইত, এবং কখনো বা সে নিজে রাগিয়া মুখ ভার করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিত, আবার হরিবিলাসবাবু তাহার মান ভাঙাইয়া তাহার ইচ্ছাতেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিয়া দিতেন। এইভাবে শ্বশুর তাঁহার বয়সের কথা ভুলিয়া গিয়া পাঁচ বছরের শিশুর মতই মেনকার সহিত খেলা করিতেন।

ইহা ছাড়াও শ্বশুরের প্রতিটি খুঁটিনাটি কাজ মেনকা নিজে হাতে করিয়া দিত। অফিসে যাইবার সময় তাঁহার জামাকাপড় লইয়া সে দাঁড়াইয়া থাকিত। পান, জলের গেলাস, তামাক পর্যন্ত সাজিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখিত এবং তিনি

খাইতে বসিলে পাখা হাতে করিয়া সারাক্ষণ মেনকা তাঁহাকে বাতাস করিত।

ছেলেমানুষের হয়ত কত কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া হরিবিলাসবাবু তাহাকে নিষেধ করিতেন, কখনো বা ধমকাইতেন, কিন্তু কে যেন কাহাকে বলে! দুষ্টুমিভরা হাসিতে চোখ-মুখ উদ্ভাসিত করিয়া মেনকা সেই কাজগুলি তৎক্ষণাৎ করিয়া ফেলিয়া তাঁহাকে আরও রাগাইত। হরিবিলাসবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিতেন।

এইভাবে ছোট ছোট স্নেহের অভিনয় নিত্যই তাঁহাদের মধ্যে চলিত এবং এমনি করিয়া কোথা দিয়া কেমন করিয়া সেই ছোট মেয়েটি যে একদিন তাঁহার সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়া বসিল তাহা হরিবিলাসবাবুও বুঝি জানিতে পারিলেন না।

অফিসের ছুটি হইলে আর একমুহূর্তও কোথাও অপেক্ষা না করিয়া তিনি বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন। এবং আসিবার সময় দোকান হইতে ভাল ভাল ফল ও উৎকৃষ্ট খাবার লইয়া আসিয়া বৌমাকে চোখের সামনে বসাইয়া খাওয়াইতেন ও নিজে খাইতেন। ভাল কাপড়, ভাল জামা,—নূতন ফ্যাশানের যাহা কিছু তাঁহার চোখে পড়িত তাহা তৎক্ষণাৎ তিনি মেনকার জন্য কিনিয়া আনিতেন। ছোট মেয়েরা পুতুলকে যেমন করিয়া সাজায় তেমনি করিয়া তিনি তাহাকে সাজাইতেন অন্তরের সমস্ত স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া। কিছুতেই আর তাঁহার আশা মিটিত না—যাহা আনিতেন তাহাই মনে হইত যেন মেনকার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর।

শ্বশুরের এই আদর, যত্ন ও ভালবাসায় মেনকা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িত এবং এই অনাস্বাদিতপূর্ব স্নেহের আতিশয্যে বারবার তাহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিত।

শ্বশুরের কাছে মেনকার যত আবদার। কোনদিন তাহার কোন ইচ্ছা

তিনি অপূর্ণ রাখেন নাই। একদিন রাস্তায় একখানি চকচকে সাদা মোটর গাড়ি দেখিয়া মেনকা বলিল, বাবা, আমি ওই রকম গাড়ি চড়বো।

তাহার পরের দিন হরিবিলাসবাবু সেই রকমের একখানি গাড়ি কিনিয়া বসিলেন।

খুড়ি, জ্যাঠাই, ভগ্নী প্রভৃতি রমণীরা হরিবিলাসবাবুর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া বলাবলি করিতেন, আহা, বাছার প্রাণে কত শখ অপূর্ণ ছিল! ভাগ্যিস্ অমলের বিয়ে হয়েছিল!…ভগবান্ ওদের বাঁচিয়ে রাখুন।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া মেনকা অমলকে বলে, তোমার চেয়ে বাবা আমাকে ঢের বেশি ভালবাসেন।

অমল বলে, তোমার চেয়ে আমায় বেশি ভালবাসেন।

মেনকা বলে, ইস্!

অমল বলে, কখ্খনো নয়।

—আমাকে বাবা মোটরগাড়ি কিনে দিয়েছেন, তোমাকে ত আর দেননি।

—আমাকে বাবা ঘোড়া কিনে দিয়েছেন তোমাকে ত দেননি।

মেনকা বলে, ঘোড়ার চেয়ে অনেক বেশি দাম মোটরগাড়ির—তাহ'লে বাবা নিশ্চয়ই আমাকে বেশি ভালবাসেন।

অমল বলে, ইস্!

মেনকা বলে, আমায় নিয়ে বাবা রোজ গাড়ি ক'রে বেড়াতে যান, তোমায় ত আর নিয়ে যান না?

তাড়াতাড়ি তাহার কথার উত্তর দিতে গিয়া অমল চুপ করিয়া যায়। হঠাৎ তাহার মনে হয়, সত্যই ত রোজ বাবা মেনকাকে লইয়া বেড়াইতে

যান। তাহা হইলে কি তিনি আমাকে তেমন ভালবাসেন না? সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার মনে হয়, ধ্যেৎ, তা কি কখনো হয়! বাবা আমাকে কত ভালবাসেন! মেনকা ছেলেমানুষ, তাই তাকে আদর করেন।

এইভাবে তাহারা দুইজনে পিতৃস্নেহের ভাগ-বাঁটোয়ারা লইয়া ঝগড়া করিতে করিতে একসময় ঘুমাইয়া পড়ে। তাহাছাড়া সমস্ত দিন তাহারা পিঠোপিঠি ভাইবোনের মতো হাসিয়া খেলিয়া, তুচ্ছ কারণে ঝগড়া করিয়া বাড়ি মাথায় করিয়া রাখে—বাহিরের কেউ দেখিলে বুঝিতেই পারে না যে তাহারা স্বামী-স্ত্রী।

হরিবিলাসবাবু দুই চোখ ভরিয়া তাহাদের এই প্রেমলীলা দেখিতেন। দেখিয়া দেখিয়া তাঁহার যেন আর আশ মিটিত না।

কিন্তু একদিন হঠাৎ যেন তাঁহার মনে হইল এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ইহাতে ছেলের স্বাস্থ্য ও লেখাপড়া উভয়ই নষ্ট হইতে পারে। তাই কতকটা জোর করিয়াই তিনি তাহাদের দূরে দূরে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। এবং সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যহ বিকালে আরো বেশিক্ষণ ধরিয়া বৌমাকে লইয়া তিনি বেড়াইয়া বেড়াইতেন।

মেনকা মোটর চড়িতে ভারি ভালবাসে। নিত্য নূতন শাড়ি পরিয়া নিখুঁত করিয়া সাজিয়া শ্বশুরের পাশে আসিয়া বসিত। কত মাঠ, কত নদী ও অরণ্য পশ্চাতে ফেলিয়া তাঁহাদের গাড়ি ছুটিত দূর-দূরান্তরে। বিস্ময়বিমুগ্ধ নেত্রে মেনকা সেই সব দেখিতে দেখিতে ঘুরিয়া বেড়াইত।

হরিবিলাসবাবু নিজে মোটর চালাইতেন। কখনো অজস্র প্রশ্ন একসঙ্গে করিয়া মেনকা তাঁহাকে বিপদে ফেলিত। কখনো বা বলিত, বাবা, আমি গাড়ি চালাবো।

রোজ রাত্রে বিছানায় শুইয়া মেনকা তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত একে একে অমলকে শুনাইত। অমল তাহা শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত। এক-

একদিন রাগ করিয়া অমল বলিত, যাও, শুনতে চাই না। কিংবা কোনদিন বলিত, চুপ করো, আমার ভয়ানক ঘুম পেয়েছে।

মেনকা তখন দুই হাতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, রাগ ক'রো না গো—বাবা বলেছেন তুমি যখন বড় হবে তোমার লেখাপড়া সব শেষ হয়ে যাবে, তখন তোমাকে একখানা আলাদা খুব বড় গাড়ি কিনে দেবেন, তুমি যত ইচ্ছে ঘুরে বেড়াবে। এখন দিলে তোমার এগজামিনের ক্ষতি হবে কিনা!

অমল বলিত, চাই না আমি গাড়ি।

এইভাবে দেখিতে দেখিতে পাঁচ বছর কাটিয়া গেল এবং কেমন করিয়া যে সকলের অজ্ঞাতসারে মেনকা কৈশোর পার হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিল তাহা হরিবিলাসবাবু কিংবা অমল কেহই বুঝিতে পারিল না। শুধু একদিন অপরাহ্ণে শ্বশুরের সঙ্গে বেড়াইতে যাইবার জন্য মেনকা যখন আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধনুকের মত বাঁকা ভ্রূ-দুটির মধ্যে সিন্দূরের টিপ পরিতেছিল তখন অমলের মনটা যেন কেমন হইয়া গেল। সে আস্তে আস্তে তাহার হাত দুইটি ধরিয়া বলিল, মিনু, আজ আর তুমি বেড়াতে যেয়ো না, চলো আমরা দু'জনে বাগানে ফুল তুলিগে।

মেনকা বলিল, বাবা গাড়ি বার ক'রে এনে দাঁড়িয়ে আছেন, আমি না গেলে তিনি কী মনে করবেন? এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল। অমলও আর তাহাকে বাধা দিল না। সে তাহার পিতাকে দেবতার মতই ভক্তি করিত।

শুধু অন্যদিনের মত সেদিন অমল আর খেলিতে যাইতে পারিল না। তাহাদের গাড়ি যে পথে চলিয়া গেল সেই দিকে চাহিয়া জানালার গরাদ ধরিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাঘের শীত কাটিয়া গিয়া হঠাৎ সেদিন গরমের হাওয়া বহিতেছিল। পশ্চিমের আকাশ হইতে অস্তগামী সূর্যের শেষ রক্তিম আভাটুকু আসিয়া অমলের মুখেচোখে পড়িয়া তাহাকে যেন কেমন বিষণ্ণ ও মলিন দেখাইতেছিল।

পিসিমা বাড়ির গিন্নী। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অমল যেমন প্রত্যহ বৈকালে খেলিতে যায় আজও বোধ হয় তেমনি গিয়াছে। তাই পাশের বাড়ির মিত্তির-গিন্নীর সঙ্গে ছাদে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে আলাপ করিতেছিলেন, বলি, বউ নয় ত মা, যেন ধিঙ্গী। এখনো কি শ্বশুরের সঙ্গে সেজেগুজে একলা বেড়াতে যাওয়া ভাল দেখায়! আর এতই বা কেন? হোক না শ্বশুর, বলি পুরুষমানুষ ব'লেও ত একটু সমীহ ক'রে চলা উচিত—কি বলো বৌমা? শ্বশুর ব'লে একেবারে মানে না মা, এমন বৌ!

মিত্তির-গিন্নী কণ্ঠে একপ্রকার সুর টানিয়া বলিলেন, তা নয় আবার! বলি আমাদেরো একদিন ছিল—আমাদেরো ত বিয়ে হয়েছিল অল্প বয়সে। কিন্তু তোমায় বললে বিশ্বাস করবে না মা, শ্বশুর আমার বৌমা বলতে অজ্ঞান। একপাতে ব'সে কতদিন তাঁর সঙ্গে খেয়েছি—তাই ব'লে কি আর পনেরো-ষোল বছরের মাগী হয়ে?

—আর অমলটাও তেমনি! এখন বড় হয়েছিস, সব দেখছিস শুনছিস, বৌটাকে একটু বারণ ক'রে দিতে পারিস ত! এদিকে যে আমার মুখ দেখানো ভার হ'ল! লোকে যে আমার গায়ে থুথু দিচ্ছে মা!

অমল পাথরের মতো স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিল, তারপর সবার অলক্ষ্যে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

সেদিন আবার হরিবিলাসবাবুর ফিরিতে সবচেয়ে বেশি রাত হইল। তিনি বৌমাকে লইয়া নূতন পাহাড় দেখাইবার জন্য গয়ার কাছে গিয়া পড়িয়াছিলেন। আসিবার সময় মেনকা রাশীকৃত গোলাপফুল পাহাড় হইতে

তুলিয়া আনিয়াছিল অমলকে উপহার দিবার জন্য। অমল গোলাপ ফুল বড় ভালবাসে।

কিন্তু ফুল লইয়া তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া মেনকা মুষড়াইয়া পড়িল। দেখিল, অমল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যহ সে তাহার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে, তাই আজ তাহাকে ঘুমাইতে দেখিয়া মেনকার মনে কেমন ভয় হইল। সে তাহার গায়ে হাত দিয়া আস্তে আস্তে ডাকিল, তুমি কি ঘুমুচ্ছ? —ত্যাখো, তোমার জন্যে কত ফুল এনেছি।

অমল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল—যেন সেখানে সে কী খুঁজিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই চাহনির অর্থ বুঝিতে না পারিয়া মেনকার বুক কাঁপিয়া উঠিল। সে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, কেন গো এমন ক'রে আমার দিকে চেয়ে আছো? কী হয়েছে বলো-না?

অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে অমল বলিল, অসুখ করেছে।

—তুমি কিছু খাবে না?

—না।

মেনকা ফুলগুলি তাহার মাথার কাছে রাখিয়া দিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িল এবং কোনরকমে চারটি ভাত খাইয়া আসিয়া শুইয়া পড়িল।

গোলাপের গন্ধে তখন ঘরের বাতাস সুরভিত হইয়া উঠিয়াছিল। মেনকা যখন আলো নিভাইয়া শুইতে আসিল, অমল বলিল, ফুলগুলো বাইরে ফেলে দাও—বড্ড গন্ধ, আমি সহ্য করতে পারছি না।

গোলাপের গন্ধ যাহার এত প্রিয় ছিল তাহার মুখ হইতে এই কথা শুনিয়া মেনকা ভাবিল নিশ্চয়ই অমলের অসুখ করিয়াছে। তাই আর কোনো কথা না বলিয়া সে ফুলগুলি বাহিরেই ফেলিয়া দিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া অমল নিজের পড়াশুনা করিল এবং যথারীতি কলেজে চলিয়া গেল। মেনকাও তেমনি নানাকাজের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে

আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইল না।

কলেজ হইতে অমল সেদিন দেরিতে ফিরিল। অনেক ক্লাস ছিল।

মেনকা তখন যথারীতি বেড়াইতে যাইবার জন্য বেশভূষা করিতেছিল। ঘরে ঢুকিতেই হঠাৎ অমলের চোখ পড়িল তাহার জামা-কাপড়ের দিকে। তাহার মনে হইল যেন সে অন্যদিনের চেয়ে আজ বিশেষভাবে সাজিয়াছে। মেনকার এ মূর্তি অন্য কোনদিন সে দেখে নাই। একপ্রকার হিংস্র আনন্দে অমলের চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল। ধীর অথচ কঠিন পদক্ষেপে সে মেনকার কাছে অগ্রসর হইয়া বলিল, কার জন্যে আজ এমন অপরূপ সাজে সেজেছো?

মেনকা তাহার স্বভাবসুন্দর হাসিতে চোখমুখ উদ্ভাসিত করিয়া বলিল, তোমার জন্যে।

—আমার জন্যে না আর কারুর জন্যে?

—কী বলছো তুমি!

—বলছি এই যে, এ জামা-কাপড় এখুনি খুলে ফেলো। আমি তোমায় যেতে দেবো না। এই বলিয়া সে পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল। মেনকা প্রথমে মনে করিয়াছিল অমল বুঝি রসিকতা করিতেছে, তাই আবার হাসিমুখে বলিল, পথ ছাড়ো লক্ষ্মীটি, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন।

অকস্মাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে অমল বলিল, না, পথ ছাড়বো না।

—ত্যাখো, ছেলেমানুষি ক'রো না, বাবা কখন্ থেকে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নীচে।

—থাকুন তিনি দাঁড়িয়ে, আমি কিছুতেই তোমায় যেতে দেবো না।

অনুনয় করিয়া তখন মেনকা বলিল, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, পথ ছাড়ো, বাবা কী ভাবছেন বলো ত!

রুক্ষস্বরে অমল উত্তর করিল, বাবা কী ভাবছেন জানি না, তবে পাড়ার লোকেরা যা ভাবছে, তা শুনলে তুমিও কানে আঙুল দেবে।

ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জন করিয়া উঠিয়া মেনকা বলিল, পাড়ার লোকেরা কী ভাবছে!—তার মানে?

—তার মানে,—তুমি এখন আর ছেলেমানুষটি নও, আর বাবাও এমন কিছু বৃদ্ধ নন্ যে—

—চুপ! বলিয়া মেনকা দুইহাতে তাহার কান চাপিয়া ধরিল। উত্তেজনায় ক্রোধে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তারপর সহসা বেশভূষা সমস্ত টানিয়া ছিঁড়িয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া বিছানায় আছড়াইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। দুঃখে অভিমানে ঘৃণায় তাহার মুখে আর কোনো কথা জোগাইল না।

অমল নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বাহিরে হঠাৎ পরিচিত জুতার শব্দ পাইতে তাহারা দুইজনেই সচকিত হইয়া উঠিল। মেনকা তখন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, তুমি কী সর্বনাশ করলে! বাবা নিজে কানে যে সব শুনে গেলেন!

অমলের যেন চমক ভাঙিল। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিতেই সে দেখিল, চৌকাঠের পাশে একজোড়া জুতার স্পষ্ট দাগ। যেটুকু সন্দেহ ছিল অমলের মনে, ইহা দেখিয়া তাহা দূর হইয়া গেল।

তখন ঘরে ঢুকিয়া কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, কি হবে মেনকা? মেনকা কোনো উত্তর না দিয়া শুধু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

হরিবিলাসবাবু বৌমার আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া উপরে গিয়াছিলেন তাহাকে ডাকিবার জন্য। কিন্তু দরজার কাছে যাইতেই তাঁহার কানে যে সমস্ত কথা আসিয়া পৌঁছাইল তাহাতে তাঁহার দেহ হিম হইয়া গেল। নিশ্চল প্রস্তরমূর্তির মতো তিনি কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া একাকী গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

মোটরের শব্দ কানে যাইতেই মেনকা ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে

উঠিয়া একেবারে জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ি তখন ছুটিয়াছে উন্মত্ত-বেগে। ধূলা উড়াইয়া চক্ষের নিমেষে তাহা দূরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, কাহাকে কি বলিবে মেনকা যেন কিছুই ভাবিয়া পাইল না। শুধু অগ্নিময়ী দৃষ্টিতে সে অমলের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মেনকার মুখের দিকে চাহিতেই অমলের মুখ ছাইএর মত সাদা হইয়া গেল। অপরাধীর মতো সে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহারো মুখ দিয়া আর কোনো কথা বাহির হইল না। যেন এইমাত্র তাহাদের সম্মুখে বজ্রপাত হইয়া গেল।

মেনকা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহাকে কিছু বলিবার সাহসও আর অমলের রহিল না।

পিসিমা তখন ভাঁড়ারঘরে বসিয়া ঠাকুরঘরের জন্য প্রদীপ সাজাইতে-ছিলেন। মেনকা একেবারে সোজা তাঁহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল, পিসিমা, আমি এখনি একবার বাপের বাড়ি যাবো, অনেকদিন কাকাকে দেখিনি, বড় মন কেমন করছে।

তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া পিসিমা একবার ভাল করিয়া মেনকার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। স্ত্রীলোকের মনের খবর স্ত্রীলোকেরা যেমন বুঝিতে পারে এমন বুঝি আর কেউ পারে না। পিসিমা প্রথমটা মনে ভাবিলেন, আজ মেনকা নিশ্চয়ই অমলের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে, তাই বেড়াইতে যায় নাই, এবং রাগ করিয়া বাপের বাড়ি যাইতে চাহিতেছে। তিনি বলিলেন, বৌমা, ছেলেমানুষি কি এখনো গেল না? এই ভরসন্ধেবেলা বাড়ি থেকে বেরুবার নাম করতে আছে!

মেনকা দৃঢ় স্বরে শুধু বলিল, হ্যাঁ আমি যাবোই।

পিসিমা জানিতেন শ্বশুরের আদরিণী বধূমাতাকে এ বাড়িতে কাহারো

কোনো কথা বলিবার হুকুম নাই। সে একবার যাহা বলিবে তাহা না করিয়া ছাড়িবে না। তাই মিছামিছি হরিবিলাসবাবুর বিরাগভাজন না হইয়া তিনি শুধু বলিলেন, তা যাবে ত যাও বাছা—তবে শ্বশুর এলে তাঁকে ব'লে গেলেই কি ভাল হ'ত না ?

মেনকা বলিল, না তা'হলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে—আমাকে এখুনি যেতে হবে।

—তবে যাও বাছা। বলিয়া পিসিমা উপরে চলিয়া গেলেন।

মেনকা আর উপরে উঠিল না কিংবা তাহার ঘরে গেল না। শুধু ঝি ও দারোয়ানকে লইয়া তৎক্ষণাৎ একখানা গাড়ি ভাড়া করিয়া বাপের বাড়ি চলিয়া গেল। পাটনা হইতে মাত্র পাঁচ ক্রোশ দূরে মেনকার বাপের বাড়ি।

অমল উপর হইতেই মেনকার সব কথা শুনিতে পাইল। কিন্তু তাহাকে বাধা দিবার সাহস তখন যেন আর তাহার দেহে ছিল না। শুধু সে জানলা দিয়া চাহিয়া রহিল। দূরে মেনকার গাড়ির আলো মিলাইয়া গেল।

সেদিন রাত্রি প্রায় বারোটার সময় হরিবিলাসবাবু বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার ঘরে তখনো আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া তিনি মনে করিলেন হয়ত মেনকা তাঁহার খাবার লইয়া এতরাত পর্যন্ত বসিয়া আছে। কিন্তু কোন্ মুখে তিনি তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইবেন! তাঁহার বুকের ভিতরটা বার-কয়েক ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। তবু ধীরে ধীরে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন ঘরের দিকে।

নিস্তব্ধ বাড়ি। চারিদিক অন্ধকার। ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া তিনি আগে ভিতরে উঁকি মারিলেন, তারপর যখন দেখিলেন কেহ নাই, শুধু তাঁহার

খাবার ঢাকা পড়িয়া আছে এককোণে, তখন হরিবিলাসবাবু যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে অমলের পিসিমা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, আলো তেমনি জ্বলিতেছে, খাবার তেমনি ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে, আর জামাকাপড় না ছাড়িয়া চুপ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া আছেন হরিবিলাসবাবু। যেন কিসের গভীর চিন্তায় তিনি মগ্ন।

—দাদা, তুমি খাবে না কিছু?

হরিবিলাসবাবু যেন চমকাইয়া উঠিলেন। তারপর ভগ্নীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, না, আজ আর ক্ষিদে নেই আমার।

—তুমি আদর দিয়ে দিয়ে বৌএর মাথাটা খেলে। ওমা, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ভর্‌সন্ধেবেলা ঝি-দারোয়ান সঙ্গে ক'রে বাপের বাড়ি চ'লে গেল। আবার সেখান থেকে ব'লে পাঠিয়েছেন একমাস থাকবেন। এই বলিয়া তিনি চুপ করিলেন এবং ভাই ইহার কী উত্তর দেন তাহা শুনিবার জন্য জিজ্ঞাসুনেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হরিবিলাসবাবু তখন এমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অপর কেহ তাঁহার সহিত কথা বলিতেছেন সেকথা তাহার হুঁশই ছিল না। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া পিসিমা মনে করিলেন, কথাটা হয়ত ভায়ের ভাল লাগিল না। তাই পূর্বাপেক্ষা স্বর ঈষৎ নরম করিয়া বলিলেন, তা যখন ছেলেমানুষ ছিল তখন না হয় এরকম শোভা পেতো—এখন যদি তুমি একটু-আধটু ব'কে না দাও ত একদিন তোমাকেই ভুগতে হবে দেখে নিয়ো, মেয়েছেলের এত বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এই বলিয়া তিনি যেন এক বিরাট কর্তব্য সম্পাদন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ভগ্নীর এই কথা শুনিয়া তিনিও যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন, তাই তাড়াতাড়ি বলিলেন, তা ছেলেমানুষ, অনেকদিন বাপের বাড়ি যায়নি—থাক্

না মাসখানেক সেখানে।

—তুমি আদর দিয়ে বৌএর মাথাটা খাবে দাদা। এই বলিতে বলিতে পিসিমা তাঁহার নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

সেদিন বিছানায় শুইয়া অনেকরাত পর্যন্ত হরিবিলাসবাবুর চোখে ঘুম আসিল না।

মানুষের মন দুর্জ্ঞেয়। সেখানে নিত্য কত চিন্তা গড়িতেছে ভাঙিতেছে, উঠিতেছে পড়িতেছে, তাহা একমাত্র যিনি মানুষের স্বষ্টিকর্তা তিনি ছাড়া বোধ করি আর কেহই বুঝিতে পারে না। তাই মানুষ যখন মানুষের কার্য-কলাপের সূত্র ধরিয়া তাহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য মাথা খুঁড়িতে থাকে অন্তর্যামী তখন অন্তরালে বসিয়া মুচকি হাসেন।

কাজেই পরদিন যখন হরিবিলাসবাবু চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য অফিসে গিয়া এক দরখাস্ত করিয়া দিলেন তখন তাঁহার সহকর্মীরা যেমন বিস্মিত হইলেন, তাহার চেয়েও বেশি হইলেন বাড়ির লোকেরা। কত লোক তাঁহাকে কত বুঝাইলেন কিন্তু তিনি কাহারো কথা শুনিলেন না। নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল হইয়া রহিলেন।

অমল সব শুনিয়াছিল, কিন্তু পিতার নিকট যাইয়া তাঁহাকে কিছু বলিতে তাহার সাহস হয় নাই। যেদিন মেনকা বাপের বাড়ি চলিয়া গেল সেইদিন হইতে আর একদিনও সে পিতার সম্মুখে বাহির হয় নাই—সর্বদা লুকাইয়া বেড়াইত।

তাই ইহার দিনকুড়ি পরে অমল যখন পিসিমার মুখে শুনিল যে, তাহার পিতা চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন এবং আজই রাত্রে হরিদ্বার যাইতেছেন, তখন তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, সে স্থির হইয়া এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে পিতার ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু দরজার

কাছে যাইয়া আর তাহার পা উঠিল না ; সে কিছুতেই ঘরের ভিতরে ঢুকিতে পারিল না।

হরিবিলাসবাবুও সেই অবধি কোনদিন তাহাকে কাছে ডাকেন নাই। আজ হঠাৎ অমলকে দরজার নিকট আসিয়া ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া ঘরের ভিতর ডাকিলেন।

অমল ঘাড় হেঁট করিয়া পিতার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

হরিবিলাসবাবু বলিলেন, আজ রাত্রে আমি হরিদ্বার যাচ্ছি—বাকি জীবনটা সেইখানেই কাটাবো মনে করেছি। তুমি এখন উপযুক্ত হয়েছো—এইবার আমায় ছুটি দাও। এই নাও সিন্দুকের চাবি—আর সরকার মশাই রইলেন, তিনি সব দেখাশুনো করবেন, সাবধানে হিসেব-পত্তর ক'রে চ'লো। তাহ'লে তোমাদের কোনদিন কোনো অভাব হবে না।

অমল কী বলিতে গেল কিন্তু পারিল না। তাহার ঠোঁট দুইটি শুধু বারকয়েক কাঁপিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল। চাবিটা হাতে লইয়া চোখের জল চাপিতে চাপিতে সে নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে বাগানের গাছপালা সব যেন প্রকৃতির সঙ্গে মসীলিপ্ত হইয়া একাকার হইয়া রহিয়াছে। উপরের বারান্দায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অমল ভাবিতে লাগিল, বোধ হয় তাহারই অপরাধের জন্য আজ তাহার পিতা সংসার ছাড়িয়া বনবাসী হইতেছেন। কি জানি সেই মুহূর্তে কেন তাহার মনে হইতে লাগিল এই সমস্ত অনর্থের মূল সে নিজে। পুত্র হইয়া সে-ই যেন দাগা দিয়াছে পিতার মনে। ঘৃণায় তাহার সমস্ত মন কলুষিত হইয়া উঠিল। যেদিন হইতে তাহার জ্ঞান হইয়াছে, সেইদিন হইতে তখন পর্যন্ত পিতার স্নেহের অজস্র স্মৃতি একসঙ্গে মনে পড়িয়া অমলের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। একটা দুঃসহ গ্লানি তাহার বুক হইতে ঠেলিয়া উঠিয়া যেন কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিতে লাগিল।

হঠাৎ অমলের মনে হইল, এই সময় যদি মেনকা থাকিত তাহা হইলে হয়ত বাবার এই সংকল্প টলাইতে পারিত। তাই সেই কথা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে একখানা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া ছুটিল শ্বশুরবাড়ি।

রাত্রি নয়টায় হরিদ্বার যাইবার গাড়ি, তখন সাতটা বাজিয়াছে, আর মাত্র দুই ঘণ্টা বাকি।

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পথহারা নাবিকের মতো উদ্‌ভ্রান্ত ও অসহায় দৃষ্টি লইয়া অমল একেবারে হাজির হইল মেনকার সামনে।

মেনকা তখন একলা তাহার ঘরে বসিয়া চুপ করিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ছিল। অকস্মাৎ অমলকে ঐ অবস্থায় সেখানে ঢুকিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিল।

অমল বলিল, সর্বনাশ হয়েছে মিনু, বাবা সংসার ছেড়ে আজই হরিদ্বার চ'লে যাচ্ছেন—তুমি শীগগির চলো, তা না হ'লে বুঝি আর কেউ তাঁকে ফেরাতে পারবে না। এই বলিয়া ঝড়ের মতো এক নিশ্বাসে যাহা যাহা হইয়াছে সব একসঙ্গে বলিয়া ফেলিল।

পাষাণ-প্রতিমার মতো নীরব ও নিশ্চল হইয়া মেনকা সব কথা শুনিল। বোধকরি এই রকম একটা ভয়ানক কিছু শুনিবার আশঙ্কাই এতদিন সে করিয়াছিল। নিজের শ্বশুরকে সকলের চেয়ে ভাল করিয়া চিনিত একমাত্র মেনকা। তাই স্বামীর কথার কোনো উত্তর না দিয়া সে যখন চুপ করিয়া বসিয়া রহিল অমল তখন রীতিমত বিস্মিত হইল। তবুও কিছুক্ষণ পরে আবার সে বলিল, মিনু, শীগগির কাপড় প'রে নাও—আর দেরি করলে হয়ত বাবার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত হবে না। রাত ন'টায় গাড়ি।

মেনকা বলিল, আমি যাবো না—তুমি যাও।

তাহার কণ্ঠস্বরের এই দৃঢ়তা দেখিয়া অমল অবাক হইয়া গেল। যে পিতা তাহাকে এত ভালবাসিতেন এবং যাঁহাকে মেনকাও সদাসর্বদা ছায়ার মতো

ঘিরিয়া থাকিত তাঁহার প্রতি এই ঔদাসীন্য কেন বুঝিতে না পারিয়া অমলের মাথা যেন কেমন গোলমাল হইয়া গেল। তথাপি সে আর একবার ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল, মিনু, তোমার পায়ে পড়ি, একবার চলো—আমি জানি তুমি বললে বাবা কখনই যেতে পারবেন না!

মেনকা শান্তকণ্ঠে শুধু জবাব দিল, না, তা হয় না।

অমল তাহাকে অনেক সাধিল, অনেক অনুনয়-বিনয় করিল, কিন্তু কিছুতেই রাজী করাইতে পারিল না। মেনকা আপনার সংকল্পে তেমনি অচল অটল হইয়া বসিয়া রহিল।

অমল আরো কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মেনকা তাহাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না, এমন কি একবার বসিতে পর্যন্ত বলিল না। সে যেমনভাবে আসিয়াছিল ঠিক তেমনিভাবেই আবার চলিয়া গেল।

সরকার মহাশয়ের মুখে হরিবিলাসবাবু শুনিয়াছিলেন যে, এইমাত্র একখানা ট্যাক্সি করিয়া অমল কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় যে গেল তাহা বোধ করি তিনি অনুমানে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই গাড়িতে মালপত্তর বোঝাই করিয়া সরকার মহাশয় যতই তাঁহাকে ট্রেনের সময় হইয়াছে বলিয়া তাগাদা দিতে লাগিলেন ততই তিনি যাই-যাই করিয়াও যাইতে পারিতে-ছিলেন না। মানবচক্ষুর অন্তরালে তাঁহার হৃদয়ের কোন্ গোপনকক্ষে কে যেন আর-একজনের স্নেহব্যাকুল কণ্ঠের শেষ দু'টি কথা শুনিবার জন্য তখনো সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া ছিল।

এক সময় সরকার মহাশয় আসিয়া বলিয়া গেলেন, আর মাত্র কুড়ি মিনিট আছে ট্রেনের, এখন না বাহির হইলে এগাড়ি ধরিবার আর কোনো আশা নাই।

একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়া হরিবিলাসবাবু বলিলেন, এই—চলো—যাচ্ছি। বলিয়া শেষবারের মতো তিনি দরজার উপরে যে দুর্গার ছবি ছিল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যেমন পা বাড়াইয়াছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে বাহিরে একখানা মোটরের শব্দ হইল। তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন—কাহার চরণের ধ্বনি যেন তাঁহার ঘরের দিকে আসিতে লাগিল।

কিন্তু মিনিটখানেক পরে একলা নতমুখে ঘরে আসিয়া ঢুকিল অমল এবং পিতাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় রাখিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শুধু মুহূর্তের জন্য যেন হরিবিলাসবাবুর চক্ষু অমলের পিছনদিকে একবার কাহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পর কোনো কথা না বলিয়া এক হাতে তিনি অমলের চোখের জল মুছাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া মোটরে উঠিলেন।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

সেদিন সেই মসীমলিন আকাশের নীচে তিনটি নরনারীর জীবনে নিঃশব্দে যে বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হইয়া গেল একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া তাহার বোধ করি আর কেহ সাক্ষী রহিল না।

বনফুল

ভাগলপুরের ডাক্তার বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম হ'ল বনফুল। এই নামটি বাঙালী পাঠকের কাছে শুধু-যে বিশেষ-পরিচিত তাই নয়, খুব প্রিয়ও। প্রথম এঁর সম্বন্ধে পাঠক-সমাজ সচেতন হন যখন গল্প লেখার চিরাচরিত সব রীতি লঙ্ঘন ক'রে ইনি একপাতা-আধপাতার গল্প লিখতে শুরু করলেন। নানা রসের বিচিত্র গল্প, সামান্য কয়েকটি ছত্রে, অত্যন্ত সংক্ষেপে লেখেন। ভাষা অনাড়ম্বর, বাহুল্য বা অলঙ্কার-বর্জিত। বক্তব্যের অনেকখানিই পাঠককে অনুমান করে নিতে হয়, যদিচ তাতে অসুবিধা হয় না। অল্প কয়েকটি তুলির টানে এঁর হাতে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা অন্য চিত্রকর প্রচুর পরিশ্রম করলেও ফোটাতে পারতেন কিনা সন্দেহ। গদ্যে পদ্যে এঁর সমান হাত, যেমন পাকা হাত এঁর ডাক্তারি ও সাহিত্যে সমান। সমস্ত রকমের কাহিনীই লিখতে পারেন। আধপাতার গল্প থেকে শুরু করে হাজার পৃষ্ঠার উপন্যাস 'জঙ্গম', বেদের অনুবাদ, বিদ্যুৎ নিয়ে পাখী নিয়ে পৃথিবীর ক্রমবিবর্তন নিয়ে লেখা উপন্যাস—কোনোটাতেই পিছ্‌পা নন। এই প্রচণ্ড-শক্তিধর সাহিত্যিকটি এখনও ভাগলপুরে আছেন। গঙ্গার ধারে নিভৃত ল্যাবরেটরিতে এঁর সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চা একসঙ্গে চলে। মণিহারী ঘাটে নদীর ওপারে পৈতৃক বাটীতে এখনও বাবা বাস করেন। বাবা এবং আরও তিন ভাই ডাক্তার।

অদ্বিতীয়া

বেশ ছিলাম।

আপিসে সাহেব এবং গৃহে মা-ষষ্ঠী আমার প্রতি সদয় ছিলেন। সাহেব আমার মাহিনা এবং মা-ষষ্ঠী আমার সংসার বাড়াইতেছিলেন। আমার পিতৃ-মাতৃ-কুলে আর কেহ ছিল না। উত্তরাধিকার-সূত্রে কিছু টাকাও জুটিয়া গিয়াছিল। খাসা ছিলাম।

প্রভাবতী, অর্থাৎ আমার গৃহিণী, গড়ে বছরে দেড়টি করিয়া সন্তান-প্রসব করিয়া চারি বৎসরেই আমাকে ছয়টি পুত্রকন্যার মালিক করিয়া তুলিয়াছিলেন —মাঝে দুইবার যমজ হয়।

এবম্বিধ প্রজাবৃদ্ধিসত্ত্বেও কোন অভাব ছিল না। হঠাৎ কিন্তু বেকুব বনিয়া গেলাম।

পঞ্চম বর্ষেও গৃহিণী তাঁহার স্বাভাবিক গর্ভভার বহন করিতেছিলেন এবার কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক হইলেও সহজ ছিল না বোঝা গেল। কারণ তিনি মারাই গেলেন। তিনি তাঁহার পিত্রালয় শান্তিপুরে ছিলেন। যদিও আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়েই অনেক-কাল স্বর্গীয় হইয়াছেন, কিন্তু আমার শ্যালক বিনোদ ডাক্তার বলিয়া প্রভা প্রতিবারই সেখানে যাইত। বিনোদ লিখিতেছে—

"হঠাৎ 'এক্লেম্প্‌সিয়া' হইয়া দিদি তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। আপনাকে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। 'কিডনি' খারাপ ছিল। সেজদি, ছেলেদের লইয়া সম্বলপুরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিঠি বোধ হয় পাইয়াছেন।"

পাইলামও। তিনি লিখিতেছেন—"কি করিবে বল ভাই। সবই অদৃষ্ট। তোমার ছেলেমেয়েরা এখন আমার কাছে কিছুদিন থাকুক। আমি ত বাঁজা মানুষ। আমার কোন অসুবিধা হইবে না। ছেলেরা ভালই আছে। কোন ভাবনা করিও না। ইতি…"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ছুটির দরখাস্ত করিলাম। কপালগুণে আমার সাহেবও বদলি হইয়া গিয়াছিলেন। ছুটি সুতরাং মঞ্জুর হইল না।

২

দুই মাস পরে।

সম্বলপুরবাসিনী শ্যালিকার আর একখানি পত্র পাইলাম। তিনি অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছেন—

"প্রভা সতীলক্ষ্মী ভাগ্যবতী ছিল। সে গেছে, বেশ গেছে। জাজ্জ্বল্যমান সংসারে স্বামী ছেলেপুলে সব রেখে গেছে। কিন্তু তোমার তা বলে সংসারটা ছারখার করা ত ভাল দেখায় না। উচিতও নয়। আমার কথা শোনো। আবার বিয়ে কর তুমি।...এখানে একটি বেশ ডাগর-ডোগর মেয়ে আছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়—বলো, সম্বন্ধ করি। আমার ত মেয়েটিকে বেশ পছন্দ। তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।"—ইত্যাকার নানারূপ কথা

সাত দিন ভাবিয়া—অর্থাৎ এক টিন চা ও পাঁচ টিন সিগারেট নিঃশেষ করিয়া—আমি এই চিরন্তন সমস্যার যে মীমাংসা করিলাম তাহা মোটেই অসাধারণ নয়। সেজদিকে যে পত্র দিলাম তাহা অংশতঃ এইরূপ—

"বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্বদাই মনে পড়ে। কিন্তু দেখ সেজদি, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর নির্ভর করে ত সংসার বসে নেই। সে আপনার চালে ঠিক চলছে ও চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবণ হওয়াটা শোভন হলেও সুযুক্তির নয়—এটা ঠিকই। তা ছাড়া দেখ, আমরা 'মা ফলেষু কদাচন' দেশের লোক। আর তোমরাও যখন বলছ—তখন আর একবার সংসারটা বজায় রাখার চেষ্টা করাই উচিত বোধ হয়। দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে আবার পছন্দ! তোমার হয়েছে তো?..."

ক্রমশঃ বিবাহের দিন স্থির হইল। সম্বলপুরেই বিবাহ। সেজদি বুদ্ধিমতী। লিখিয়াছেন—"ছেলেদের লাহোরে বড়দির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বাপের বিয়ে দেখতে নেই।" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

যথাকালে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরিয়া হপ্তাখানেকের ছুটি লইয়া সোজা রওনা হইয়া পড়িলাম। একাই। এ বিয়ের কথা কাউকে বলিতে আছে! কি ভাবিয়া গোঁফটা কামাইয়া ফেলিলাম। একে এই কালো মোটা চেহারা —তাহার উপর কাঁচাপাকা একঝুড়ি গোঁফ লইয়া বিবাহ করিতে যাইতে নিজেরাই কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

বিবাহ-বাসর।

ওই অবগুণ্ঠিতা চেলি-পরা মেয়েটিই আবার আমার সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে। প্রভাকেও একদিন এইভাবেই পাইয়াছিলাম—সে কোথায় চলিয়া গেল। আবার আর একজন আসিয়াছে। ইহার 'কিডনি' কেমন—কে জানে! নানারূপ এলোমেলো কথা মনে আসিতে লাগিল। প্রভার মুখ বারবার মনে পড়ে। ছেলেগুলো না জানি এখন কি করিতেছে!…মৃত্যুর পরও কি আত্মা সত্যি থাকে?…এ মেয়েটি বেশ বড়সড় দেখিতেছি—কিন্তু ভারি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে—একেবারে মাথা নীচু করিয়া। আচ্ছা প্রভার আত্মা যদি……গৃহস্বামি……গৃহস্বামি……

যন্ত্রচালিতবৎ বিবাহ-অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটি কিছুতেই ঘোমটা খুলিল না। সেজদি বলিলেন—ভারি লাজুক। আপাদ-মস্তক মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। আমিও ঘুমাইলাম। সেজদি লোক জমিতে দেন নাই। তা ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহে কে আর আমোদ করিতে চায়? মেয়েটির আপন বলিতে কেহ ছিল না। পরের বাড়িতে মানুষ। সেজদির বাড়িতেই বিবাহ—বলিতে গেলে সেজদিই কন্যাকর্তা। সুতরাং বিবাহ-উৎসব জমে নাই।

••• ••• •••

জমিল ফুলশয্যার রাত্রে!

বক্ষে অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি আমার ছয়টি সন্তান ও আরও একটি নবজাত শিশু লইয়া স্বয়ং প্রভা খাটে বসিয়া! স্বপ্ন দেখিতেছি নাকি?

প্রভা কহিল—"ছি, ছি, সেজদিরই জিৎ হ'ল!"

"মানে?"

"মানে আবার কি? এবার ছেলে হওয়ার সময় ভারি কষ্ট হয়েছিল। অপরাধের মধ্যে সেজদিকে বলেছিলাম যে আমি ম'লে ওঁর ভারি কষ্ট হবে। সেজদি বললে—হাতি হবে! তিনমাস যেতে না যেতে ফের বিয়ে করবে। আমি বললাম—ককৃখনো না। তারপর বাজি রেখে সেজদি আর বিনোদ মিলে এই ষড়যন্ত্র! আমি শান্তিপুরেই ছিলাম। আজ এই সন্ধ্যেবেলা এসেছি। এসে দেখি সেজদিরই জিৎ। পাড়ার মাণ্‌কে ছোঁড়াকে ক'নে সাজিয়ে সেজদি বাজি জিতেছে। একশ'টি টাকা দাও এখন! ছি ছি—কী তোমরা! অমনি গোঁফটা কি বলে কামালে?"

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়।

পরদিন প্রভাতে সেজদির পাওনা চুকাইয়া দিয়াছি। এখন গোঁফটা উঠিলে যে বাঁচি!

সুবোধ ঘোষ

অকস্মাৎ যে-সব সাহিত্যিকের উল্কাবৎ অভ্যুত্থান হয় তাঁরা প্রায়ই বেশিদিন ধোপে টেকেন না। কিন্তু সুবোধবাবুই বোধ হয় এর প্রথম ব্যতিক্রম। কারণ আজও ইনি সগৌরবে নিজের আসন দখল করে বসে আছেন। অথচ এইত সেদিনের কথা, যখন ওঁর প্রথম তিন-চারটি গল্প বেরিয়ে বাংলার পাঠকসমাজের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিল। তার মধ্যে 'ফসিল্' 'শক্ থেরাপী' 'পরশুরামের কুঠার' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি লেখেন কম। যা লেখেন তা সাবধানে লেখেন। ভাষার বিদ্যুদ্দাম-দীপ্তি অনেক সময় তলোয়ার-খেলার মতই চমক লাগায়। ইনি কংগ্রেসী আদর্শে বিশ্বাসী এবং মহাত্মাজীর ওপর খুব ভক্তিমান। সম্প্রতি বাপুজীর একটি জীবনীও লিখেছেন। বাল্যকালে ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশে খুব ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং অনেকরকমের জীবন দেখেছেন, সেজন্য অভিজ্ঞতাও এঁর বিচিত্র। সাংবাদিক হিসেবেও খুব নাম করেছেন। বর্তমানে আনন্দবাজার-পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীর অন্যতম।

তিন অধ্যায়

অহিভূষণ হঠাৎ এসে বললো—'ভাই ভবানী, একটা কন্‌ফিডেন্সিয়াল টক ছিল তোর সঙ্গে।'

আড্ডার মাঝখানে বসে ছিলাম। বারীন তখন বলছিল—'কি আশ্চর্য, মেয়েটাকে মুহূর্তের জন্যও হাসতে দেখলাম না। লোকের দিকে একটু চোখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই। এই ধরনের মেয়েদের মতিগতি যদি একটু অ্যানালিসিস করে দেখ, তাহ'লে বুঝতে পারবে যে, তারা শুধু চায়…'

পুলিন বাঁড়ুয্যের মেয়ে বন্দনার কথা বলছিল বারীন। এই রকম একটা

অপ্রাসঙ্গিক অবস্থায় এসে অহিভূষণ বাধা দিল। আরও বেশি অপ্রসন্ন হয়ে উঠলাম, অহিভূষণ যখন বললো—'এখানে বলতে পারবো না ভাই, একটু ডিস্ট্যান্সে যেতে হবে।'

এই রকম বিশ্রী ভাবেই অযথা ইংরেজি বলে অহিভূষণ। ইদানীং আরও বেশি ক'রে বলে। অবশ্য আমরা জানি, অহিভূষণের লেখাপড়া ফোর্থ ক্লাসের চৌকাঠ পার হয়নি। সেই যে আট বছর আগে আমরা অকৃতী অহিকে একা ফোর্থ ক্লাসে রেখে সদলে থার্ডে চলে গেলাম, তারপর থেকে জীবনে সত্যিই ক্লাস হিসেবে ওর সঙ্গে এক হতে পারলাম না। অহি আজও যে আমাদের ক্লাবে ও আড্ডায় আসে সেটা তার নিজেরই আগ্রহ। আমরা ওকে কখনো চাইনি। চলে যেতেও অবশ্য স্পষ্ট করে কখনো বলি না। কিন্তু আমাদের আচরণে সেটা ওর বোঝা উচিত ছিল। অহি যেন আমাদের তাচ্ছিল্যগুলিকে একেবারেই গায়ে মাখে না। সব জেনেশুনেই সে আমাদের সঙ্গে মেশে। তার প্রতি আমাদের একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য অনাগ্রহ ও অরুণাকে সে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। অহি যেন আজও আমাদের ক্লাসটা ছাড়তে চায় না। শেষ বেঞ্চের এক কোণে, একটু পৃথক হয়ে, সবার পেছনে বসে থাকবে, তবু আমাদেরই সঙ্গে।

বলতে ভুলে গেছি, বারীনও সেই ফোর্থ ক্লাসেই ফেল করেছিল। আর পড়াশুনো না করে স্কুল ছেড়ে দিল। কিন্তু আজ আট বছর পরেও বারীন আর আমরা যেন এক ক্লাসেই আছি। বারীন কণ্ট্রাক্টারি করে, এরই মধ্যে বেশ কিছু, যাকে বলে, বেশ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে বারীন। কিন্তু অহি? অহি ঠিক তার উল্টো। অহির কথা একেবারে স্বতন্ত্র। বড় সাংঘাতিকভাবে ফেল করেছে অহি। বাইশ টাকা মাইনের একটি চাকরি করে। দুঃখটা আসলে ঐ বাইশ টাকায় বাঁধা দীনতার জন্য নয়। আসল কথা হলো চাকরিটাই। বড় নীচ নোংরা নগণ্য চাকরি। কখনো কোন ভদ্রলোকের ছেলেকে এ রকম

চাকরি করতে আমরা দেখিনি, শুনিনি।

খুব ভোরে ঘুম ছেড়ে বাইরে বেড়ানো যাদের অভ্যাস, তারাই শুধু অহিভূষণের চাকরির স্বরূপ জানে, কারণ তারাই ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখতে পায়। এক হাতে প্রকাণ্ড একটা খাতা, আর এক হাতে একটা লক্কড় সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে শহরের যত লেন আর বাইলেনের মোড়ে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে অহিভূষণ। ভোরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে সরুগলির মুখ থেকে এক এক করে চার পাঁচটি অদ্ভুত ধরনের মূর্তি এসে অহির কাছে দাঁড়ায়। খাতাটা খুলে অহি তাদের হাজিরা লেখে। নীচু স্বরে কয়েকটা কথা বলে অহি, কখনো বা বিরক্ত হয়ে ধমক দেয়। তারপরেই অহিভূষণের লক্কড় সাইকেল আবার আর্তনাদ করে ওঠে। আর একটা গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়ায় অহিভূষণ চাটুয্যে।

আমাদের এই ছোট শহরের ছোট মিউনিসিপ্যালিটির একজন কর্মচারী হলো আমাদের পরিচিত ও প্রাক্তন সহপাঠী অহিভূষণ। রাত্রি ভোর হতে না হতে, পাখির ঘুম ভাঙার আগেই মেথরেরা শহরের ময়লা পরিষ্কার করে। এক একটা দল বের হয় ঝাড়ু হাতে রাস্তা ঝাঁট দিতে। কয়েকটা দল বের হয় মাথার ওপর পুরীষবাহী বড় বড় টিনের টব নিয়ে। দু'চাকার ওপর পিপে বসানো একটা অদ্ভুত ধরনের গাড়ি আছে মিউনিসিপ্যালিটির। একটা বুড়ো বলদ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গাড়িটাকে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। পিপের গায়ে দু'সারি ফুটো আছে। খুব ভোরে উঠলেই দেখতে পাওয়া যাবে, পিপে-গাড়িটা ভ্রাম্যমাণ ধারাযন্ত্রের মত হেলে দুলে কঁকিয়ে কঁকিয়ে চলে যাচ্ছে, রাস্তার ধূলোর দৌরাত্ম্যকে শান্তিজল ছিটিয়ে শান্ত করে দিয়ে। আমাদের অহিভূষণের চাকরিটা হলো—এই সব তদারক করা। তারই জন্য বাইশটি টাকা মাইনে পায় অহি। লেখাপড়া শেখেনি, বাপ বেঁচে নেই, বাপের পয়সাও ছিল না। মা আছে, মায়ের অসুখও আছে। তা ছাড়া নিজের পেটের

দায় তো আছেই। সামর্থ্য নেই, যোগ্যতা নেই, তাই বোধ হয় এই সামান্য জীবনের দায়টুকু মেটাতে গিয়ে, উপায় খুঁজতে খুঁজতে একেবারে নরকের কাছাকাছি চলে এসেছে অহি। দুপুর বেলা যখন আদালতে দশটার ঘণ্টা বাজে, অর্থাৎ ঠিক যেসময়ে ভদ্রলোকের কাজের জীবন কলরব করে ওঠে, সেই সময়ে এক ভাঙা ঘরের নিভৃতে অহিভূষণের ক্লান্ত শরীর নিঃশব্দে ঝিমোয়। সূর্য উঠলে আমরা ঘরের বার হই। সূর্য উঠলে অহি ঘরে ঢোকে। আমরা কাছারী রোড দিয়ে গাড়ি ঘোড়া শব্দ ও জনতা ভেদ করে যাই জীবিকা অর্জন করতে। অহি ঘুরে বেড়ায় নির্জন নিস্তব্ধ ও অবসন্ন শেষরাত্রের অস্পষ্ট গলিঘুঁজির মোড়ে, ড্রেন পায়খানা ডাস্টবিন-সঙ্কুল একটা ক্লেদাক্ত জগতের চোরাপথে।

বিকেল বেলা অহিকে আরও দু'বার কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়। লক্কড় সাইকেলটার পিঠে সওয়ার হয়ে মাইল দেড়েক দূরে শহরের বাইরে গিয়ে শ্মশানঘাটের সিঁড়িতে একবার দাঁড়ায়। ডোমটার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, মড়া আর চিতার হিসাব নেয়। তার পরেই গিয়ে দাঁড়ায় খালের ধারে— ময়লা ময়দানের কাছে। দুটো ইনসিনারেটারের চিম্‌নি থেকে দগ্ধ পুরীষের দুর্গন্ধ ধূম বাতাস আচ্ছন্ন করে। অহির সাইকেলের শব্দে একটা অলস গৃধিনীর দল আবর্জনার স্তূপের আড়ালে চমকে ওঠে, বড় বড় পাখা ছড়িয়ে আকাশে উঠে চক্কর দিয়ে উড়তে থাকে। অহি দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। উড়ন্ত গৃধিনীর পাখার চঞ্চল ছায়া আর শব্দের নীচে দাঁড়িয়ে এইখানে সূর্যাস্ত দেখে অহিভূষণ।

কথায় কথায় অহি বলে—এমন চাকরি থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? চাকরির ব্যাপারে কত ভাবে ফাঁকি দিচ্ছে, অহি সেই সব বিবরণ বেশ ফলাও করে মাঝে মাঝে শোনায়। আমাদের একেবারে নিঃসংশয় করবার জন্য অহি প্রায়ই বলে—'সত্যি বলছি ভবানী, প্রাণ গেলেও আমি গলি-ফলির

ভেতর ঢুকতে পারবো না।'

বারীন প্রশ্ন করে—'ময়লা ময়দানে যেতে হয় না তোকে ?'

অহি—'কস্মিন্‌কালেও না। আমি দূরে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েই কাজ দেখি।'

আমি জিজ্ঞাসা করি—'চিতে গুনতে যাস্ না আজকাল ?'

অহি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়—'মোটেই না! ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হিসাব নিই, শ্মশানে নামি না।'

একটু চুপ করে থেকে অহি আবার নিজে থেকেই একটু অস্বাভাবিক ভাবে গর্ব করে বলতে থাকে—'কী ভেবেছে মিউনিসিপ্যালিটি, বাইশটে টাকা মাইনে দেয় বলেই বামুনের ছেলেকে দিয়ে যাচ্ছেতাই করিয়ে নেবে ?'

আমরা প্রায় একসঙ্গে সবাই হেসে ফেলতাম। অহি একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতো, আমাদের হাসির অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতো।

অহির কথা নিয়ে বেশিক্ষণ মাথা ঘামাবার মত উৎসাহ কারও ছিল না। কথাপ্রসঙ্গে এক-আধটু যা হলো তাই যথেষ্ট। পরমুহূর্তেই আমরা উৎকর্ণ হয়ে উঠতাম, কারণ বারীন একটি সুস্বাদু কাহিনী পরিবেষণ আরম্ভ করে দিয়েছে। —'কি বলবো ভাই, আজকাল যা-সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে ললিতা! ফিক্ ফিক্ করে হাসে। ইয়া বড় বড় চোখ করে বেপরোয়া তাকিয়ে থাকে। হাবভাবে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে যে···কিন্তু আমি ভাই ভিড়তে চাই না।'

অহি বেফাঁস রসিকতা করে বসে—'তাহ'লে আমি ভিড়ে যাই, কি বল ?'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বন্ধ করে দিয়ে, মুখটা কঠোর করে অহির দিকে তাকিয়ে বারীন বলে—'তোমাকে এর মধ্যে ফোড়ন দিতে বলেছে কে ?'

এসব কুৎসার অম্বলে ফোড়ন সচরাচর আমরাই দিয়ে থাকি। অহি

কথনো মন্তব্য করতো না, ভদ্রবাড়ির তরুণীদের নামে কোন রসাল প্রসঙ্গ উঠলেই অহি বরং নিস্পৃহ ভাবে চুপ করে থাকতো। অতি পরিচিত এই সব প্রতিবেশিনীদের কাহিনীগুলিও ওর কাছে আজ যেন রাণী পরী আর দেবীর রূপকথার মত এক অতিদূর অলীক দেশের গল্প হয়ে গেছে। এইসব প্রসঙ্গে তাই অহিকে কথনো উৎসাহ প্রকাশ করতে আমরা দেখিনি। এই প্রথম হঠাৎ ভুল করে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বারীনও তাকে সাবধান করে দিল। চুপ করে রইল অহি। আর কথনো তার এ ভুল হয়নি। অহি এই ভাবেই তার অধিকারের সীমা আমাদের ধমক খেয়েই বুঝে ফেলে। যেন মাথা পেতে ত্রুটি স্বীকার করে নেয়। মেলামেশার দিক দিয়ে আমাদেরই আড্ডার ছেলে অহিভূষণ, আমাদেরই প্রাক্তন সহপাঠী, এক শহরের ছেলে। কিন্তু মনের রুচির দিক থেকে সে যে ভিন্ পাড়ার লোক, সে তত্ত্ব তাকে আমরা কারণে অকারণে বুঝিয়ে দিই। অহিও বুঝতে পারে।

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম ছিল। সেদিনের আড্ডায় বারীন সেই মেয়েটির নামে যা-খুশি-তাই বলছিল। মেয়েটির নাম বন্দনা। এই বন্দনারই মতিগতি একটু অ্যানালিসিস করে বারীন বুঝতে পেরেছে যে···।

বন্দনার নামে যখন কথা উঠতো, তিলমাত্র ভদ্রতার সঙ্কোচ বা শ্রদ্ধার বালাই কেউ অনুভব করতো না। বিশেষ করে বারীন। বন্দনাকে একটু ভাল করেই আমরা চিনে ফেলেছি। তাই অবিশ্বাস করার মত কোন প্রশ্ন থাকতে পারে, কষ্ট করে এতটা ভাববার কোন দরকার ছিল না আমাদের। অন্য কোন মেয়ের সম্পর্কে বারীনের রসনার অসংযমে হয়তো আমরা বাধা দিতাম, প্রশ্ন করতাম, সন্দেহ প্রকাশ করতাম। কিন্তু বন্দনা ঠিক সেই সব মেয়েদের দলে নয়, তাদের বাইরে, অনেক নীচে। যদিও আমাদেরই পরিচিত পুলিন বাঁড়ুয্যের মেয়ে বন্দনা। বন্দনার চারিত্রিক রহস্য নিয়ে সবাই আপ্-সোস করতো, কটূক্তি করতো, ঘৃণায় ছটফট করে উঠতো। কথনো বা এক-

ঝাঁক রসিকতার মাছি ভন্ ভন্ করে উঠতো। অহিও হেসে হেসে মাথা নেড়ে মন্তব্য করতো—ডোবালে ডোবালে, ভদ্রসমাজের নাম ডুবিয়ে ছাড়লে ছুঁড়ি।

শুধু এই একটি ক্ষেত্রে অহির অধিকারের সীমা স্মরণ করিয়ে দেবার কথা আমাদের কারও মনে হতো না। এক্ষেত্রে অহির অধিকার যেন পরোক্ষভাবে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম। বন্দনাকে কুৎসা করার এই সমানাধিকার পেয়ে অহি যেন ধন্য হয়ে যেত। মুখ খুলে রসিকতা করতো অহি। এই একটি সুযোগকে বার বার সদ্ব্যবহার করে অহি উপলব্ধি করতো—সে আমাদেরই মধ্যে একজন!

শুধু সন্ধ্যে হলে অহি আমাদের আড্ডায় একবার আসে। না এসে পারে না। নেশাড়ে মানুষ যেমন সন্ধ্যে হলে একবার শুঁড়ির দোকানে না গিয়ে পারে না, অহির অবস্থাটা বোধ হয় সেই রকম। সেই কবে আট বছর আগে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো অহিভূষণ, একই রিং-এ বক্সিং করতো, একই প্যারালাল বার-এ পীকক হতো—সেই পুরানো নেশা আজও বোধ হয় ছাড়তে পারেনি অহি। একটু বেশি ধোপ-দুরস্ত কাপড়চোপড় প'রে সন্ধ্যে বেলা আমাদের আসরে দেখা দেয়। আমাদের বিদ্রূপ বিরক্তি অশ্রদ্ধা—সবই অকাতরে সহ্য করে। ছেলেবেলায় অহির এক একটা স্ট্রেট লেফ্ট্ ও ডান হাতের পাঞ্চ্ কতবার আমাদের ছিট্কে বের করে দিয়েছে রিং থেকে বাইরে—তিন হাত দূরে। আজ যেন সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছে অহি। আমাদের সব অশ্রদ্ধার আঘাত সহ্য করে, সাধ করেই পরাজিত হয়ে আমাদের রিং-এর মধ্যে থাকতে চায় অহিভূষণ।

—'একটু ডিস্ট্যান্সে যেতে হবে ভাই, প্রাইভেট টক আছে।'

অহির অনুরোধ শুনে উঠে গিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়ালাম। বললাম—'কি বলছিলি, বল্।'

অহি—'তোর কাকাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে ভাই, যেন আমার নামটা কেটে না দেন।'

আমার কাকা হলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। কাকা একটু বেশি পরোপকারী ও সদয় মানুষ। তাই আশ্চর্য হলাম, অহিভূষণের মত এক গরীব কর্মচারীর চাকরিটা খাবার মত উৎসাহ তাঁর কেন হবে?

বললাম—'তোকে বরখাস্ত করার কথা হয়েছে নাকি?'

—'বরখাস্ত নয় ভাই, আমার নামটা কেটে দিচ্ছেন।'

—'বরখাস্ত নয়, নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে, কথাটার অর্থ বুঝতে পারছি না, অহি। ঠিক করে বল্।'

—'তুই তো জানিস, আমার পোস্টটার নাম ছিল···'

—'না, জানি না।'

—'আমি হলাম এ সি এস্।'

—'সেটা আবার কি জিনিস?'

—'আমি হলাম অ্যাসিস্টেণ্ট কন্‌জারভেন্সি সুপারভাইসার। পাঁচ বছর ধরে এই নাম চলে আসছে। আজ হঠাৎ তোর কাকা চেয়ারম্যান হয়ে কোথায় একটু উপকার করবেন, না উঠে পড়ে লেগেছেন আমার নামটার পেছনে। নামটা বদ্‌লে দিচ্ছেন।'

—'তাতে তোর ক্ষতিটা কি? মাইনে তো আর কমলো না।'

—'না মাইরি, সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জার নাম সহ্য করতে পারবো না, মাইরি। তুই বল্ ভাই, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে···'

—'তোরই বা এত নাম নিয়ে মাথাব্যথা কেন? তোর আগে যে লোকটা সর্দার ছিল, সেই মান্‌কিরাম যে তোর চেয়েও বেশি মাইনে পেত।'

অহির মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। একটু অভিমান করেই যেন বললো—'শেষে তুইও মান্‌কিরামের সঙ্গে আমার তুলনা করলি, ভবানী?'

একটু রাগ করে বললাম—'মানকিরাম তোর চেয়ে ছোট কিসে রে অহি? মানুষকে যে খুব ছোট করে দেখতে শিখেছিস্, অথচ…'

অহি চুপ করে তাকিয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না। এইভাবেই সামান্য একটা ধমকে তার সমস্ত বিদ্রোহ শান্ত হয়ে যায়। আজও চুপ করে আমার ধমক আর মন্তব্যটাকেই মেনে নিল অহি।

বাড়িতে ফিরে এসে অহির কথাটা কেন যেন বারবার মনে পড়ছিল। কাকাকে হেসে হেসে বললাম—'অহি নামে আপনাদের মিউনিসিপ্যালিটির একজন প্রকাণ্ড অফিসারের ডেসিগনেশানটা নাকি আপনি খারিজ করে দিচ্ছেন?'

কাকা উত্তর দিলেন—'হুঁ, ঐ নামটা আইনত চলে না। ঐ নাম থাকলে মাইনে ও গ্রেড আইন-মাফিক করতে হয়। তা ছাড়া, তাহ'লে অহির চাকরিও থাকে না। কেননা, অ্যাসিস্টেণ্ট কন্জারভেন্সি সুপারভাইসার রাখতে হলে ট্রেনিং-নেওয়া পাস্-করা লোক চাই। অহির তো সে সব যোগ্যতা নেই।'

—'কিন্তু সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জার নামটা সত্যিই বড় বিশ্রী। গরীব হলেও ভদ্রলোকের ছেলে তো, অহির মনে বড় লেগেছে।'

কাকা দুঃখিত হয়ে বললেন—'কি করবো বল্? কোন উপায় নেই। অহির মাইনে তিন টাকা বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আছে আমার এবং বাড়িয়ে দেবো ঠিক, কিন্তু ঐ পোস্টটা, ও ভাবে ঐ নাম দিয়ে রাখবার উপায় নেই। আইনে বাধে।'

পরদিন সকাল বেলা অহির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঘরে বসে অহির গলার স্বর শুনতে পেয়ে আবার ঘটনাটা নতুন করে মনে পড়ে গেল। কাকার সেরেস্তায় এসে অহি কাকাকে সেই অনুরোধ নিয়েই আবার পাকড়াও করেছে।

অহি বলছিল—'আমার এই পোস্টের নামটা বদ্‌লে দেবেন না কাকা-বাবু।'

কাকা বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—'কেন হে কাকাবাবু ?'

কাকার উত্তরটার মধ্যে এবং গলার স্বরে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপর আভাষও ছিল যেন। অহির মুখে এই 'কাকাবাবু' ডাক হয়তো তিনি পছন্দ করলেন না।

কাকার সেরেস্তার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু আড়াল থেকে উঁকি দিলাম। দেখলাম, অহি দাঁড়িয়ে আছে। অহির নোংরা খাকি হাফ-প্যাণ্ট আর বগলদাবা হাজিরা-খাতাটা ওর সর্দারির সাজটা নিখুঁত করে তুলেছে। অহির মুখটা আজও কিন্তু সেই পুরানো ধাঁচেই রয়ে গেছে। নাক আর চিবুকে সেই দক্ষিণী নটরাজের ব্রঞ্জের মত ছাঁদটা আজও মুছে যায়নি। গড়নটা কঠিন, কিন্তু ছাঁদটা কোমল। এই অহি একদিন আমাদের স্কুলে প্রাইজের অনুষ্ঠানে কপালে রক্তচন্দনের তিলক কেটে মেঘনাদ সেজেছে, আবৃত্তি করেছে। কি সুন্দর ওকে মানাতো !

আপাতত দেখছিলাম, অহিভূষণ কাকার প্রশ্নে একটু কাঁচু-মাচু হয়ে বললো—'আজ্ঞে আমি বল্‌ছিলাম···'

কাকা—'কিছু বলতে হবে না তোমাকে। আমি যা করেছি তোমার ভালর জন্যই করেছি। হয়তো মাইনে কিছু বাড়িয়ে দেব, যদি······'

অহি—'মাইনে বাড়াবার জন্যে আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না, স্যার। কিন্তু আমার পোস্টের নামটা যদি আপনি একটু অনুগ্রহ করে···!'

কাকা আমার পরম দয়ালু মানুষ, কিন্তু ভিক্ষে করবার এত বস্তু থাকতে কেউ এসে পোস্টের সম্মান ভিক্ষে করবে, সে-ঔদ্ধত্যকে বোধ হয় পৃথিবীর কোন দয়ালু প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কাকা হঠাৎ ভয়ানক ভাবে চটে গিয়ে চোখ পাকিয়ে হিন্দী করে বলতে লাগলেন—'মাইনে বাড়ানোর দরকার

নেই, না? তবে চাকরিটারই বা কি দরকার হে সর্দার? খুব বাড় বেড়েছে দেখছি!'

—'আজ্ঞে না হুজুর!' সঙ্গে সঙ্গে এক সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জারের মুখ দীনতায় সঙ্কুচিত হয়ে আর্তস্বরে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে উঠলো।

কাকা বললেন—'যাও, খাড়া মৎ রহো।'

অহি আজকাল আর আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় প্রতিদিন আসে না। তবে আসে মাঝে মাঝে, একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। অহি বোধ হয় আমাদের অন্তরঙ্গতার সীমা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে।

অহির আচরণের এই পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করলো। আমিই একদিন সকলকে রহস্যটা ফাঁস করে দিলাম—মিউনিসিপ্যালিটি অহিকে সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জার নাম দিয়েছে, অ্যাসিস্টেন্ট কন্‌জারভেন্সি সুপারভাইসার নামটা রদ করে দেওয়া হয়েছে, তাই অভিমান হয়েছে অহির। কাকার কাছে এই নিয়ে তর্ক করতে গিয়েছিল। কাকা ধমক দিয়ে খেদিয়ে দিয়েছেন।

এর পরের যেদিন অহি আড্ডাতে এল, সকলে মিলে বেশ মিঠেকড়া করে ধম্‌কে দিল—'তোর আবার এইসব ঘোড়ারোগ কেন রে অহি? মাইনের পরোয়া করিস্ না, তাই নিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে মুখের ওপর তর্ক করতে যাস্! সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জারের কাজটা করবি, অথচ বললে তোর একেবারে মাথা কাটা যাচ্ছে। তুই কি ভাবছিস্ নিজেকে, তুই একটা ভয়ানক রকমের অফিসার?'

ধমক খেয়ে প্রতিবাদ করে না অহি। অভিযোগ স্বীকার করে নেয়। আজও অহি নিরুত্তর থেকে অভিযোগ স্বীকার করে নিল। কিন্তু বলিহারি ওর ধৈর্য আর সহ্যগুণ! শুধু আমাদের আড্ডার স্পর্শটুকুর লোভে ও সব সহ্য করতে পারে।

পর পর অনেকদিন পার হয়ে গেল, অহি আর আড্ডায় আসে না। হঠাৎ একদিন হাসতে হাসতে ক্লাবের বৈঠকে দেখা দিল অহি।

বীরভুমের এক গাঁয়ের এক গরীব স্কুলমাস্টারের মেয়ের সঙ্গে আমাদের অহির বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। অহি নিজে গিয়ে মেয়েকে দেখে এসেছে। আমাদের কাছে একটা সলজ্জ আনন্দে সব কথা বললো অহি— মেয়েটি দেখতে বেশ, ম্যাট্রিক ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে, গানটানও গাইতে পারে।

অহি যেন তার জীবনের এক নতুন সূর্যোদয়ের কথা বলে চলে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারেনি যে, কী বিসদৃশ, কী অশোভন, কী অন্যায় কুকাণ্ডের একটি বার্তা সে আমাদের কানের কাছে ছেড়ে দিয়ে গেল। আমাদের মনের শান্তি নষ্ট হলো।

আমরা বুঝলাম, কত বড় ভাওঁতা দিয়ে এক ভদ্রলোকের মেয়ের সর্বনাশ করতে চলেছে অহি। বেচারী স্কুলমাস্টার কখনো কল্পনাও করতে পারেনি যে, এক সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জারের হাতে তাঁর মেয়েকে তিনি সঁপে দিতে চলেছেন। তিনি হয়তো শুধু জানেন, অ্যাসিস্টেণ্ট কন্‌জারভেন্সি সুপারভাইসার নামে এক কর্‌করে অফিসারের সঙ্গে তাঁর মেয়ের……।

সমাজের একটা স্বাভাবিক আত্মরক্ষা করার শক্তি আছে। সেদিনই দু'পাতা চিঠি লিখে সব ব্যাপার আমরা জানিয়ে দিলাম স্কুলমাস্টার ভদ্র-লোককে। অহিও তিন দিন পরে বীরভূমের এক গেঁয়ো ডাকঘর থেকে টেলিগ্রাম পেল—বিয়ের প্রস্তাব বাতিল।

আমাদের যা করবার সব গোপনেই করেছিলাম। অহি কি বুঝলো, তাও আমরা জানি না। কিন্তু অহি আর আমাদের আড্ডায় এল না। এক মাসের মধ্যে নয়, এক বছরের মধ্যে একবারও নয়। এতদিনে সত্যি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অহি।

মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বোধ হয় অনেক দিন আগে থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে

গিয়েছিল অহি। শুধু ধোপদুরস্ত কাপড় প'রে জোর করে ভদ্রলোক সাজবার চেষ্টা করতো। অল্পদিনের মধ্যে আমরা দেখলাম, হ্যাঁ খাঁটি সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জার বটে অহি। হাজিরা খাতা বগলে নিয়ে গলিতে গলিতে নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়ায়, শ্মশানের চড়ায় নেমে চিতা গুনে আসে, ময়লা ময়দানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রেঞ্চ কাটায়। ড্রেনের পাশে বসে মেরামত তদারক করে। নোংরা খাকি হাফ-প্যাণ্ট প'রে ক্লেদাক্ত পৃথিবীর চিহ্নিত পথে আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে চ'রে বেড়ায় অহি—লক্কড় সাইকেল আর্তনাদ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুলিনবাবু আর বন্দনা ঠিক এই ধরনের সমস্যাকেই একবার জটিল করে তোলবার চেষ্টা করলো।

দেনা দৈন্য আর বেকার অবস্থায় জীবনের বার আনা ভাগ সময় পণ্ড করে দিয়ে পুলিন বাঁড়ুয্যে শেষকালে জুতোর দোকান খুলেছিলেন। আমরা দেখতাম, পুলিনবাবুর দোকানে মেজের ওপর তিন চার জন মুচি সকাল দুপুর সন্ধ্যা জুতো সেলাই করে। একটা কাঁচের আলমারি ছিল দোকানে, তার মধ্যে নতুন চামড়ার বাণ্ডিল সাজানো—ক্রোম, উইলো-কাফ, কিড আর শ্যামোয়া। দোকানঘরের মধ্যেই কিছুটা স্থান ভিন্ন ক'রে, একটা ভাল মেহগনি টেবিল আর চেয়ার নিয়ে বসে থাকতেন পুলিনবাবু। টেবিলের পাশে আবার একটা সুন্দর রঙীন পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে বসলে মুচিদের আর ঠিক পাশাপাশি বা মুখোমুখি দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ রঙীন পর্দাটা যেন পুলিনবাবুর মনের একটা সতর্ক ও জাগ্রত শ্রেণীমর্যাদার প্রতীকের মত ঝুলতো। মুচিদের কর্মভূমি থেকে তিনি যেন স্পষ্ট করে তাঁর জীবনের আসরটুকু সযত্নে ভিন্ন করে রাখতেন। শত হোক্, পরলোকগত ত্রৈলোক্য পণ্ডিতের নাতি তো! সাত-পুরুষের কৌলিক চেতনাকে একটা উপার্জনের

দায়ের সঙ্গে একাকার করে দিতে পারেন না তিনি। তিনজন মুচির মধ্যে এক-জনকে তিনি মিস্তিরি ব'লে ডাকতেন। আলমারি থেকে চামড়া বের করে মাপ মত কেটে কেটে মুচিদের দেওয়া, খদ্দেরের পায়ের তলায় কাগজ পেতে মাপ এঁকে নেওয়া ইত্যাদি সব কাজ মিস্তিরিই করে। জুতোর দোকানের জুতোত্বর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না পুলিনবাবু, তাঁর সম্পর্ক শুধু দোকানত্বের সঙ্গে। এর চেয়ে বেশি নীচে নামতে পারেন না পুলিনচন্দ্র বাঁড়ুয্যে।

এই পুলিনবাবুর মেয়ের নাম বন্দনা। এই শহরের স্কুলেই পড়েছে, এপাড়া আর ওপাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মিশে কোনকালে মহিলা সমিতির বাৎসরিকীতে অভিনয় করেছে। চার বছর আগের কথাই ধরা যাক, আমার ভাগ্নীর বিয়েতে বন্দনা একাই গান গেয়ে বাসর জমিয়েছে। বন্দনার স্কুল-বান্ধবীরা অনেকেই আজ আর বাপের বাড়িতে নেই; শ্বশুরবাড়ি থেকে তারা মাঝে মাঝে যখন আসে, সবারই সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় তাদের। শুধু দেখা হয় না বন্দনার সঙ্গে। বন্দনা আজ সেই পুরাতন সখীত্বের বৃত্ত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বন্দনার খোঁজ বড় কেউ করে না। বন্দনা এখন কী বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সবাই জানে সে কথা। সেই সখীত্বের আগ্রহ দূরে থাক্, তাদের মনের দিক দিয়ে অস্পৃশ্যতা গোছের একটা বাধা বন্দনাকে আজ একেবারে অস্পষ্ট করে দিয়েছে।

হাসপাতালে কি-একটা কাজ করছে বন্দনা। বন্দনার মা অবশ্য লোকের কাছে বলেন—নার্সের কাজ। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? বন্দনা তো নার্সবিদ্যা পাশ করেনি। যাই হোক্, এতটা বাড়াবাড়ি পুলিন বাঁড়ুয্যের উচিত হয়নি। জীবনে টাকার প্রয়োজন কার না আছে? কিন্তু তাই ব'লে সব ভদ্রআনার সংস্কার অমান্য করে, সমাজের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির তোয়াক্কা না করে, রুচি-অরুচির বালাই না রেখে, শুধু কাজ আর পয়সাকে শ্রেষ্ঠ করে

তোলা মানুষের লক্ষণ নয়। এ'কে জীবিকা-অর্জন বলে না, এটা হলো জীবনকে বিকিয়ে দেওয়া। পুলিন বাঁড়ুয্যে খুবই গরীব সন্দেহ নেই। তাঁর গরীবত্বের জন্য অবশ্য আমাদের সবারই সমবেদনা আছে। কিন্তু গরীবত্ব ঘোচাবার যে পথ তিনি বেছে নিলেন, সেই পথটাকে কেউ সম্মান করবে না।

পুলিনবাবু বোধ হয় তাঁর ভবিষ্যৎটা বুঝতে পারেননি, নইলে এতটা স্পর্ধা তাঁর হতো না। কিন্তু অতি অল্পদিনেই তিনি বুঝলেন, একেবারে মর্মে মর্মে বুঝলেন।

কাকা একদিন আমাকে ডেকে বললেন—'হ্যাঁ রে ভবানী, পুলিন-চামারের দোকানে জুতো-টুতো কেমন তৈরি করে? বেশ ভাল?'

কাকা অক্লেশে যে কথাটা বললেন, তাতেই হঠাৎ একটা শক্ পেলাম যেন। আজ এক বছরের মধ্যে পুলিন বাঁড়ুয্যে কাকার কাছে কত সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মে পুলিন-চামার হয়ে গেছে!

বিব্রত ভাবে উত্তর দিলাম—'হ্যাঁ, ভালই তৈরি করে।'

কাকা—'তাহ'লে এবার পূজোর সময় পুলিন-চামারকেই অর্ডার দিস্।'

কথাটা যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। ঠাট্টা করে নয়, বেশ সহজভাবেই সকলে পুলিন চামার কথাটা ব্যবহার করে। পুলিনবাবুও নিশ্চয় স্বকর্ণে কথাটা শুনেছেন। এখন বুঝুন তিনি, এই নতুন উপাধির গৌরব প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে উপভোগ করে প্রায়শ্চিত্ত করুন।

জুতোর অর্ডার দিতে গিয়ে দেখলাম, ক'মাসের মধ্যে আশ্চর্য রকমের বদ্‌লে গেছেন পুলিনবাবু। এক বছর আগেও আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন। আজ আমাকে 'আপনি' করে বলেন। আলমারি খুলে নানারকম চাম্‌ড়া বের করে দেখালেন। একজোড়া অক্সফোর্ড হান্টিংএর দরকার ছিল আমার। পুলিনবাবু খুশি হয়ে আমার পায়ের তলায় একটা কাগজ পাতলেন,

পেন্সিল দিয়ে মাপ এঁকে নিলেন। ভয়ানক রকম একটা অস্বস্তির মধ্যে আমার পা-টা সিরসির করে উঠলো। যেন একটা অপরাধ করছি, মনের কোণে এইরকম একটা দুর্বলতা নিঃশব্দ গঞ্জনার মত পীড়া দিতে লাগলো। এইরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, পুলিনবাবু আমার পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে জুতোর মাপ নিচ্ছেন। পুলিনবাবুর হাতের পেন্সিল এক অপার্থিব তুলির মত সুড়সুড়ি দিয়ে আমার পায়ের পাতার চারদিকে ঘুরছে। আমি দেখছিলাম, প্রৌঢ় পুলিনবাবুর কাঁচা-পাকা চুলে ভরা মাথাটা আমার হাঁটুর কাছে হেঁট হয়ে আছে।

এর পরেও দেখেছি, সেই মেহগনি টেবিল চেয়ার আর রঙীন পর্দা নেই। মিস্তিরি নেই। পুলিনবাবু মেজের ওপর জুৎ করে বসে নিজেই কাঁচি দিয়ে হিসেব মত চামড়া কেটে মুচিদের দিচ্ছেন। পুলিন-চামারের দোকান সত্যিই সার্থক হয়ে উঠেছে এতদিনে।

. বন্দনাকেও আমরা প্রায়ই দেখতে পেতাম, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বা রিক্সায় চড়ে হাসপাতালে যায়। বারীন সবচেয়ে বেশি চটে যেত বন্দনার সাজসজ্জার নিষ্ঠা দেখে। নার্সদের অ্যাসিস্টেণ্ট, কুড়ি টাকা মাইনে, তার জুতো শাড়ি আর ব্লাউজের এতটা বাহার একটু বিসদৃশ ঠেকে বৈকি! তার ওপর আবার মাঝে মাঝে রিক্সায় চড়ে! আমরা অবশ্য বন্দনার পক্ষ নিয়ে কখনো-কখনো বারীনকে প্রতিবাদ করতাম—একটু রিক্সাতে চড়লোই বা! এতটা পথ এই দুপুরের রোদে চলাফেরা করা একটা মেয়ের পক্ষে কষ্টকর নয় কি?

বারীন একেবারে ক্ষেপে উঠতো—থাক্ থাক্, আমাকে আর শেখাতে এস না কেউ। জমকালো শাড়ি আর রিক্সার পয়সা যে এমনিতেই হয়, সে তত্ত্ব আমি বুঝি।

পথে বন্দনার সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করেছি,

বারীন আমাদের সঙ্গে থাকলে বন্দনা কখনো ভুলেও চোখ তুলে তাকাতো না, একটু সঙ্কুচিত হয়ে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিত। কখনো বা চকিতে মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠতো, যেন হঠাৎ ভয় পেয়েছে। বারীন আবার চটে উঠে বলতো —ঠিক এই, এই ধরনের হাবভাব যেসব মেয়েদের দেখা যায়, যারা ইচ্ছে করেও হাসতে পারে না, চোখ তুলে তাকাতে পারে না, তাদের মতিগতি একটু অ্যানালিসিস করলেই বুঝতে পারবে যে, তারা শুধু চায়···!

পুলিনবাবু তো এরই মধ্যে দমে গিয়ে একেবারে অমানুষ হয়ে গেছেন। কিন্তু পুলিন-গিন্নী দম্‌বার পাত্রী নন। যার স্বামী জুতো বেচে, মেয়ে সদর হাসপাতালে কে-জানে-কি করে, তাকে আজও একটু লজ্জিত হতে দেখিনি। যে-কোন পরিচিতা প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা হলে অলোপক্রমে একবার নিজের বংশগর্বটাকে বড় করে এবং আলাপিতাকে একটু নীচুঘর প্রমাণ না করে তিনি শান্ত হন না। প্রয়োজন হলে সৌজন্য ভুলে ঝগড়া করতেও কুণ্ঠিত হন না। যে সব বুড়ি নির্জলা একাদশী করতে পারে না, তাদের গায়ে পড়ে দুকথা শুনিয়ে দিয়ে আসেন। তাঁকে কেউ আমল দেয় না, তবু গায়ে পড়ে সবাইকে বিব্রত করেন। পুলিনবাবু আর বন্দনার ঠিক উল্টোটি হলেন পুলিন-গিন্নী। কোন্ বামুনের বাড়িতে একফোঁটা গঙ্গাজল নেই, কারা তিথিনক্ষত্র মানে না, কার মেয়ের অলগ্নে বিয়ে হয়ে গেল—সব খবর রাখেন পুলিন-গিন্নী এবং সবাইকে তার জন্য কটূক্তি করতে ছাড়েন না।

কবে এবং কি-করে পুলিন-গিন্নী বন্দনার একটা বিয়ের ব্যবস্থাও প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছেন, তা আমরা আগে জানতে পারিনি। কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। পাত্রের মামা বন্দনাকে আশীর্বাদ করতে এলেন এবং উঠলেন আমাদের বাড়িতে। পাত্রের মামা আমার কাকার বন্ধু। তাঁর কাছেই সব খবর শুনলাম—তাঁর ভাগ্নে অর্থাৎ পাত্রটি হলো পাটনার একজন প্রফেসার। বেশ চেহারা, মডার্ণ ও স্মার্ট ছেলে। পুলিন-গিন্নী বন্দনাকে

নিয়ে মাত্র দুদিনের জন্য পাটনা গিয়েছিলেন। মেয়ে দেখে পাত্র খুশি হয়েছে, পাত্রপক্ষ রাজী হয়েছে।

আমরা আশ্চর্য হলাম, কাকা আতঙ্কিত হলেন। তারপরে সবাই মিলে হাসতে লাগলাম। কাকার বন্ধুমশায় অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার?'

কাকা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন—'যাক্, আপনার ভাগ্য ভাল যে আমার এখানে উঠেছিলেন। আপনার ভাগ্নের জন্য অন্য সম্বন্ধ দেখুন। সব কথা পরে হবে। এখন বিশ্রাম করুন।'

রাত্রিবেলা ক্লাব থেকে ঘরে ফিরেই দেখি পুলিন-গিন্নী খুড়িমার সঙ্গে কথা বলছেন। বারান্দায় চেয়ার টেনে নিয়ে পুলিন-গিন্নীর কথাবার্তা শোনবার জন্য বসলাম।

পুলিন-গিন্নী যেন করুণভাবে আবেদন করছিলেন—'আপনি বিশ্বাস করুন দিদি, বন্দনা কখনো রোগীর বেডপ্যান-ট্যান ছোঁয় না। চাকরি করে এই মাত্র, তাই বলে ব্রাহ্মণের মেয়ে এতটা নোংরামি করতে পারে দিদি?'

একবার উঁকি দিয়ে পুলিন-গিন্নীর চেহারাটা দেখলাম। সে চেহারাই নয়। একটা প্রচ্ছন্ন আশঙ্কায় পুলিন-গিন্নীর মুখটা নিষ্প্রভ হয়ে আছে। যেন তাঁর সর্বস্ব ডুবতে বসেছে। খুড়িমার কাছে যেন একটা পরিত্রাণের প্রার্থনা বার বার কাতর ভাবে শোনাচ্ছিলেন পুলিন-গিন্নী।

খুড়িমা বললেন—'এ সব কথা আমায় বলে লাভ নেই। কর্তারা যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে।'

পুলিন-গিন্নী যেন ফুঁপিয়ে উঠলেন—'আপনি ভবানীর কাকাকে একটু বুঝিয়ে বলুন দিদি। ছেলের মামা ওঁর বন্ধু। আমি জানি, উনি হাঁ বললেই বিয়ে হবে, উনি না বললেই বিয়ে ভেঙে যাবে। উনি তো বন্দনাকে ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছেন, উনি জানেন বন্দনা কেমন মেয়ে।'

খুড়িমা বললেন—'তাই হবে। উনি যদি ভাল বোঝেন তবে···।'

পুলিন-গিন্নী ওঠবার আগে খুড়িমার হাত ধরে আর একবার অনুরোধ করলেন—'আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন দিদি।'

পুলিন-গিন্নী যাবার সময় কাকার বৈঠকখানার দরজার কাছে হঠাৎ কি ভেবে দাঁড়ালেন। কাকা তখন তাঁর বন্ধুকে এই কথা বোঝাচ্ছিলেন—'মেয়ে হলো হাসপাতালের জমাদারনী, এইরকম একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার ভাগ্নের বিয়ে দিতে চান ?'

পাত্রের মামাবাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব থেকে বললে—'না।'

কথাগুলি কানে যাওয়া মাত্র, পুলিন-গিন্নী ছট্‌ফট্ করে পালিয়ে গেলেন।

পুলিন-গিন্নীর ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল, এই ব্যাপারে বোধ হয় খুশি হলো সবাই। বারীন খুশি হলো এই কারণে যে, বন্দনার বিয়ে ভেঙে গেল। বন্দনার চেয়েও কত গরীবের মেয়ের বিয়ে হয়েছে বড়লোকের সঙ্গে। তার মধ্যে তো বিসদৃশ কিছু কেউ দেখেনি। গরীব বলে নয়, পুলিন বাঁড়ুয্যে আর বন্দনা, বাপ বেটী মিলে যা বেপরোয়া জুতোটুতো বেচতে আরম্ভ করলো—তারই ফল ফলছে একে একে। সমাজে কুলের প্রশ্ন হয়তো বড় পুরনো হয়ে গেছে, সে-সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এটা শীলের প্রশ্ন। এক সমাজে থাকতে হলে একই রকম শীলাচার মানতে হবেই। তার ব্যতিক্রম হলে সমাজ ক্ষমা করতে পারে না। আমরা কাল্‌চারের দিকটাই দেখছিলাম।

আমরা যে ভুল করিনি, তার প্রমাণ এই যে, বার বার দু'বার আমরা জিতে গেলাম। দু'বারই দুটো অন্যায় হতে চলেছিল, তাই সামান্য আঘাতে ভেঙে গেল। প্রথম অহি, দ্বিতীয় বন্দনা।

ঐ মানুষগুলিও কত সহজে ও সামান্য আঘাতে ভেঙে গেল। সর্দার-

স্ক্যাভেঞ্জার বলা মাত্র হুহু করে নেমে গেল অহি। পুলিনবাবুও তাই। চামার নামে শুধু একটা কথার কথায় যেন চামার হয়ে গেলেন। আসলে ওদের মনুষ্যত্বটাই স্ক্যাভেঞ্জার ও চামার হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। আমরা শুধু মুখোশটা খুলে দিয়েছি। আমাদের দোষ নেই। অপবাদ দিয়ে আমরা ওদের মিথ্যে করে দিয়েছি, একথা সত্য নয়। এবং যেটুকু শিক্ষা আমাদের বাকি ছিল, তাও অল্পদিনের মধ্যে চরম করে শিখিয়ে দিল বন্দনা।

হৃদয়ভেদী এক-একটি সংবাদ শুনতে পেলাম। সতু তাদের চাকরটাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গিয়েছিল। কম্পাউণ্ডার এসে দুটো টাকা ঘুষ নিয়ে গেল। কোথা থেকে বন্দনাও এসে নির্লজ্জ ও নিষ্কম্প স্বরে চাইলো—আমারও পাওনা আছে। একটা টাকা দিতে হবে। না দিলে···।

শশীদের বাড়িতে রোগিণী দেখতে লেডী ডাক্তার এসেছিলেন। তার সঙ্গে এসেছিল বন্দনা। লেডী ডাক্তার ফী নিলেন আট টাকা, বন্দনা পেলে এক টাকা। এই ন্যায্য পাওনা ছাড়া অক্লেশে হাত পেতে বক্‌শিস দাবী করে বসলো বন্দনা।—আরও কিছু দিতে হবে। শশীর বাবা কৃপণ মানুষ, বার বার আপত্তি তুললেন। বন্দনা জেদ ছাড়লো না। অপ্রস্তুত হয়ে অবাক্ হয়ে, শশী তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে আট আনা বক্‌শিস দিয়ে উদ্ধার পেল।

সতু আর শশীর কাছে এই কাহিনী আমরা শুনলাম। বুঝলাম সত্যিই মনেপ্রাণে জমাদারনী হয়ে গেছে বন্দনা, একটা চক্ষুলজ্জারও ধার ধারে না।

আমাদের মনেও আর কোন অনুশোচনা নেই। যা করেছি, ভালই করেছি। অহিভূষণকে বন্দনাকে ও পুলিনবাবুকে আমরা ঘৃণা করি না, কিন্তু সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জার জমাদারনী ও চামারকে আমরা আমাদের রুচিগত জীবনের আসরে ও বাসরে গ্রাহ্য করতে পারি না। কোন অন্যায় করিনি আমরা, ওদের কোন ক্ষতি করিনি আমরা, ওদের জীবিকাই ওদের কাল্‌চার নষ্ট করেছে। ওরা যা ওরা তাই। আমরা শুধু নিজেদের বাঁচিয়েছি।

অনেকদিন পরে সমস্যাটা হঠাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে গেল, কি-রকম যেন অদ্ভুত হয়ে উঠলো। ক্লাবে গিয়ে দেখলাম, টেবিলে দশ-বারোটা রঙীন লেফাপাবদ্ধ চিঠি পড়ে রয়েছে। বিয়ের চিঠি। অহির সঙ্গে বন্দনার বিয়ে। অহি আমাদের নেমন্তন্ন করেছে।

বিশ্রী রকমের একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কি অদ্ভুত কাণ্ড! অহির সঙ্গে বন্দনার বিয়ে! এই কি উচিত হলো! কিন্তু কেন উচিত নয়? এই বিয়ে সমর্থন করতে আনন্দ পাচ্ছি না। কিন্তু অসমর্থন করারও কোন হেতু খুঁজে পাচ্ছি না।

বারীন অযথা রেগে পাগল হয়ে উঠলো। বারীনের মতে এটা হলো অহির সর্বনাশ। বারীন চেঁচাতে লাগলো—'শত বাজে লোক হোক অহি, তবু বন্দনার মত জমাদারনীর সঙ্গে ওর বিয়ে হতে পারে না।'

সতু ও শশী তার চেয়ে জোরে চেঁচিয়ে উত্তর দিল—'বন্দনা যতই যা-তা হোক, কোন সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জারের সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়া উচিত নয়।'

দু'পক্ষেরই আচরণ বড় গর্হিত, হৃদয়হীনতার মত লাগছিল। ওদের নিয়ে আর মাথাব্যথা কেন? ওরা সরে গেছে, ওরা আমাদের কেউ নয়। ওদের জীবিকা ভিন্ন, তাই ওদের জীবনও ভিন্ন। আজ ওদের কথা নিয়ে এতটা বিতণ্ডা করা আমাদের পক্ষে অনধিকারচর্চা নয় কি?

কিন্তু কার মনে কি আছে কে জানে? পরের মঙ্গলের গরজেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সতু ও শশী পুলিনবাবুর কাছে বেনামী চিঠি ছাড়লো—যেন এ বিয়ে না হয়। এত ভাল মেয়ে আপনার, তার জন্য ঐ সর্দার-স্ক্যাভেঞ্জার পাত্র?

বারীন চার পাতা কাগজ ভরে অহিকে চিঠি লিখলো—সাবধান, নিজের সর্বনাশ ক'রো না। বন্দনার মত জমাদারনী মেয়েকে কি তুমি চেন না? যে সব মেয়ে ইচ্ছে করেও হাসতে পারে না, চোখ তুলে ভদ্রভাবে তাকাতে

পারে না, তাদের মতিগতি সম্বন্ধে একটু অ্যানালিসিস করলে দেখতে পাবে যে, তারা শুধু চায়...

তাহ'লে কি এ বিয়ে ভেঙে যাবে? এর আগে দু'দু'বার তাদের বিয়ে আমরা ভেঙেছি। আমাদের নাগালের মধ্যে তারা এসেছিল, তাই। আজ কিন্তু ঘটনা সে নিয়মের মধ্যে নেই। তারা নিজের পৃথিবীতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে? তবে কি কোন উপায় নেই?

অহির বিয়ের নিমন্ত্রণ-লিপি অর্থাৎ সেই রঙীন খামের চিঠিগুলি ক্লাবের টেবিলের ওপরেই পড়ে ছিল। কেউ আগ্রহ করে তুলে নেয়নি, সঙ্গেও নিয়ে যায়নি। কোন প্রয়োজন হয়তো ছিল না। প্রতি সন্ধ্যায় তাস খেলার সময় মাত্র দুটি করে সেই রঙীন চিঠির সদ্ব্যবহার করতাম। সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য কোন পাত্র তাড়াতাড়িতে পাওয়া যেত না, এহেন সঙ্কটে গোটা দুয়েক রঙীন খামই ভস্মাধারের কাজ করতো। তাস খেলা শেষ হলে ক্লাবের মালী এসে সতরঞ্চি গুটিয়ে রাখতো। ছাই-ঠাসা রঙীন খাম দুটো ছুঁড়ে ফেলে দিত।

অহি আর বন্দনার বিয়ে নিয়ে তর্জন-গর্জন ধিক্কার ভ্রূকুটি—সবই কেন জানি না হঠাৎ চাপা পড়ে গেল। অহির বিয়ের রঙীন আবেদনের চিহ্নগুলি চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও ঘটনাটা যেন কারও মনে পড়লো না। অহির বিয়ের মত একটা ঘটনা, একি নিজের তুচ্ছতায় চাপা পড়ে যাচ্ছে? মাত্র কদিন আগে যারা এই ব্যাপার নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তারাও যেন আজ ভয় পেয়ে চুপ করে গেছে। বারীন সতু আর শশী এ বিষয়ে কোন কথাই বলে না। শেষ রঙীন খামটা যেদিন আমাদের তাসের আড্ডা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেদিন হঠাৎ আমার একবার কৌতূহল হয়েছিল—অহির বিয়ের দিনটা কবে?

তার পরেই মনে হলো—জেনেই বা কি হবে?

সন্ধ্যের দিকে খুব জোরে বৃষ্টি হয়ে থেমে গেল। ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। তারপর রওনা হলাম। আজই রাত্রে অহির বিয়ে। কেমন করে তারিখটা সঠিক জানতে পারলাম জানি না। তবু বুঝলাম পুলিনবাবুর বাড়ির দিকে চলেছি, একা একা, অন্ধকারে, চুপে চুপে।

বরের আসরে বসে ছিল অহি। ছোট একটি সামিয়ানা, ওপরে একটি বেলোয়ারী ঝাড়ের আলো জ্বলছে। ছোট ছোট কার্পেট পাতা। তার ওপরে বসে আছে জন কয়েক বরযাত্রী—মিউনিসিপ্যালিটির মুন্সি হীরালাল, রামনাথ পানওয়ালা, অক্ষয় ময়রার ছেলে গোলোক—আরও ঐ ধরনের কয়েকজন। সবাই বেশ ভালমত সাজগোজ করে এসেছে, বেশ সজ্জনের মত বসে আছে। বড় কৃতার্থ খুশি ও গর্বিত ভাবে বরযাত্রীরা বসে ছিল।

আসরের দিকে আর বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারলাম না। আজ আবার অনেক বছর পরে অহির ঘুসি খেয়ে যেন রিং থেকে বাইরে ছিট্‌কে পড়েছি। ঐ রিংএর ভেতর অহি এখন সর্বেশ্বর। সামিয়ানার নীচে যেন এক ভিন্ন পৃথিবীর শান্ত আলো ফুটে রয়েছে। সেখানে সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে অহি। দক্ষিণী ব্রঞ্জের চিবুক আর কপালের ওপরে চন্দনের ছিটে লেগে রয়েছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে অহিটাকে।

পিঁড়িতে বসিয়ে বন্দনাকে বিয়ের আসরে নিয়ে আসা হলো। বন্দনাও আশ্চর্য করলো। লাল চেলির শাড়ি জড়ানো সলজ্জ ও সন্ত্রস্ত একটা মূর্তি ধনুকের মত বেঁকে রয়েছে। হিন্দুস্থানী পুরুত মন্ত্র পড়লেন। ভিড় নেই, কলরব নেই। আস্তে একবার শাঁক বাজলো। সকল ভদ্রআনার ষড়যন্ত্রের আবর্জনা সরিয়ে পুলিনবাবুর বাড়ির বাগান আর উঠোনের এক কোণে আজ একটা নতুন সংসারের রূপ স্পষ্ট ও কঠিন হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের দেবীবর মিশ্র আড়ালে আড়ালে মেল বেঁধে দিচ্ছেন। কাকা আর ক্লাবের সুগম্ভীর সমাজতত্ত্ব এইখানে এসে চরমভাবে ভুয়ো হয়ে গেছে।

হঠাৎ দেখলাম, আমার পাশে কতকগুলি অপরাধী দাঁড়িয়ে আছে—সতু, শশী আর···একে একে সবাই এসেছে। যাক্। কিন্তু বারীন কই ?

একটু পরেই দেখলাম, বারীনও আসছে। আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তবু আমাদের দেখতে পেল না। বিয়ের আসরটার দিকে এক লক্ষ্য রেখে ধীরে এগিয়ে গেল বারীন। একেবারে আসরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হিন্দুস্থানী পুরুত তখন জোর চেঁচিয়ে মন্ত্র আবৃত্তি করে হোম করছিলেন। দেখলাম বারীন হাঁ করে অহির দিকে তাকিয়ে আছে। বারীনকে দেখতে পেয়ে অহির সারামুখে অদ্ভুত একটা হাসি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বন্দনার মাথাটা আরও হেঁট হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বারীন উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলাম, পুলিন-গিন্নীর সঙ্গে বারীন একটা বচসা বাধিয়েছে। পুলিন-গিন্নী হাসছেন। তারপর, পুলিনবাবুর কাছে গিয়ে বারীন হাত নেড়ে চেঁচিয়ে যেন একদফা ঝগড়া করলো। পুলিনবাবু হাসতে লাগলেন। পরমুহূর্তে বারীন কোথায় যেন চলে গেল এবং কয়েক মিনিট পরে ফিরে এল। বারীনের সঙ্গে বারীনের জেঠীমা, বারীনের বোন দীপ্তি, বারীনের ভাগ্নী ডলি।

বারীন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। চাকরগুলোকে ধমক দিল। শেষে স্পষ্ট শুনতে পেলাম, পুলিন-গিন্নীর ওপর চটে গিয়ে বারীন গরম গরম কথা বলছে—'ছি ছি, কোন একটা ব্যবস্থা নেই আপনাদের! এ কী রকমের কাণ্ড ?'

দেখলাম, দীপ্তি আর ডলি একটা ঘর থেকে জিনিসপত্তর টানাটানি করে বের করছে। বাসরঘর তৈরি করছে। বারীনদের গোমস্তা একঝুড়ি ফুল দিয়ে গেল। ঘরের চৌকাঠের কাছে, একটা হ্যাসাক বাতি জ্বালবার জন্যে, খুটুখাটু করে কাজ করতে বসলো বারীন।

বারীনের কাণ্ডকারখানা দেখে আমাদের সঙ্কোচ কেটে গিয়েছিল। শেষ

কালে একেবারে প্রকাশ্য ভাবেই আসরের কাছে গিয়ে আমরা দেখা দিলাম। বিয়ে তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বারীন আমাদের দেখেই বলে উঠলো—'এই যে, তোমরা তো শুধু গিলতে এসেছ, গিলেই যাও।'

এতক্ষণে সত্যিই একটা বিয়েবাড়ির কলরব জেগে উঠেছে। অহি আর বন্দনা আমাদেরই পাশ দিয়ে বাসরঘরে চলে গেল। সবাই হাসিমুখে ইসারায় অভিনন্দন জানালাম। লজ্জায় ও আনন্দে অহি আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

বেশ পেট ভরেই গিলে নিলাম আমরা। বারীন তখনও ব্যবস্থা তদারক করছে। পুলিনবাবু সামনে এসে একবার বললেন—'লজ্জা করে খেও না কিন্তু তোমরা। লুচি-মিষ্টি যত খুশি দরকার চেয়ে নেবে।'

আজ তিন বছর পরে পুলিনবাবু হঠাৎ আবার আমাদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেন।

এইবার আমরা বাড়ি ফিরবো। বারীন তখন বাসরঘরের কাছে ঘুরঘুর করছিল। ডাকলাম বারীনকে।

বারীন সামনে এসে দাঁড়ালো। বড় বেশি ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বারীনকে। কপালটা ঘেমে আছে, আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে। মাথার উস্কো-খুস্কো চুলের ছায়ায় ওর চোখ দুটো যেন অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করছে।

বারীনকে বললাম—'কি হে, আর কতক্ষণ? চল এবার।'

বারীন সেই মুহূর্তে ঘাবড়ে গিয়ে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লো—'না, এখন আমি যাব না। কাজ আছে।'

বারীনের বাড়াবাড়ি দেখে আমরা বিরক্ত বোধ করছিলাম। হয়তো আর একটু পরেই খুব রেগে উঠতাম, কিন্তু আগে বারীন নিজের থেকেই বেফাঁস

বারান্দায় এই চেয়ার পাতাটুকু থেকে এ বাড়ির অনেক কিছুর, আরো গভীর কিছুর পরিচয় হয়ত পাওয়া যেতে পারে। এই কাহিনী সেইজন্তেই লেখা।

সবার আগে জগদীশবাবু এসে বসেন। নীচু ইজি চেয়ারটি তাঁর জন্তেই নির্দিষ্ট। চেয়ারের দু'ধারের হাতলে সুপুষ্ট হাত দু'টি ও সামনের টুলে পা দু'টি রেখে নিশ্চিন্ত আরামে হেলান দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে থাকা তাঁর পরম বিলাস। স্বেচ্ছায় পারতপক্ষে কথা তিনি বড় বলেন না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সুরমা একটু পরে আসেন। শাড়িতে প্রসাধনে আলুথালু ভাব। আলু-থালু ভাব বুঝি প্রকৃতিতেও। এসেই তিনি জিজ্ঞেস করেন—"এর মধ্যেই ঘুমোলে নাকি?"

ইজি চেয়ারে জগদীশবাবু একটু নড়ে চড়ে জানান তিনি ঘুমোন নি।

সে প্রশ্নের জবাবের জন্তে সুরমার অবশ্য কোনো আগ্রহ নেই। অভ্যাস মতই প্রশ্নটা করেন, তারপর বেতের মোড়াটিতে বসতে গিয়ে উঠে প'ড়ে হয়ত বলেন—"ওই যা, দোক্তার কৌটোটা ভুলে এলাম।"

জগদীশবাবু চক্ষুমুদ্রিত অবস্থাতেই বলেন—"ডাক না চাকরটাকে।"

সুরমা আবার বসে পড়ে বলেন—"তাকে যে আবার বাজারে পাঠালাম। যাও না গো তুমি একটু।"

ইজি চেয়ারে জগদীশবাবুর নড়া-চড়ার কোনো লক্ষণ না দেখে মনে হয় তিনি বোধ হয় শুনতে পান নি; অন্তত ওঠবার আগ্রহ তাঁর নেই।

কিন্তু সত্যি জগদীশবাবু খানিক বাদে বিশেষ পরিশ্রমে ইজি চেয়ার ছেড়ে উঠেছেন দেখা যায়। জগদীশবাবুর আরামপ্রিয়তা ও আলস্য যত বেশিই হোক স্ত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যত্ন ও দৃষ্টি তার চেয়ে প্রখর।

জগদীশবাবুকে কিন্তু কষ্ট করে আর যেতে হয় না। বারান্দার সিঁড়িতে ডাক্তারবাবুকে দেখতে পাওয়া যায়।

সুরমা বলেন,—"থাক, তোমার আর যেতে হবে না। ডাক্তার, আমার দোক্তার কৌটোটা নিয়ে এসে একেবারে ব'সো। বিছানার ওপরই বোধ হয় ফেলে এলাম। আর ঘরের আলোটা বোধ হয় নিবিয়ে আসি নি। সেটা নিবিয়ে দিয়ে এস।"

আদেশ নয়, অনুরোধেরই মিষ্টতা আছে কণ্ঠস্বরে, কিন্তু সে মিষ্টতা খানিকটা যেন যান্ত্রিক।

মিষ্টতা সুরমার সব কিছুতেই এখনো বুঝি অনেকটা আছে—চেহারায়, কণ্ঠস্বরে, প্রকৃতিতে। বয়সের সঙ্গে শরীরের সে তীক্ষ্ণ রেখাগুলি দুর্বল হয়ে এলেও তাদের আভাস আলুথালু বেশ ও প্রসাধনের মধ্য দিয়েও পাওয়া যায়। সুরমার সৌন্দর্য এখনো একেবারে ইতিহাস হয়ে ওঠে নি। অবশ্য ইতিহাস তার আর একদিক দিয়ে আছে—কিন্তু সে কথা এখন নয়।

ডাক্তারবাবু ঘরের আলো নিবিয়ে, দোক্তার কৌটো নিয়ে এসে, টেবিলের ওধারে সুরমার সামনা-সামনি বসেন—নদী ও পাহড়ের দিকে পিছন ফিরে। নদী ও পাহাড়ের দিকে কোনদিনই তাঁর চাইবার আগ্রহ ছিল না। বরাবর তিনি এই আসনটিতে এইভাবেই বসে আসছেন।

সন্ধ্যার অস্পষ্টভাতেও ডাক্তারবাবুকে কেমন অপরিচ্ছন্ন মনে হয়, শুধু পোশাকে ও চেহারায় নয়, তাঁর মনেও যেন একটা ক্লান্ত ঔদাসীন্য আছে সব ব্যাপারে। পোশাকের ত্রুটিটাই অবশ্য সকলের আগে চোখে পড়ে;—ঢিলে রঙচটা পেণ্টুলেনের ওপর গলাবন্ধ একটা কোট পরা। গলাটা কিন্তু বন্ধ হয় নি বোতামের অভাবে। এই কোট পরেই সম্ভবত তিনি সারাদিন রুগী দেখে ফিরবেন। একধারের পকেট স্টেথিস্কোপের ভারেই বোধ হয়

একটু ছিঁড়ে গেছে। গোটাকতক আলগা কাগজপত্র সেখান দিয়ে উঁকি দিয়ে আছে। মাথায় চুলের কিছু পারিপাট্যের চেষ্টা বোধ হয় সম্প্রতি হয়েছিল, কিন্তু সে নেহাৎ অবহেলার।

ডাক্তারবাবুর মুখের ক্লান্ত ঔদাসীন্যের রেখাগুলি শুধু তাঁর চোখের উজ্জ্বলতার দরুনই বুঝি খুব বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে নি। সমস্ত ঘুমন্ত নিষ্প্রাণ মানুষটির মধ্যে এই চোখ দু'টিই যেন এখানে জেগে আছে পাহারায়। কে জানে কি তাদের আছে পাহারা দেবার।

অনেকক্ষণ কোনো কথাই শোনা যায় না। সুরমার পানের বাটা সঙ্গে আছে এবং থাকে। তিনি সযত্নে পান সাজায় ব্যস্ত। জগদীশবাবু ইজি চেয়ারে নিশ্চল ভাবে পড়ে আছেন। ডাক্তারবাবু নিজের হাতের নখগুলো বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ ক'রে সুরমার পান-সাজা শেষ হবার জন্যেই বোধ হয় অপেক্ষা করেন।

সুরমার পান সাজা শেষ হয়। সেটি মুখে দিয়েও তিনি কিন্তু খানিকক্ষণ নীরবে সামনের দিকে চেয়ে বসে থাকেন। তারপরে হঠাৎ এক সময়ে জিজ্ঞেস করেন—"তোমার সে ফুলের চারা এল ডাক্তার?"

জগদীশবাবু চোখ বুজে বলেন—"সে চারা আর এসেছে! তার চেয়ে আকাশ-কুসুম চাইলে সহজে পেতে।"

সুরমা হেসে ওঠেন। বলেন—"তুমি ডাক্তারকে অমন অকেজো মনে কর কেন বল দিকি! সেবার আমাদের জলের পাম্পটা ডাক্তার না ব্যবস্থা করলে হ'ত?"

ইজি চেয়ারের ভেতর থেকে ঘুমন্ত স্বরে শোনা যায়—"তা হত না বটে। অন্য কেউ ব্যবস্থা করলে হয়ত পাম্পে সত্যিই জল উঠত।"

তিনজনেই এ রসিকতায় হাসেন। এ বাড়ির এটি একটি পুরাতন পরিহাস।

সুরমা বলেন—"সত্যি, তুমি কি করে ডাক্তারি কর তাই ভাবি! লোকে বিশ্বাস করে তোমার ওষুধ খায়?"

"খাবে না কেন, একবার খেলে আর অবিশ্বাসের সময় পায় না ত।"

সুরমা হাসতে হাসতে পানের বাটা খুলে জিভে একটু চুণ লাগিয়ে বলেন—"তোমার বাপু ডাক্তারের ওপর একটু গায়ের জ্বালা আছে। তুমি ওর কিচ্ছু ভালো দেখতে পাও না।"

"সেটা ওঁর চোখের দোষ, অনেক ভালো জিনিসই উনি দেখতে পান না।"—ডাক্তারের মুখে এতক্ষণে কথা শোনা যায়।

সুরমা হেসে বলেন—"তা সত্যি। চোখ বুজে থাকলে আর দেখবে কি করে।"

"চোখ বুজে থাকি কি সাধে! চোখ খুলে থাকলে কবে একটা কুরুক্ষেত্র বেধে যেত!"

সুরমা ও জগদীশবাবুর উচ্চ হাসির মাঝে ডাক্তারবাবুর নিস্তব্ধতাটা যেন একটু বিসদৃশ ঠেকে। সুরমার মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তারের চোখে একটু বেদনার ছায়া এখনো দেখা যায় কি?

সুরমা হাসি থামিয়ে বলেন—"ওই যা, ভুলেই যাচ্ছিলাম, তোমায় এখন কিন্তু একবার উঠতে হবে ডাক্তার।"

"এখনি? কেন?"

"এখনি না উঠলে হবে না। দাদা কি-সব পার্শেল করেছেন। স্টেশনে কাল থেকে এসে পড়ে আছে,—উনি একবার তবু সারাদিনে সময় করে যেতে পারলেন না। তোমায় এখন গিয়ে ছাড়িয়ে আনতেই হয়।"

ডাক্তারবাবু একটু ইতস্তত করে বলেন—"কাল সকালে গেলে হয় না?"

"হয় না আবার! একমাস পরে গেলেও হয়! জিনিসগুলো খোয়া

খাবার পর গেলে আরো ভালো হয়।"—সুরমার কণ্ঠে মিষ্টতার চেয়ে এবার ঝাঁঝটাই বেশ স্পষ্ট।

"এক রাত্তিরেই খোয়া যাবে কেন?"—ডাক্তারবাবু একটু সঙ্কুচিতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন।

সুরমা বেশ একটু উচ্চস্বরেই বলেন—"তোমার সঙ্গে তর্ক করতে পারি না বাপু! সোজাসুজি বলই না তার চেয়ে যে, পারবে না! তোমায় বলা-ই ঝকমারি হয়েছে আমার।"

ডাক্তারবাবু এবার অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠে পড়েন,—"আমি কি যাব না বলেছি? ভাবছিলুম একটা রাত্তির বই ত না।"

"রাতটা কাটিয়ে গেলেই বা তোমার কি এমন সুবিধে! এমন কিছু কাজ ত আর হাতে নেই, চুপ করে বসেই ত থাকতে।"

সে কথা মিথ্যে নয়। ডাক্তার শুধু চুপ করে বসে থাকতেই এখানে আসেন। চুপ করে বসে আছেন আজ বহু বৎসর ধরে।

ডাক্তার টুপীটা তুলে নিয়ে একবার তবু বলেন,—"আসুন না জগদীশ-বাবু আপনিও! গাড়িটা ত রয়েছে, একটু ঘুরে আসা হবে।"

জগদীশবাবুর আগে সুরমাই আপত্তি করেন—"বেশ কথা! আমি একলা বসে থাকি এখানে তাহলে।"

ডাক্তার একটু হেসে বলেন—"আরে! তুমিও এস না!"

"তার চেয়ে বাড়ি-সুদ্ধ পাড়া-সুদ্ধ সবাই একটা পার্শেল আনতে গেলেই হয়! সত্যি তুমি দিন দিন যেন কি হচ্ছ!"

ডাক্তার আর কিছু না বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যান।

"দিন দিন কি যেন হয়ে যাচ্ছ!" মোটরে চড়ে স্টেশনের দিকে যেতে যেতে ডাক্তার সে কথা ভাবেন কি? না বোধ হয়। ভাবনা ও আবেগের উদ্বেল সাগর বহুদিন শান্ত নিথর হয়ে গেছে। সে সব দিন এখন আর বোধ

হয় মনেও পড়ে না। স্মৃতির সে সমস্ত পাতাও বুঝি অনেক তলায় চাপা পড়ে আছে। জীবনের একটি বাঁধা ছকে তিনি খাপ খেয়ে গেছেন সম্পূর্ণভাবে। আগুন কবে ভস্মশেষ রেখে একেবারে নিবে গেছে তা তিনি জানতেই পারেন নি।

আগুন একদিন সত্যিই জ্বলে উঠেছিল বই কি! কিন্তু সে যেন আর এক জনের কাহিনী, সে অমরেশকে তিনি শুধু দূর থেকে অস্পষ্টভাবে এখন চিনতে পারেন। তার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ তাঁর নেই!

একদিন একটি ছেলে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে পরম দুঃসাহস ভরে দাঁড়াতে দ্বিধা করে নি।

মেয়েটি ভীতস্বরে বুঝি একবার বলেছিল, সুযোগ পেয়ে—"তুমি এখানে চলে এলে!"

"আরো অনেক দূরে যেতে পারতাম!"

"কিন্তু—?"

"কিন্তু এঁরা কি ভাববেন মনে করছ? তার চেয়ে তুমি কি ভাবছ সেইটেই আমার কাছে বড় কথা।"

"আমি ত…" মেয়েটি নীরবে মাথা নীচু করেছিল।

অমরেশ তার মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বলেছিল—"তোমার ভাববার সাহস পর্যন্ত নেই সুরমা!"

সুরমা মুখ তুলে মৃদুস্বরে বলেছিল—"না।"

"সেই সাহস সৃষ্টি করতেই আমি এসেছি সুরমা। সেই সাহসের জন্যে আমি অপেক্ষা করব।"

সুরমা চুপ করেছিল। অমরেশ আবার বলেছিল—"ভাবছ, কতদিন

—এমন কতদিন অপেক্ষা করতে পারব? দরকার হলে চিরকাল। কিন্তু তা বোধ হয় হবে না।"

জগদীশবাবু বুঝি সেই সময়ে ঘরে ঢুকেছিলেন। তাঁর চেহারায় এখনকার সঙ্গে তখনো বুঝি বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। বেঁটে গোল-গাল মানুষটি। শান্ত নিরীহ চেহারা। একেবারে নীচের ধাপ থেকে সংগ্রাম করে তিনি যে সাংসারিক সিদ্ধি বলতে লোকে যা বোঝে তাই লাভ করেছেন তাঁর চেহারায় তার কোনো আভাস নেই। দেখলে মনে হয় ভাগ্য তাঁকে চিরদিন বুঝি অযাচিত অনুগ্রহ করেই এসেছে। সুরমা-সম্পর্কে সে কথা হয়ত মিথ্যাও নয়।

তিনি ঘরে ঢুকে বলেছিলেন—"এখনও ট্রেনের জামা-কাপড় ছাড়েন নি? না না এখন ছেড়ে দাও সুরমা। সারারাত ট্রেনের ধকল গেছে। স্নান করে খেয়ে-দেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিন আগে।"

অমরেশ হেসে বলেছিল,—"ছেড়ে না দেওয়ার অপরাধটা আমার—ওঁর নয়।"

জগদীশবাবু উচ্চস্বরে হেসেছিলেন। হাসলে তাঁকে এত কুৎসিত দেখায় অমরেশও ভাবতে পারে নি। সুরমার পেছনে তাঁর এই হাস্য-বিকৃত মুখটা সে উপভোগ করেছিল বেদনাময় আনন্দে—

তারপর উঠে প'ড়ে বলেছিল—"আচ্ছা এখন ওঠাই যাক।"

জগদীশবাবু সঙ্গে যেতে যেতে বলেছিলেন—"বড় অসময়ে এলেন অমরেশবাবু! এই দারুণ গ্রীষ্মে এখানে কিছু দেখতে পাবেন না। বাইরে বেরুনই দায়।"

"সেটা দুর্ভাগ্য নাও হতে পারে!" জগদীশবাবুর বিস্মিত দৃষ্টির উত্তরে আবার বলেছিল—"তা ছাড়া গ্রীষ্ম ত একদিন শেষ হবে।"

"তখন আপনাকে পাচ্ছি কোথায়!" জগদীশবাবুর স্বরে বুঝি একটু সন্দেহের রেশ ছিল।

"পাবেন বই কি। হয়ত বড় বেশি পাবেন।"

অমরেশ ডাক্তার মিথ্যে বলেনি। সত্যই একদিন এই ধূলিমলিন দরিদ্র শহরের একটি রাস্তার ধারে অমরেশ ডাক্তারের সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা গেল।

জগদীশবাবু বলেছিলেন—"বিলিতি ডিগ্রির খরচ উঠবে না যে ডাক্তার! এ জঙ্গলের দেশে আমাদের মত কাঠুরের পোষায় বলে কি তোমার পোষাবে?"

অমরেশ ডাক্তার হেসে বলেছিল—"কাঠের কারবার আর ডাক্তারি ছাড়া আর কি পোষাবার কিছুই নেই?"

অমরেশ ডাক্তারকে রোগীর ঘরে দেখতে পাওয়া যাক বা না যাক জগদীশবাবুর বাড়ির সরু বারান্দাটিতে প্রতিদিন তারপর দেখা গেছে।

"চেয়ারটা ঘুরিয়ে বোস ডাক্তার।"—জগদীশবাবু বলেছেন।

"কেন? আপনার ওই নদী আর পাহাড় দেখবার জন্যে? আপনার ট্রেডমার্ক পড়ে ওর সব দাম নষ্ট হয়ে গেছে।"

"মড়া কেটে কেটে মনটাও তোমার মরে গেছে ডাক্তার!"

জগদীশবাবু তারপরেই আবার জিজ্ঞেস করেছেন অবাক হয়ে—"উঠলে কেন সুরমা?"

"আসছি।"—বলে সুরমা মুখ নীচু করে ভেতরে চলে গেছে।

অমরেশ ডাক্তার অদ্ভুতভাবে হেসে বলেছে—"মেয়েরা কাটা-কাটির কথা সইতে পারে না, না জগদীশবাবু?"

জগদীশবাবু কোনো উত্তর দেন নি। গম্ভীর মুখে কি যেন তিনি ভাবছেন মনে হয়েছে।

অমরেশ ডাক্তার আবার বলেছে—"ওইটুকু ওদের করুণা!"

জগদীশবাবু গম্ভীরভাবে বলেছেন—"সেটুকু পাবারও সবাই যোগ্য নয়।"

ডাক্তারের আসা-যাওয়া গোড়ায় হয়ত এ বাড়ির উৎসাহ পায় নি। কিন্তু ক্রমে তা সয়ে গিয়েছে,—সহজ হয়ে এসেছে জগদীশবাবুর কাছেও বুঝি।

"কদিন আমায় জঙ্গলেই থাকতে হবে ডাক্তার। গুনতির সময়ে না থাকলে চলে না। দেখাশুনো কোরো। তোমায় অবশ্য বলতে হবে না।"

ডাক্তার হেসে বলেছে—"না, তা হবে না। আসতে বারণ করেও দেখতে পারেন!"

জগদীশবাবু হেসেছেন। সুরমাও হেসেছে, হাসলেই হয়ত তার মুখ লাল হয়ে ওঠে। লাল হবার আর কোনো কারণ নেই বোধ হয়।

কিন্তু সুরমাই একদিন তীব্র স্বরে বলেছে—"আমি কিন্তু আর সইতে পারছি না!"

"পারবে না-ই ত আশা করি।"

"না না, তুমি এখান থেকে যাও। এমন করে নিজেকে ও আমাকে মেরে কি লাভ?"

"বাঁচবার পথ ত খোলা আছে এখনো!"

"সে পথ যখন আগে নেওয়া হয় নি···"

"সে অপরাধ ত আমার নয় সুরমা। তুমি তোমার নিজের মন জানতে না, আমি জানতাম না সুযোগের মূল্য। ভাগ্যের নিষ্ঠুর রসিকতাকে তাই বলে মেনে নিতে হবে কেন!"

"তুমি কি বলছ জান না! তা হয় না! তা হয় না!" সুরমার কণ্ঠ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আবেগে।

"অপরাধের কথা ভাবছ? অপরাধ করার চরম দামও যার জন্যে দেওয়া যায় এমন বড় জিনিস কি নেই?"

"আমি বুঝতে পারি না। আমার ভয় হয়!"

"বুঝতে পারবে, সেই প্রতীক্ষাতেই ত আছি।"

প্রতীক্ষা একদিন বুঝি সার্থক হল বলে মনে হয়েছে। জগদীশবাবুর কাঠের কারবারের জন্যে জমা নেওয়া বিস্তীর্ণ জঙ্গল সেদিন তারা দেখতে গেছল। অরণ্যের রহস্যঘন আবেষ্টনে সারাদিন রাজসূয় 'চড়িভাতি'র উত্তেজনাতেই কেটেছে। বিকেলের দিকে সবাই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছিল।

অমরেশ ও সুরমা পথহীন অরণ্যে সকলের থেকে কেমন করে আলাদা হয়ে গেছে। আলাদা হওয়াটা হয়ত সম্পূর্ণ দৈবাৎ নয়, অমরেশেরও তাতে হয়ত হাত ছিল।

সুরমা খানিকক্ষণ বাদে বলেছে—"এ জঙ্গলে কিন্তু পথ হারাতে পারে!"

"পথ জঙ্গলে ছাড়াও হারানো যায়!"

সুরমা একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলেছে—"সব সময়ে তোমার এ ধরনের কথা ভালো লাগে না!"

"কোথাও তোমার ব্যথা আছে বলেই ভালো লাগে না। নিজের কাছে তুমি ধরা দিতে চাও না বলেই এসব কথা তোমার অসহ্য।"

সুরমা নীরবে খানিক দূর এগিয়ে গেছে। অরণ্যের পশ্চাৎ-পটে তার দীর্ঘ সুঠাম দেহের গতিভঙ্গিতে বুঝি বনদেবীরই মহিমা ও মাধুর্য। সেটুকু উপভোগ করবার জন্যেই বুঝি খানিকক্ষণ নিঃশব্দে অমরেশ দাঁড়িয়ে থেকেছে। তারপর কাছে গিয়ে বলেছে—"এ জঙ্গলে হারাবার বদলে পথ আমরা পেতেও পারি।"

সুরমা তবু নীরব।

হঠাৎ তার একটা হাত ধরে ফেলে অমরেশ বলেছে—"চুপ করে থেকো না সুরমা। বলো, আজ তোমার অটলতার গৌরব আর নেই—আছে শুধু দুর্বলতার লজ্জা। এ সম্বল নিয়ে চিরদিন বাঁচা যায় না, বাঁচা উচিত নয় সুরমা।"

সুরম প্রায়-অস্পষ্ট স্বরে বলেছে,—"আমি কি করতে পারি বলো!"

একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর পা দিয়ে অমরেশ বলেছে—"এই কাটা গাছটা দেখছ সুরমা। কাঠের কারবারে এর একটা দাম মিলেছে। কিন্তু তার চেয়ে বড়, তার চেয়ে আসল দাম এর ছিল! তুমিও কারবারের কাঠ নও সুরমা, তুমি অরণ্যের।"

সুরমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অমরেশ আবার বলেছে,—"সহজ করে কথা আজ বলতে পারছি না বলে ক্ষমা কোরো সুরমা। মনের ভেতরেই আজ আমার সব জড়িয়ে গেছে।"

সুরমা অমরেশের আরো কাছে সবে এসেছে, বুকের ওপর মাথা নুইয়ে ধীরে ধীরে ধরা গলায় বলেছে—"তুমি আমায় সাহস দাও।"

কিন্তু চলে যাওয়া তাদের তখন হয়ে ওঠেনি। বাধা এসেছে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে। জগদীশবাবু হঠাৎ অসুখে পড়েছেন—গুরুতর অসুখ। সুরমা ও অমরেশ দিনরাত্রি বিনিদ্র হয়ে রোগ-শয্যার পাশে জেগেছে আর শান্তভাবে প্রতীক্ষা করেছে মুক্তিক্ষণের। আর বেশিদিন নয়। এই তাদের শেষ পরীক্ষা, নূতন জীবনের এই প্রথম মূল্যদান।

জগদীশবাবু ভালো হয়ে উঠেছেন, তবু অপেক্ষা করতে হয়েছে, আর কিছুদিন, আর কয়েকটা দিন! ছোট-খাট বাধা, বাঁধা-ঘাটের নোঙর একেবারে তুলে ফেলতে সুরমার সামান্য একটু বিহ্বলতা। এটুকু সময় তাকে দেওয়া যেতে পারে,—নিজের ভেতর থেকে বল পাওয়ার সময়।

অমরেশ কোথাও এতটুকু জোর খাটাতে চায় না, সব শিকড় আপনা থেকে আলগা হয়ে আসুক, সব বন্ধন খুলে যাক। অসীম তার ধৈর্য।

অমরেশ ডাক্তার অপেক্ষা করেছে—কিছু দিন—অনেক দিন অপেক্ষা করেছে।

—বড় বেশি দিন অপেক্ষা করেছে।

ধীরে ধীরে কখন আগুন গিয়েছে নিবে। কখন আর-বছরের পাপড়ির মত সে ম্লান শুক্‌নো বিবর্ণ হয়ে গেছে,—তারা সবাই বিবর্ণ হয়ে গেছে। বিবর্ণ আর সুলভ আর সাধারণ। অভ্যাসের ছাঁচে তারা বদ্ধ হয়ে গেছে, জীর্ণ মলিন হয়ে গেছে সংসারের ধূলায়।

সবচেয়ে মলিন বুঝি ডাক্তার, সবচেয়ে মলিন আর ক্লান্ত। আগুন তার মধ্যে অমন লেলিহান হয়ে জ্বলেছিল বলেই সবার আগে তার সব পুড়ে ছাই হয়েছে। ডাক্তার তার নির্দিষ্ট চেয়ারে এসে এখনো রোজ বসে, নদী ও পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরে! কিন্তু সে শুধু অভ্যাস। ডাক্তার স্টেশনে পার্শেল খালাস করতে ছোটে, সে শুধু দুর্বল আজ্ঞাবাহিতা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমানকালে জীবিত বাঙালী কথাশিল্পীদের মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যে সর্বাধিক বিখ্যাত, তাতে বোধ হয় কারুরই কোনো সংশয় নেই। কিন্তু এ খ্যাতি তিনি একদিনে পাননি অর্থাৎ উল্কার মতো হঠাৎ জ্বলে ওঠেননি। তাহ'লে হয়ত তা এত দীর্ঘ-স্থায়ী এবং ক্রমবর্ধমান হ'ত না। অতি ধীরে ধীরে তাঁর এই বর্তমান আসনের দিকে তাঁকে এগোতে হয়েছে। তিনি প্রথম যুগে কারুর কাছেই তাঁর যোগ্য সমাদর পাননি, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরুদ্ধ মনোভাবের সঙ্গেই তাঁকে লড়াই করতে হয়েছে। শুদ্ধমাত্র যোগ্যতাই ছিল তাঁর অস্ত্র এবং তারই সাহায্যে তিনি আজ এতটা সম্মান ও শ্রদ্ধা দখল করতে পেরেছেন। তারাশঙ্কর অসম্ভব পরিশ্রমী, তাঁর সমধিক বিখ্যাত উপন্যাস-গুলির অধিকাংশই তিনি দু'বার লিখেছেন—এবং সংযোজনা ও পরিমার্জনা এখনো চলেছে। নিজের রচনা সম্বন্ধে তিনি অত্যন্ত নির্মম। সেইজন্যই গণদেবতা ও পঞ্চগ্রামের মতো উপন্যাস লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে বোধ হয়। বিশিষ্ট সমালোচকদের মতে এগুলি মহাকাব্য, পৃথিবীর যে-কোনো মহোপন্যাসের সঙ্গেই তুলনীয়। বর্তমান গল্পটি তাঁর প্রিয় গল্প ত বটেই, তাছাড়া এটিই ঐ-দুটি বিরাট উপন্যাসের অঙ্কুর—সে হিসাবে এর ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বীরভূমে জ'ন্মে, তারাশঙ্কর দেশ ও দেশবাসীর সেবায় আত্ম-নিয়োগ ক'রে দেশকে ভাল ক'রেই জেনেছেন। তাঁর গম্ভীর বহিরাকৃতির মধ্যে একটি স্নিগ্ধ এবং স্নেহপ্রবণ মন আছে। অধিকাংশ প্রতিভার মতই ইনি নিঃসঙ্গ, একক। তবু একটা নিবিড় সহানুভূতির যোগসূত্র আছে জনসাধারণের সঙ্গে।

পিতা-পুত্র

আহ্নিক গতিতে পৃথিবী আবর্তিত হয়, দিনের পর রাত্রি আসে, রাত্রির পর হয় দিন, যুগের শেষে হয় যুগান্তর, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির কত রূপান্তর হয়। এই রূপান্তরের মধ্য দিয়া জগৎ চলে,—যুগের পথ-চলা। নিয়তির লীলায়

আকর্ষণেই হউক আর মানুষের ভবিষ্যৎ-সন্ধানী মনের চালনাতেই হউক, সমষ্টিগতভাবে মানুষ চলে, সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও চলিতে হয়। কিন্তু বিপ্রনান্দী গ্রামখানি যেন ইহার ব্যতিক্রম। অবশ্য গতিশীল জগতের সঙ্গে গ্রামখানির যোগসূত্রও যে অত্যন্ত ক্ষীণবল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বোলপুর রেল-স্টেশন বারো মাইল দূরে, মোটর-বাস বা ট্যাক্সি আসিবার রাস্তা পর্যন্ত নাই; কাঁচা রাস্তায় যানের মধ্যে সনাতনী পদ্ধতিতে গোরুর গাড়ি কোন রকমে চলে, আর বাহনের মধ্যেও চলিতে পারে ঐ এক গোরুই, ক্ষুর জোড়া বলিয়া কাদায় ঘোড়াও চলে না। কিন্তু গোরুর উপর মানুষের চড়া চলে না, কাজেই আপন চরণজোড়া ছাড়া অন্য বাহনও অচল। কিন্তু এই যোগসূত্রের ক্ষীণতাই ইহার হেতু নয়। কাবণ এই অচলতার মধ্যে জড়তা গ্রামখানিকে স্পর্শ করে নাই, একটি অটল-মহিমায় সে সূর্যকরদীপ্ত পাহাড়ের চূড়ার মত দাঁড়াইয়া আছে। আশেপাশে গতিশীল জগৎ অহরহ তাহাকে টানিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তবু বিপ্রনান্দী গ্রাম নড়ে না। বারো মাইল দূরে ট্রেন চলিয়া যায়, নিশীথ রাত্রে তাহার শব্দ-তরঙ্গে গ্রামের শূন্য-মণ্ডলে শিহরণ উঠে, মাটির বুকে সঞ্চারিত কম্পনবেগে গৃহপ্রাচীর কাঁপে, মধ্যে মধ্যে গ্রামের যুবকেরা দশ জনে মিলিয়া দশমুণ্ড রাবণের মত কুড়ি হাতে জীবনকে নাড়া দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু ফল হয় না। সামান্য একটু কম্পন অনুভব করিলেই, কৈলাস-শিখরাসীন বিশ্বম্ভরের মত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ বিপ্রনান্দীর বুকে পদনখাগ্র চাপিয়া ধরেন, সঙ্গে সঙ্গে সব স্থির হইয়া যায়।

ন্যায়তীর্থ মানুষটি খর্বকায় ছোটখাট; গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর, সর্ব অবয়ব একটি অনমনীয় দৃপ্ততার দীপ্তিতে ভাস্বর, অথচ তাঁহার মুখে চোখে কপালে ঠোঁটে একটি হাস্যময় প্রশান্তি ঝলমল করে। পরনে ক্ষারে-ধোয়া ধবধবে থান ধুতি, অনাবৃত বুকের উপর আঠায়-মাজা শুভ্র উপবীত, গলায়

সোনার তারে গাঁথা ছোট রুদ্রাক্ষের একগাছি মালা পরিয়া ন্যায়তীর্থ আপনার টোলের বারান্দায় ছোট একখানি চৌকির উপর বসিয়া থাকেন। তাঁহারই একটি অখণ্ড এবং প্রগাঢ় প্রভাব গ্রামখানিকে নিষ্কম্প দীপালোকের মত আলোকিত এবং আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। গ্রামে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হইলেও তিনি চঞ্চল হন না, হাসিমুখেই তিনি কথা বলেন, কিন্তু তাঁহার খড়মের শব্দ তখন একটু উচ্চ ও কঠোর হইয়া উঠে, দাঁড়ান ঈষৎ দৃঢ়তর ঋজু ভঙ্গিতে—খড়মের চাপও যেন একটু বেশি পড়ে। তাহাতেই কাজ হইয়া যায়, চঞ্চল গ্রাম্যজীবন স্থির হইয়া শান্ত হয়। তাই বলিতেছিলাম, কৈলাসবাসী বিশ্বম্ভরের মতই পদনখাগ্রে গ্রামের বুকখানাকে চাপিয়া ধরেন।

শিবশেখর ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কিন্তু ভাগবতেই তাঁহার অনুরাগ প্রগাঢ়। এই প্রগাঢ় অনুরাগের জন্যই তিনি প্রাচীন ধর্মজীবনকে গ্রামখানির মধ্যে প্রাণপণ শক্তিতে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন। মাত্র গ্রামের মধ্যেই তাঁহার প্রভাব অখণ্ড এবং প্রগাঢ় হইলেও খ্যাতি তাঁহার বহুবিস্তৃত—বাংলা দেশে একজন মনীষী বলিয়া তিনি বিখ্যাত। বিশেষ করিয়া ভাগবত-ধর্মের ব্যাখ্যা শুনিবার জন্য, আলোচনা করিবার জন্য দেশবিদেশ হইতে মধ্যে মধ্যে অনেক পণ্ডিত এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়াও তাঁহার নিকট আসিতেন। সে-বার একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে আসিয়া তাঁহার সন্ধান পাইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শান্তিনিকেতন বিপ্রনান্দী হইতে মাইল দশেক পথ।

আলোচনা শেষ করিয়া ইউরোপীয় ভদ্রলোক হাসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকটিকে আপন ভাষায় কি বলিলেন। অধ্যাপক ঈষৎ হাসিয়া ন্যায়-তীর্থকে বলিলেন,—ইনি কি বলছেন জানেন?

ন্যায়তীর্থ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন।

অধ্যাপক বলিলেন,—গ্রীক বীর আলেকজান্দার আমাদের দেশে এসে এক যোগী পুরুষকে দেখে বলেছিলেন, আমি যদি আলেকজান্দার না হতাম, তবে এই ভারতের যোগী হ'তে চাইতাম। উনিও ঠিক সেই কথাই বলছেন। বলছেন—ইউরোপে না জন্মালে আমি ভারতবর্ষে এমনি পণ্ডিত হয়ে জন্ম-গ্রহণের কামনা করতাম।

ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন,—আমার এ ব্রাহ্মণ-জন্ম না হ'লেও আমি কিন্তু এই দেশের কীটপতঙ্গ হয়েই জন্মাতে চাইতাম, অন্যত্র জন্মকামনা করতাম না।

ইউরোপীয় পণ্ডিতটি ন্যায়তীর্থের কথার মর্ম শুনিয়া অতি মৃদু হাসিয়া অধ্যাপককে ইংরাজীতে বলিলেন,—এ'কে আমরা বলি ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স।

অধ্যাপকটির মুখ লাল হইয়া উঠিলেও ভদ্রতার খাতিরে কোন রূঢ় প্রতি-বাদ করিতে পারিলেন না। ন্যায়তীর্থ ইংরাজী বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু বক্তার হাসির রূপ ও ভঙ্গি হইতে ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সুরটুকু বেশ বুঝিলেন। তবুও তিনি কথাগুলির মর্মার্থ বুঝিবার কোনও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, প্রশান্ত হাসিমুখেই সম্মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু ন্যায়তীর্থের যোগ্য পুত্র শশিশেখর দৃঢ়স্বরে ইংরাজীতে বলিয়া উঠিল, না, ইন্‌ফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স নয়, এই তাঁর অন্তরের বিশ্বাস। তোমাদের পাশ্চাত্য বিদ্যায় মনকে তোমরা বুঝতে পার, কিন্তু তার বেশি কিছু পার না; আত্মাকে তোমরা চেন না। আমাদের জ্ঞানের লক্ষ্য হ'ল চিত্তজয়—আত্মোপলব্ধি; আমাদের মন আত্মাকে পরিচালিত করে না, আত্মার নির্দেশে মনকে চলতে হয় বাহনের মত।

ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি সপ্রশংস দৃষ্টিতে শশিশেখরের মুখের দিকে

চাহিয়া রহিলেন, অধ্যাপকটি ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন—পাছে পরিণতিতে অপ্রীতিকর কিছু ঘটিয়া যায়। ন্যায়তীর্থ বিপুল বিস্ময়ে বিস্মিত হইয়া শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সর্বাগ্রে তিনিই সে বিস্ময়কে জয় করিয়া আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, শশী, তুমি ওঁকে কি বলছ তার অর্থ আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু যা বলছ সেটা ভঙ্গিতে ও স্বরে বড় রূঢ় ব'লে মনে হচ্ছে আমার। উনি আমাদের অতিথি, তুমি গৃহস্থ, আপন ধর্ম তুমি লঙ্ঘন করছ।

শশিশেখর চুপ করিল। বক্তব্য তাহার শেষই হইয়াছিল, তবুও তাহার ঈষৎ সঙ্কুচিত ও লজ্জিত ভঙ্গির মধ্যে ন্যায়তীর্থের আজ্ঞাপালনে আনুগত্যটুকু বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ইউরোপীয় ভদ্রলোকটি শশিশেখরের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন,—এই তরুণ বন্ধুটির পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

অধ্যাপক বলিলেন,—ইনিই ন্যায়তীর্থের পুত্র, শশিশেখর ন্যায়তীর্থ। এই বৎসরই ন্যায় উপাধি পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

—উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। বলিয়া শশিশেখরকে অভিবাদন করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিলেন, আমি বড় আনন্দ লাভ করলাম আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। সকলের চেয়ে বেশি আনন্দ হ'ল আপনি ইংরেজী ভাষাও শিক্ষা করেছেন। সমগ্র পাশ্চাত্য দর্শনের দ্বার আপনার কাছে এখন উন্মুক্ত। আশা করি, নিতান্ত সংস্কারবশেই আপনি সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকবেন না।

শশিশেখর তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, সহস্র ধন্যবাদ আপনাকে। পাশ্চাত্য দর্শন পড়ব ব'লেই আমি ইংরেজী শিখেছি।

গ্রামের প্রান্ত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ইউরোপীয় পণ্ডিতটির

সঙ্গে গিয়া বিদায় দিয়া শশিশেখর বাড়ি ফিরিল। খানিকটা আসিতে আসিতেই মন তাহার সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তাহার গোপন কথা আজ উত্তেজনার অসতর্ক অবস্থায় পিতার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত ইংরাজী পড়িতে ন্যায়তীর্থ বাধা দেন নাই। স্বীকার করিয়াছিলেন, রাজভাষা সাংসারিক প্রয়োজনেও একটু দরকার। ইস্কুলে পড়াটা শেষ করাই ভাল।

শশিশেখর প্রথম বিভাগে বেশ কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিল। তাহার স্কুলের একজন শিক্ষক ন্যায়তীর্থকে অনুরোধও করিল, আপনি শশীকে কলেজেই পড়তে দিন। ভবিষ্যতে ও খুব ভাল ফল করবে। অঙ্কে কাঁচা ব'লেই শশী বৃত্তি পেলে না, নইলে সংস্কৃতে ইংরেজীতে খুব ভাল ফল করেছে।

ন্যায়তীর্থ প্রসন্ন হাস্যের সহিত বলিয়াছিলেন, আপনি ভালবাসেন শশীকে, আপনার কল্যাণ হোক। কিন্তু আপনি যা বলছেন, সে হয় না মাষ্টার মশায়!

—কেন? ইংরেজী খারাপ কিসে?

তেমনি হাসিয়াই ন্যায়তীর্থ বলিলেন—না না, ইংরেজী বিদ্যার উপর আমার বিদ্বেষ নেই কিছু, তবে আস্থাও নেই। আর আমাদের বংশগত বিদ্যার উপর একটা বিশেষ শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস দুইই আছে। ইংরেজী জ্ঞানের দৃষ্টিটা নিতান্তই ঐহলৌকিক, চর্মচক্ষুর দৃষ্টির ওপারে আর তার গতি নেই। অথচ 'অবাঙ্-মনসো-গোচরে'র সাধনা আমাদের কুলধর্ম। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ; সুতরাং ও অনুরোধ আর করবেন না।

মাষ্টার ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, আমাদের ইচ্ছা ছিল শশিশেখর সংস্কৃত এবং ইংরেজী দুইএই পণ্ডিত হয়।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন, ওটা নিতান্তই বিলাতী ধরনে পিণ্ড রাঁধার ব্যবস্থা,

মাষ্টার মশাই। জীবনের সাধনা একমুখী হওয়াই ভাল। মন দ্বিধাবিভক্ত হ'লে অবস্থা হবে গোক্ষুর ক্ষুরের মত, দ্রুত চলার শক্তি হারিয়ে যাবে। জন্মান্তরের ফের বেড়ে যাবে।

মাষ্টার মহাশয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন শুধু, মুখে কিছু বলিলেন না। ন্যায়তীর্থ বলিলেন, আর শিখলেও তো খানিকটা। কাজ অনেকটা ওতেই চ'লে যাবে। মাষ্টার হাসিলেন, বলিলেন, ও যা শিখেছে তাতে ভাল ক'রে কথা কওয়াও চলে না, ন্যায়তীর্থ মশাই।

এ অনেক দিনের কথা। ইহার পর শশিশেখর ন্যায়তীর্থের কাছেই কয়েক বৎসর পড়াশুনা করিয়া ব্যাকরণ পরীক্ষা দিল, তারপর সাহিত্য অলঙ্কার পড়িয়া দর্শন পড়িতে আরম্ভ করিল। এই সময়েই ন্যায়তীর্থ তাহাকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, চিকিৎসকের যেমন আপনার পরম আত্মীয়ের চিকিৎসা করা উচিত নয়, এও তেমনি আর কি! আমার অনেকগুলি ছাত্র, শশী এখানে পড়লে শিক্ষা আমার পক্ষপাতদুষ্ট হ'তে পারে।

শশিশেখর নবদ্বীপে আসিয়া ন্যায় পড়িতে পড়িতে পিতার চোখের আড়ালের সুযোগ পাইয়া সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে গোপনে ইংরাজীর চর্চাও আরম্ভ করিল। মনীষী পিতার মেধাবী সন্তান সে, তাহার উপর ছিল জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ। ন্যায়ের উপাধি-পরীক্ষা দিবার পূর্বেই সে পাশ্চাত্য দর্শন মোটামুটি পড়িয়া ফেলিল। শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও তাহার আয়ত্ত হইয়াছে। এ সংবাদ ন্যায়তীর্থের কাছে অতি যত্নে সে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। আজ তাহা এমনি এক অভাবনীয় ঘটনা-সংস্থানে উত্তেজনাময় অবস্থার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

শশিশেখর মনে মনে শঙ্কিত হইয়াই বাড়ি ফিরিল।

প্রশান্ত মুখেই ন্যায়তীর্থ বসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া ইতিমধ্যেই একটি ক্ষুদ্র জনতা জমিয়া উঠিয়াছে। একদিকে টোলের ছাত্রেরা দাঁড়াইয়া আছে, ন্যায়তীর্থের কয়েকজন বন্ধু ও মুগ্ধ ভক্ত একখানি কম্বল বিছাইয়া আসর করিয়া সম্মুখেই বসিয়াছে, এমন কি সদ্‌গোপ-পাড়ার জন তিনেক মণ্ডলও আসিয়া বারান্দার নীচে উবু হইয়া বসিয়া আছে।

কোন একটা কথা হইতেছিল। শশিশেখর আসিয়া দাঁড়াইতে কথাটার যেন মোড় ফিরিয়া গেল। ন্যায়তীর্থের বন্ধু হিরণ্যভূষণ চক্রবর্তী শশীকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, এস বাবাজী এস। তোমার কথাই হচ্ছিল। তুমি আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছ। মহৎ থেকেই মহত্তের উদ্ভব হয়, উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান তুমি। তোমা হ'তে বিপ্রনান্দীর গৌরব বজায় থাকবে। বলিহারি বলিহারি! ইংরেজী ব'লে গেলে তুমি একেবারে ঝর ঝর ক'রে—খাজা বিলিতী সাহেবের সঙ্গে!

প্রৌঢ় হরিশ চাটুয্যেও ন্যায়তীর্থের বন্ধু, গ্রামের মধ্যে তিনি বর্ধিষ্ণু ব্যক্তি, তিনি বলিলেন, কথাটা তোমার ঠিক হ'ল না হিরণ্য। শশিশেখর হ'তে গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি হবে। ন্যায়তীর্থের বংশের মুখ আরও উজ্জ্বল হবে। পুত্রের কাছে পরাজয় মহাভাগ্যের কথা। শিবশেখর ধার্মিক, জ্ঞানী; জ্ঞানবান, পুণ্যবানের বংশ। এমন ভাগ্য শিবশেখরের হবে না তো কি হবে তোমার আমার? পুণ্যবল না থাকলে কি ভগবানের আশীর্বাদ পাওয়া যায়!

শশিশেখরের শঙ্কা ইহাতেও দূর হইল না, সে বাপের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ন্যায়তীর্থের মুখ প্রসন্ন, এতক্ষণে তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, দশের আশীর্বাদই হ'ল ভগবানের আশীর্বাদ। এ সমস্তই হ'ল তোমাদের দশ জনের স্নেহের ফল হরিশ। এখন আশীর্বাদ করো যেন শশী স্বধর্মচ্যুত না হয়।

হরিশ চাটুয্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, সহস্র বার, লক্ষ বার সে আশীর্বাদ করি এবং আজও করছি শিবশেখর।

হরিশের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলেই তাঁহার আশীর্বাদ-বাক্যকে সমর্থন করিয়া একটি মৃদু গুঞ্জনধ্বনি তুলিয়া ফেলিলেন। শশিশেখর অভিভূত হইয়া গিয়াছিল, এমনভাবে প্রশংসার অজস্র বর্ষণের মধ্যে চোখ তুলিয়া সে যেন দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। ন্যায়তীর্থ বলিলেন, প্রণাম করো শশী। তোমাকে আশীর্বাদ করলেন আর তুমি প্রণাম করতে ভুলে গেলে! ইংরেজী শিক্ষা না ক'রে যদি শুধু সংস্কৃত শাস্ত্র পড়তে, তবে এ ভুল তোমার কখনই হ'ত না।

শশিশেখর অতিমাত্রায় লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি সকলকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিল। হরিশ কিন্তু বলিলেন, এটা তোমার বক্রোক্তি হ'ল ভাই ন্যায়তীর্থ। শুধু বক্রই নয়, তীক্ষ্ণও যথেষ্ট পরিমাণে।

ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন, অলঙ্কৃত করতে গেলেই নাক কান সূচ দিয়ে ফুঁড়তে হয় হরিশ। সূচ তীক্ষ্ণ এবং অলঙ্কারগুলি এক্ষেত্রে বক্রই হয়ে থাকে।

ঠিক এই সময়েই সকলকে প্রণাম শেষ করিয়া শশিশেখর ন্যায়তীর্থকে প্রণাম করিল। ন্যায়তীর্থের অসাধারণ সংযম সত্ত্বেও চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুখে তিনি কিছু বলিলেন না, শুধু হাতখানি ছেলের মাথার উপর রাখিলেন।

হিরণ্যভূষণ বলিলেন, কিন্তু তুমি এমন ইংরেজী কেমন ক'রে শিখলে শশী? একেবারে ঝর ঝর ক'রে জলের মত ব'লে গেলে! কি বলে এন্‌ট্রেন্স না ম্যাট্রিক পাশ তো হামেশাই দেখছি হে,—বি-এ এম-এ পাশ করা উকিলের বহরও দেখেছি। একেবারে ঝর ঝর ক'রে জলের মত—অ্যাঁ!

শশী কুণ্ঠিতভাবে সংক্ষেপে ইংরেজী শেখার ইতিহাস প্রকাশ করিয়া

বলিয়া অপরাধীর মতই ন্যায়তীর্থের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিশ শশীর মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাপারটা খানিকটা অনুমান করিয়া লইলেন, শিবশেখর কিছু বলিবার পূর্বেই তিনি বলিলেন, শশীশেখরের জন্যে তোমার পুরস্কৃত করা উচিত শিবশেখর। শশিশেখরের এ সাধনা একলব্যের সাধনার সঙ্গে তুলনীয়।

শিবশেখর হাসিয়া বলিলেন, পুরস্কৃত না করলেও তিরস্কার করব না হরিশ, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমার মনোভাব আমি বুঝতে পেরেছি।

হরিশও হাসিয়া বলিলেন, বুঝবে বইকি শিবশেখর, আমাদের পরস্পরকে জানা যে অনেক দিনের। বাল্যকালে চীৎকার ক'রে ডাকলে তুমি চীৎকার ক'রে সাড়া দিয়ে প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসতে, আবার আম-জাম চুরির মতলব নিয়ে যখন চুপি চুপি জানালার ধারে দাঁড়াতাম, তখন তুমিও বেরিয়ে আসতে চুপি চুপি খিড়কির দোর দিয়ে। আমাকে বুঝতে কোনদিনই তোমার ভুল হয় না। যে দিন ভুল হবে, সে দিন বুঝব তুমি দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছ, মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হয়েছে তোমার। সে দিন তুমি তোমার গৃহিণীকেও বুঝতে পারবে না।

শিবশেখরের অন্তরঙ্গের দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। শশিশেখর এবং অল্পবয়স্কেরা লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিল। শিবশেখরও লজ্জিত হইলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, রসের আধিক্য হ'লে বিকার হয় হরিশ ; তুমি বৈদ্যের শরণাপন্ন হও।

হরিশ বলিলেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্রও তোমার পড়া আছে ন্যায়তীর্থ, আজ রাত্রে আমার বাড়িতে তোমার আহ্বান রইল। ষড় রস আস্বাদন করতে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করা যাবে। বাবাজীকেও নিয়ে যেতে হবে। বাবাজীকে খাইয়ে-দাইয়ে তারপর দুজনে ব'সে একসঙ্গে খাব, বুঝলে ?

মজলিস শেষ করিয়া ন্যায়তীর্থ বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, গৃহিণী যেন প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মুখে তাঁহার শঙ্কার ছায়া। ব্যস্ত হইয়া ন্যায়তীর্থ প্রশ্ন করিলেন, কি হয়েছে শিবরাণী, তুমি এমন ভাবে দাঁড়িয়ে?

শিবরাণী কুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন,—হ্যাঁ গো, শশী নাকি তোমাকে না জানিয়ে ইংরেজী শিখেছে?

হাসিয়া শিবশেখর বলিলেন,—হ্যাঁ। সাহেবের সঙ্গে চমৎকার ইংরেজীতে কথা কইলে! তুমি রত্নগর্ভা!

—তুমি রাগ করেছ? সত্যিই শশী অন্যায় করেছে।

—না না না, রাগ করব কেন শিবরাণী, শশী আমাদের বংশগৌরব উজ্জ্বল করেছে। এ কি রাগ করবার কথা?

এতক্ষণে শিবরাণীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন, আমার কিন্তু ভারি ভয় হয়েছিল। তার ওপর খড়মের শব্দ শুনে—আজ তোমার খড়মের শব্দ টোলের বারান্দা থেকে শোনা যাচ্ছিল!

শিবশেখর শিবরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ছোট একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—রাগ নয়, দুঃখ আমার হয়েছিল শিবরাণী; শশিশেখরের এ কথাটা এতদিন ধ'রে আমার কাছে গোপন ক'রে রাখাটা উচিত হয়নি।

সন্তানের অপরাধ শিবরাণীই যেন মাথায় করিয়া লইলেন, মাথা হেঁট করিয়া বলিলেন,—সত্যিই এ শশীর অপরাধ। আমি শশীকে বলব।

—না না না! উপযুক্ত ছেলে—তা ছাড়া, শশী আজও পর্যন্ত কোন দুঃখ আমাদের দেয়নি। এ নিয়ে তাকে কিছু বললে সে কি মনে করবে? তা ছাড়া, বউমা কি মনে করবেন?

—কি মনে করবেন? শশীই বা কি মনে করবে? কেন করবে?

শিবরাণী আশ্চর্য হইয়া গেলেন।

অল্পক্ষণ চিন্তা করিয়া শিবশেখর বলিলেন,—নাঃ, অপরাধের চেয়ে গুণের পরিচয় শশীর বেশী। তাকে আমার পুরস্কৃত করাই উচিত। তুমি অনিরুদ্ধ স্বর্ণকারকে একবার ডাকবে তো, বউমার জন্যে একজোড়া রুলি গড়াতে দেব, শশীর জন্যে একটি আংটি আর চন্দ্রশেখরের জন্যে বিছেহার।

চন্দ্রশেখর শশিশেখরের এক বৎসরের খোকা।

শিবরাণী হাসিয়া বলিলেন,—আর ছেলের মা বুঝি বাদ যাবে?

ন্যায়তীর্থও হাসিলেন, বলিলেন,—স্ত্রীলোকের ঈর্ষা সাহিত্যকারদের মিথ্যা কল্পনা নয়; অলঙ্কারের বিষয়ে মাতা কন্যার ঈর্ষা করে, কন্যা মাতার ঈর্ষা করে।

শিবরাণী ঘাড় নাড়িয়া হাসিতে হাসিতেই বলিলেন,—আর পুরুষেরা?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন, পুরুষেরা যা নিয়ে বিবাদ করে, ঈর্ষা করে, ভগবান তার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। সাম্রাজ্য দূরের কথা, সামান্য বিষয় আমার নেই শিবরাণী। ক'বিঘে ব্রহ্মত্র, তাও নারায়ণের। দাও এখন আমার আহ্নিকের জায়গা ক'রে দাও।

পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মাটির ঘর, দেওয়ালগুলি রাঙা মাটির গোলা দিয়া নিকানো; প্রদীপের মৃদু আলোয় চারিদিকে একটি নম্র, পরিচ্ছন্ন শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পিলসুজের উপর প্রদীপটি জ্বলিতেছিল, তাহারই সম্মুখে আসনের উপর বসিয়া শশিশেখর কি লিখিতেছিল। ঘরের ভেজানো দুয়ার ঠেলিয়া শিবশেখর ঘরে প্রবেশ করিলেন। শশিশেখর কিন্তু মুখ ফিরাইল না, পিছন দিক হইতেও শিবশেখর পুত্রের একাগ্রতার গভীরতা সুস্পষ্টরূপেই অনুভব করিলেন। একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবেই ডাকিলেন, শশী!

সে আহ্বানে সচকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া শশী বিস্ময়ে যেন অভিভূত হইয়া গেল।

তাহার বিবাহের পর ন্যায়তীর্থ কখনও তাহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন নাই। শিবশেখর কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন,—কোন আলোচনা করছ বুঝি ?

শশী ততক্ষণে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাপের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া বলিল,—আমাকে কিছু বলছেন ?

হাসিয়া শশিশেখর বলিলেন,—আমাকে দেখে এত চঞ্চল হচ্ছ কেন শশী! তুমি উপযুক্ত হয়েছ, পাণ্ডিত্য অর্জন করেছ। এখন আমরা পিতা-পুত্রে আলোচনা করব, তর্ক করব।

শশী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—তোমার কাছে আমার কিছু শিক্ষার বিষয় আছে শশী। পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা আমি তোমার কাছে পেতে চাই। ইংরেজী ভাষা আমি জানি না,—তুমি আমায় অনুবাদ ক'রে বলবে, আমি শুনব।

শশিশেখর এবারও মুখে কথার জবাব দিল না, নীরবে বাপের পায়ের ধূলো লইয়া মাথায় স্পর্শ করিল। স্নেহের উচ্ছ্বসিত আবেগে ন্যায়তীর্থের কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন,—তুমি আমার মুখোজ্জ্বল-কারী পুত্র। তুমি দীর্ঘজীবী হও, ধর্মে জ্ঞানে নিষ্ঠা তোমার অটুট থাক।

শশী নীরবে মাথা নত করিয়া আশীর্বাদ গ্রহণ করিল। শিবশেখর বোধ করি শশীর একাগ্রতার কথা তখনও ভুলিতে পারেন নাই, তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন,—এমন একাগ্রভাবে কি লিখছিলে শশী ? কোন পত্র কি ?

শশী কুণ্ঠিত মৃদুস্বরে বলিল,—আজ্ঞে না। আমি বেদান্ত ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনার চেষ্টা করছি।

ন্যায়তীর্থের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। তিনি কোনও কথা না বলিয়া বিপুল আগ্রহে শশীর আসনে বসিয়া খাতাখানি টানিয়া লইলেন। পরক্ষণেই বলিলেন,—আমার চশমা জোড়াটা আন ত শশী।

শশী চশমা আনিয়া হাতে দিতেই গভীর মনঃসংযোগ করিয়া শশীর লেখার উপর তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

"শব্দস্পর্শাদয়োবিদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততোবিভক্তা তৎসম্বিদৈকরূপান্ন ভিদ্যতে॥"

ন্যায়তীর্থ শ্লোকের নীচের টীকায় মনোনিবেশ করিলেন। অদ্ভুত! এত চমৎকার টীকা করিয়াছে শশিশেখর! ন্যায়তীর্থ শ্লোকের পর শ্লোক, পাতার পর পাতা পড়িয়া চলিলেন।

রাত্রি প্রায় দু-পহর হইয়া আসিল। গৃহিণী শিবরাণী আসিয়া কাসিয়া সাড়া দিয়া স্বামীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন। ন্যায়তীর্থ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া পড়িতে পড়িতেই বলিলেন,—কি, হ'ল কি?

—রাত্রি যে দুপুর গড়িয়ে এল।

—কি হয়েছে তাতে? আমার শুতে বিলম্ব আছে।

—বউমা চাঁদকে কোলে ক'রে দাওয়ায় ব'সে ব'সে ঢুলছেন। মশা-য় যে খেয়ে ফেললে! শশীও যে শুতে পাচ্ছে না।

—ও! বলিয়া খাতার পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া আবার বলিলেন,—তত্ত্ববিবেক অধ্যায়টা শেষ হ'লেই উঠব। একটু অপেক্ষা কর। আমি যা পারিনি, শশী তাই করেছে। শশী গ্রন্থ রচনা করেছে।

অধ্যায়টি শেষ করিয়া তিনি খাতাখানি হাতে লইয়া উঠিয়া আপনার ঘরে আসিয়া বসিলেন। শিবরাণী প্রশ্ন করিলেন,—শশী গ্রন্থরচনা করেছে?

বেদান্তের প্রভাব হইতে তখনও ন্যায়তীর্থ মুক্ত হন নাই, তবুও একাগ্র গম্ভীর মুখে অল্প একটু হাসি টানিয়া বলিলেন—হুঁ।

স্নেহ-গৌরবে পুলকিত শিবরাণী বলিলেন,—কেমন হয়েছে ?

—সুন্দর, চমৎকার ! কিন্তু—

—কিন্তু কি ?

—সঠিক এখন বুঝতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে যেন জ্ঞানে শুষ্কতা একটু প্রকট হয়ে উঠেছে।

শিবরাণী তেলের বাটি, জল ও গামছা লইয়া স্বামীর পায়ের তলায় বসিয়া বলিলেন,—সে তুমি দেখে-শুনে দিয়ো।

ন্যায়তীর্থ চিন্তা-বিভোর অবস্থাতেই বলিলেন—দেব।

স্বামীর একটা পা টানিয়া লইয়া শিবরাণী বলিলেন,—কি এত ভাবছ বল তো ?

মৃদু হাসিয়া এবার যেন কতকটা সচেতন ভাবে ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—বড় কঠিন চিন্তা করছিলাম শিবরাণী। ফলভোগের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে মনে।

শিবরাণী রহস্যের সুরেই হাসিয়া বলিলেন,—আমার এক মুস্কিল হয়েছে বাপু, স্বামী পণ্ডিত, ছেলে পণ্ডিত, কে যে কি বলছে, মূর্খ মানুষ আমি, বুঝতেই পারি না। আবার ওই চাঁদটা, সেও এক পণ্ডিত হবে আর কি !

গম্ভীর মুখেই ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—এইবার সংসার ত্যাগ ক'রে ভগবানের শরণ নেওয়া উচিত হয়েছে শিবরাণী। কিন্তু প্রলোভনও হচ্ছে, এমন ছেলে নিয়ে ঘর করি—বাপ-বেটায় মিলে আগেকার কালের মত পাণ্ডিত্যে দিগ্বিজয় ক'রে আসি। কিন্তু বর্তমানের সুখের মধ্যেই নাকি ভবিষ্যতের দুঃখ লুকিয়ে থাকে, সেই হেতু ফলভোগের অধিকার গীতায় নিষিদ্ধ। চল, এইবার আমরা কোনও তীর্থে গিয়ে বাস করব।

শিবরাণী অবাক হইয়া গেলেন। ন্যায়তীর্থের এমন সঙ্কল্পের কথা তাঁহার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত, ইহার পূর্বে কোনও দিন ঘুণাক্ষরেও

ন্যায়তীর্থ প্রকাশ করেন নাই, শিবরাণীও আভাষে পর্যন্ত অনুমান করিতে পারেন নাই।

কিছুক্ষণ পর বিস্ময়ের ঘোরটা কাটাইয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন,—তোমার যত উদ্ভট কল্পনা! সুখের মধ্যে দুঃখ লুকিয়ে থাকে?

আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কথাটা যেন ভাবিয়া বুঝিয়া দেখিলেন, তারপর বলিলেন,—থাকে ত থাক্। এই যদি বিধানই হয়, তবে তা মাথা পেতে নিতেও হবে।

ন্যায়তীর্থ চুপ করিয়া রহিলেন। এমনই ধারার উদ্ভট চিন্তায় মন তাঁহার উদাসীন হইয়া উঠিয়াছে।

প্রগাঢ় যত্নের সহিত সমস্ত খাতাখানি পড়িয়া, অনেক চিন্তা করিয়া শশিশেখরের রচনার কয়েকটি স্থান ন্যায়তীর্থ সংশোধন করিয়া দিলেন; শশিশেখর খাতাখানি লইয়া ঘরে আসিয়া সংশোধন করা জায়গাগুলি দেখিতে আরম্ভ করিল। প্রথম সংশোধন শশী দেখিল—'সুস্পষ্ট' শব্দটিকে কাটিয়া ন্যায়তীর্থ লিখিয়াছেন 'বিস্পষ্ট'। আবার সে পাতা উল্টাইল। বেলা অনেক হইয়াছে, বধূ চারু আসিয়া বলিল,—মা স্নান করতে বললেন। বেলা কত হয়েছে দেখ তো!

শশী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া খাতাটির সংশোধিত পাতাগুলিতে কাগজ দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া উঠিয়া পড়িল। শিবরাণী নিজেই ততক্ষণে আসিয়া হাজির হইলেন, বলিলেন,—বাবা, তোমাদের বাপ-বেটাব বিদ্যের আঁচে আমাদের শাশুড়ী-বউয়ের হাড়ে কালি পড়ল। গরম ভাত যে কেমন, তা ভুলেই গেলাম।

শশিশেখর অপরাধ বোধ করিল, তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল,—কই, এর আগে তো ডাকনি তুমি!

শিবরাণী হাসিয়া বলিলেন—দোষ হয়েছে বাবা! তোমাদের ক্ষিদে

পেয়েছে, সেটা আমার মনে ক'রে দেওয়া উচিত ছিল! ক্ষিদে তেষ্টা বুঝতে না পারা পণ্ডিতদের একটা লক্ষণ, ওটা আমি জানতাম না! ব'স, আমি মাথায় তেলটা দিয়ে দিই। ছেলের মাথায় তেল দিতে দিতে শিবরাণী বলিলেন,—হাঁরে, উনি তোর খাতা দেখে কেটেকুটে ঠিক ক'রে দিলেন? শশিশেখর চিন্তান্বিত হইয়াই তেল মাখিতেছিল, মায়ের কথা তাহার কানে ঢুকিলেও মনকে যেন স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না, সে চিন্তা-বিভোর ভাবেই উত্তর দিল,—হ্যাঁ, দিয়েছেন।

শিবরাণী বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—কি ভাবছিস এত?

শশী উত্তর দিল,—ভাবিনি। এমনি আর কি।

রাত্রেও শশী এমনি চিন্তান্বিত ভাবে খাতাখানি খুলিয়া বসিয়া ছিল। চারু আসিয়া ছেলেকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। স্বামীকে এমনি ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল,—হ্যাঁ গা, তুমি সারাদিন এমন ক'রে কি ভাবছ বল তো?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিল,—বড় সমস্যায় পড়েছি চারু! বোধ হয় এমন সমস্যায় জীবনে কখনও পড়িনি।

চারু বলিল,—বেশ! ঠাকুরের কাছে যাও না! দেশ-বিদেশের লোক এসে তোমার বাপের কাছ থেকে মুস্কিলের আসান ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, আর তুমি ঘরে ব'সে মুস্কিল নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছ!

শশী কথার উত্তর দিল না, একটু হাসিল।

চারুর মনে হইল শশী তাহাকেই অবজ্ঞা করিয়া হাসিল, এইজন্য সে রাগ করিয়াই প্রশ্ন করিল,—হাসলে যে?

শশী আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—দরজাটা বন্ধ ক'রে

দাও। তারপর বলছি। চারু দরজা বন্ধ করিয়া দিল, শশী বলিল,—ব'স এইখানে, একটা পরামর্শ দাও দেখি। তুমি আমার সচিব, সখী, অনেক কিছু। একথা তুমি ছাড়া আর কাউকে বলার আমার উপায় নেই, মাকে পর্যন্ত না। কথা যে বাবাকে নিয়েই।

কথাটার ভূমিকা শুনিয়াই চারু ভয় পাইয়া গেল, সে শঙ্কিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শশী বলিল অত্যন্ত মৃদুস্বরে,—বাবা যে সংশোধনগুলি করেছেন, সেগুলি ভাষার দিক দিয়েই সংশোধন করেছেন, দু-এক জায়গায় বৌদ্ধ-শূন্যবাদ সম্পর্কে মন্তব্যে তিনি অত্যন্ত কঠোর হয়ে পড়েছেন। কিন্তু দুই-ই আমার মতে অন্যায় হয়েছে। ভাষার দিক দিয়ে প্রাচীন ধারা অনুযায়ী আধুনিক লেখার সংশোধন খাপ খায় না; কটু হয় শুনতে, আরও অনেক দোষ হয়। আর বৌদ্ধশূন্যবাদ কেউ গ্রহণ করতে না পারে, কিন্তু বিদ্বেষ নিয়ে তাকে বিচার বিশ্লেষণ করতে গেলে গ্রন্থকারকে ধর্মভ্রষ্ট হতে হবে।

চারুর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, ভয়ার্ত অথচ মৃদুস্বরে সে বলিল,—না, না, ওগো, বাবাকে তুমি অমান্য ক'র না।

শশী চিন্তিত ভাবে বসিয়া থাকিতে থাকিতে অস্বীকারের ভঙ্গীতে ধীর-ভাবে বার কয় মাথা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিল,—জ্ঞান হ'ল সত্য, সত্যের মর্যাদা আমি ক্ষুণ্ণ করতে পারব না চারু।

বহুদিনের রঙ-করা মাটির পুতুলের মত চারু বসিয়া রহিল।

কয়েকদিন পর সেদিন প্রাতঃকালেই টোলের একটি ছাত্র বাড়ির ভিতর আসিয়া শশিশেখরকে ডাকিল,—অধ্যাপক মশায় ডাকছেন আপনাকে।

শশী সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া আসিল। টোলের ছেলেরা বারান্দায় বসিয়া

পড়িতেছে, ন্যায়তীর্থ অভ্যাসমত ছোট চৌকিটির উপর বসিয়া আছেন, শশী আসিয়া বিনীতভাবে প্রশ্ন করিল, আমাকে ডেকেছেন?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—হ্যাঁ। ব'স। তোমার সঙ্গে কিছু পরামর্শ আছে। ব'স, কম্বলের উপর ব'স। দেখ, কয়েকদিন ধ'রেই আমি একটা কথা ভাবছি—ভাগবতধর্মের তত্ত্বব্যাখ্যা বোধ হয় আমার লিপিবদ্ধ ক'রে যাওয়া উচিত। কি বল তুমি?

শশী উৎসাহিত হইয়া বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ। এটা আপনার কর্তব্য ব'লে আমার মনে হয়।

—তা হ'লে আরম্ভ ক'রে দেওয়াই উচিত, কি বল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

এবার মৃদু হাসিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—দেখ, কাজটা আমি আরম্ভ ক'রে দিয়েছি। অপেক্ষা কর, আমি আসছি। বলিয়া তিনি উঠিয়া ব্যস্ত হইয়া খালি পায়েই বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেলেন। শশী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বাপের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি সত্ত্বেও তাঁহার আজিকার এই উৎসাহ দেখিয়া সে মনে মনে কৌতুক বোধ না করিয়া পারিল না। চারিদিকে ছাত্রেরা মৃদুগুঞ্জনে পড়িতেছে; তাহার মধ্য হইতে সহসা একটা কথা যেন তাহার কানে আসিয়া খট করিয়া বাজিল। কথাটা—বিস্পষ্ট। শশী ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিল,—শোন। 'বিস্পষ্ট' না ব'লে 'সুস্পষ্ট' বল। 'বিস্পষ্ট' কথাটা ধ্বনির দিকে রূঢ় আর ব্যবহারেও প্রায় অপ্রচলিত।

ছেলেটি বলিল,—আজ্ঞে না, ওটা বিশেষ রূপে স্পষ্ট কিনা। সু-শব্দ সুন্দর-দ্যোতক—ওতে কাব্যের মাধুর্য আছে।

হাসিয়া শশী বলিল,—তা হ'লে সু-কঠিন্ প্রয়োগ-বিধিটা ভুল হ'ত। প্রচলন ভেদে ধাতুগত অর্থের তারতম্য হয়ে যায়, সেটাকে স্বীকার ক'রে নিলে শব্দের মধ্যে অর্থের ব্যাপকতা বাড়ে; তাতে ভাষার গৌরব বৃদ্ধি হয়।

ঠিক এই সময়েই গলার সাড়া দিয়া ন্যায়তীর্থ বাহির হইয়া আসিলেন। আসনে বসিয়া খাতাখানি কোলের উপর রাখিলেন, তারপর বলিলেন,—তুমি 'বিস্পষ্ট' স্থলে সুস্পষ্ট ব্যবহারের পক্ষপাতী শশী?

শশী বলিল,—আজ্ঞে হ্যাঁ, শব্দের ধ্বনি—

ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—তোমার যুক্তি শুনেছি আমি। তারপর ছাত্রটির দিকে চাহিয়া বলিলেন,—ওটা তুমি এখন 'বিস্পষ্টই' প'ড়ে যাও, পরে আমি বিচার ক'রে দেখব।

ছাত্রটি চলিয়া গেল। ন্যায়তীর্থ নীরব হইয়াই বসিয়া রহিলেন, খাতাখানি কোলের উপরেই পড়িয়া রহিল; তিনিও শশীর হাতে তুলিয়া দিলেন না, শশীও নিজে হাত বাড়াইয়া লইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শশী বলিল,—তা হ'লে—

ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—হ্যাঁ, যেতে পার তুমি। মনে খানিকটা উত্তাপ জমা হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে যেন তাঁহার কোন হাত ছিল না। ধীরে ধীরে সে উত্তাপ কমিয়া আসিলে মনে মনে তিনি শশীর যুক্তিকে স্বীকার করিয়া লইলেন। ছাত্রটিকে ডাকিয়া এ কথা বলিবার পূর্বে তিনিও শশীকে কথাটা জানানো প্রয়োজন মনে করিলেন। শশীর রচনার মধ্যেও তিনি প্রথমেই 'সুস্পষ্ট'কে কাটিয়া 'বিস্পষ্ট' করিয়াছেন। সেটিও নিজে হাতে কাটিয়া দিবার সঙ্কল্প লইয়া শশীর ঘরের দুয়ারে আসিয়া ডাকিলেন,—শশী!

ঘরের দুয়ার খুলিয়া দিল পুত্রবধূ চারু। ন্যায়তীর্থ ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শশী নাই। চারু ঘর পরিষ্কার করিতেছিল। ন্যায়তীর্থ বাহিরে আসিতে গিয়া আবার ঘুরিলেন, শশীর কলমটি তুলিয়া লইয়া খাতাখানি খুলিলেন। দেখিয়াও তিনি যেন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না! তাঁহার লেখা 'বিস্পষ্ট' শব্দ কাটিয়া আবার 'সুস্পষ্ট' লেখা হইয়া গিয়াছে! কলমটি তিনি রাখিয়া দিলেন। তারপর একে একে পাতা উল্টাইয়া গেলেন।

তাঁহার সমস্ত সংশোধন শশী কাটিয়া দিয়াছে। ন্যায়তীর্থের হাত কাঁপিতে-ছিল, পাতার লেখা সেই কম্পনহেতু আর পড়া যায় না; তিনি খাতাখানি রাখিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িলেন। দেওয়ালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—বউমা, খড়ম জোড়াটা এগিয়ে দাও তো।

চারু খড়ম জোড়াটি আনিয়া একরূপ পায়ে পরাইয়া দিল। ন্যায়তীর্থ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। চারু শঙ্কায় বিবর্ণ হইয়া গেল, নীচে রান্নাঘরে শিবরাণীর হাতের দ্রুত-সঞ্চালিত খুন্তি স্তব্ধ হইয়া গেল। এ কেমন খড়মের শব্দ! অপটু পায়ের চালিত খড়মের শব্দের মত ছন্দহীন কেন? অথবা অধীর ন্যায়রত্নের পায়ের অস্থিরতা হেতু এমন অসমচ্ছন্দে পা পড়িতেছে।

ন্যায়তীর্থ যেন অতিমাত্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছেন, অথচ সেই স্তব্ধতার মধ্যে তাঁহার নিকটে আসিবার অবসরও কেহ পায় না। পুঁথির সাগরে তিনি ডুব দিয়াছেন। যে সময়টা পড়েন না, সে সময় তিনি ঠিক স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন। কথা বলিলে দুই একটার উত্তর দেন; বাকিগুলি নিরুত্তরই রহিয়া যায়। সেদিন তখন তিনি বসিয়াই ছিলেন, বন্ধু হরিশ চাটুয্যে এক-খানি কাগজ হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ন্যায়তীর্থ সংক্ষেপে আহ্বান করিলেন,—এস।

হরিশ স্থূল দেহখানি লইয়া ধপ করিয়া কম্বলের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন—হ্যাঃ, হাঁপ ধরে গেল, মোটা শরীর নিয়ে ছোটা কি সোজা কথা! জিভ বেরিয়ে গেল। ক'টি মেয়ে দেখে যা হাসলে শিবশেখর, লজ্জায় আমি থেমে গেলাম।

ন্যায়তীর্থ অল্প একটু হাসিলেন, নিতান্ত ভদ্রতা রক্ষার জন্য শুষ্ক হাসি।

হরিশ কাগজখানি ন্যায়তীর্থের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন,—নাও দেখ!

—কি?

—সেই সাহেবের কাণ্ড। 'ভারতে কি দেখিলাম' তাই লিখেছে খবরের কাগজে। এখানকার কথা, তোমাদের পিতা-পুত্রের খুব প্রশংসা ক'রে সব লিখেছে। অমর আমাকে পত্র লিখেছে, কাগজও পাঠিয়ে দিয়েছে।—অমর হরিশের বড় ছেলে, কলিকাতায় চাকরি করে।

কাগজখানি হাতে লইয়া ন্যায়তীর্থ হাসিয়া বলিলেন,—দুধ ব'লে পিটুলি গোলা খাওয়াচ্ছ! এ যে ইংরেজী!

হরিশ বলিলেন,—বাবাজী কই, আমাদের পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিত-প্রবর? পড়ুক, প'ড়ে শোনাক আমাদের! তবে অমর লিখেছে আমাকে মোটামুটি। সাহেব বলেছে—বলিয়া পকেট হইতে অমরের পত্র বাহির করিয়া পড়িলেন—একটি বড় দুর্গম গ্রামের মধ্যে এমন প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার। সমুদ্রের তলদেশের মণিরত্নের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। অথচ দেশের গভর্ণমেণ্ট এঁদের খোঁজ রাখেন না, এর চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু হ'তে পারে না। পণ্ডিত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতিতে মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁর পুত্র সংস্কৃত ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত, প্রাচ্য-প্রতীচ্য দর্শনে ইনি পিতার মতই সুপণ্ডিত। ভাবীকালে এঁর ভবিষ্যৎ—

বাধা দিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—থাক্। প্রশংসার কামনায় শাস্ত্রচর্চা করিনি হরিশ, ওতে আমার প্রয়োজন নাই। ওটা বরং শশীকে পাঠিয়ে দাও। তরুণ বয়স, তাতে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাব কিছু আছে—সে পড়ে খুশি হবে।

হরিশ হাসিয়া বলিলেন,—সেই ভাল। ওহে, এটা আমাদের বাবাজীকে দিয়ে এস তো; কি নাম তোমার?

হরিশ বলিলেন,—কিন্তু তোমার এমন ভাবান্তর হ'ল কেন বল দেখি? তুমি যেন কেমন হয়ে গেছ!

শিবশেখর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—তোমার কাছে গোপন করব না হরিশ। আমি বড় অশান্তি ভোগ করছি; ভবিষ্যতের চিন্তায় একটু ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। এই টোল, দেবসেবা চলবে কি ক'রে?

হরিশ বলিলেন,—তোমার এমন পণ্ডিত পুত্র—

বাধা দিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—এ পাণ্ডিত্যের প্রভাবে তো অন্নবস্ত্র হয় না হরিশ! অর্থের প্রয়োজন, দিন দিন সংসার বাড়ছে। কিন্তু শশী বাড়ি থেকে বেরোবে না। আমি তাকে বলতেও পারছি না। তুমি যদি তাকে একটু বুঝিয়ে বল হরিশ।

হরিশ কিছু বলিবার পূর্বে শশীই কাগজখানি হাতে বাহির হইয়া আসিল। প্রসঙ্গটা তখনকার মত বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু অপরাহ্ণে শশী নিজেই প্রসঙ্গটা তুলিয়া বলিল,—আমি এইবার বাড়ি থেকে বের হতে চাই বাবা; উপার্জনের চেষ্টা করতে চাই আমি।

পলকের জন্য ছেলের মুখের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া পরক্ষণেই দৃষ্টি ফিরাইয়া সম্মুখে নিবদ্ধ করিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—বেশ!

মাইল কয়েক দূরে মহকুমা শহরে শশিশেখর এক টোল খুলিয়া বসিল। চাকরির চেষ্টা সে করিয়াছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যাপকটির কাছেও সে গিয়াছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অভাবে সেখানে কোন সম্মানজনক পদলাভ সম্ভব হয় নাই। স্কুলে চাকরির ব্যবস্থা হইতে পারিত, কিন্তু শশী নিজে তাহা প্রত্যাখ্যান করিল, আসিয়া বলিল,—ষড়্‌দর্শন প'ড়ে অবশেষে 'কীলোৎপাটীব বানর কথা' পড়াতে পারব না আমি, মাপ করবেন।

দেশে ফিরিয়া এই শহরটিতে কয়েকজন সরকারী কর্মচারীর উৎসাহে সে টোল খুলিয়া বসিল। সেই ইউরোপীয় পণ্ডিতটির লেখার কথা ইহারই মধ্যে দেশে প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল। সরকারী কর্মচারীরা শশিশেখর সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন—আপনি আরম্ভ করুন টোল; সরকারী সাহায্য আমরা যেমন ক'রে হোক ক'রে দেব।

শশী টোল খুলিয়া প্রচার করিল, প্রাচ্য দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্য দর্শনের মর্মও সে ছাত্রদের শিক্ষা দিবে।

অকস্মাৎ সেদিন পিতৃবন্ধু হরিশ চট্টোপাধ্যায়ের বড়ছেলে অমর শশীর টোলে আসিয়া হাজির হইল। কলিকাতা হইতে বাড়ি আসিবার পথে স্টেশনে নামিয়া গাড়ি না পাইয়া শশীর শরণাপন্ন হইল। পরম সমাদরে শশী অভ্যর্থনা করিয়া তাহার পরিচর্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

অমর বলিল,—তুমি, ভাই, এমন খাতির করলে তো আমাকে বিদেয় নিতে হয় এখুনি!

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতটি অপ্রতিভের মত হাসিল মাত্র, উত্তর দিতে পারিল না। অমর বলিল,—তুমি শুধু বন্ধু নও। তুমি আমাদের গৌরব। সেদিন কাগজে যখন ঐ লেখাটা পড়লাম শশী, তখন—বলব কি তোমাকে—আনন্দে আমার চোখে জল এল। আমাদের মেসের প্রত্যেককে আমি কাগজখানা দেখিয়েছি, আর বলেছি—দেখ, আমাদের গ্রাম কেমন দেখ!

শশীর চোখমুখ এবার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেও লজ্জিতভাবে বৃষ্টিধারানমিত ফলবান বৃক্ষের মতই সে মাথা নত করিল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শশী বলিল,—তোমাকে পত্র আমি লিখতাম অমর, তা, দেখা হয়ে গেল ভালই হ'ল। কিছু চাঁদা তোমাকে দিতে হবে।

—তোমার টোলের জন্য?

—না না। আমাদের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর সুধাকৃষ্ণ মুখুজ্জে

মহাশয় উদ্যোগ ক'রে জেলাতে এবার পণ্ডিত-সভা আহ্বান করেছেন, আমায় করেছেন সম্পাদক। অবশ্য টাকাকড়ি সাহেবের ঠেলাতেই উঠবে। তবু সম্পাদক যখন হয়েছি তখন আমি দু-দশ টাকা যা পারি তোলবার চেষ্টা করছি।

অমর একেবারে লাফাইয়া উঠিল। বলিল,—নিশ্চয় দেব। আর কলকাতায় আমাদের জেলার যে সব লোক আছেন—তাঁদের কাছেও যাব আমি। তুমি বরং সায়েবের সই-করা কয়েকখানা চিঠি আমায় দিও। জেঠামশায় নিশ্চয় সভাপতি হবেন?

—না, তাঁকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি করা হয়েছে। কাশীর মহামহোপাধ্যায় শ্যামাচরণ তর্করত্ন হবেন সভাপতি।

—বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে! তারপর নীরবে কিছুক্ষণ অমর যেন কল্পনায় ভাবী সভার রূপ দেখিয়া লইয়া আবার বলিল,—তোমরা বাপ-বেটায় একদিকে দাঁড়ালে যেখান থেকেই যিনি আসুন শশী, আমাদের জেলারই জয় হবে এ একেবারে নিশ্চিত।

শশী চুপ করিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, পরাধীন দেশে পাণ্ডিত্যের কোন অর্থ হয় না অমর! আর্থিক ব্যর্থতার কথাই শুধু বলছি না আমি; পরাধীনতার জন্যে এমন মনোভাব হয়েছে যে, প্রাচীন পণ্ডিত ভুল বললেও তার প্রতিবাদ করাটা পর্যন্ত অন্যায়ের তালিকা-ভুক্ত হয়ে পড়েছে।

অমর বলিল,—তার জন্যে ভাবনা কি তোমার, জ্যেঠামশায় তোমার পাশে থাকবেন, তিনি তো আর নবীন নন।

কথাটা শেষ করিয়া অকস্মাৎ সে হাসিয়া ফেলিল, বলিল—নবীন বলতে একটা কথা মনে হ'ল। তোমার বউ কোথায়?

হাসিয়া শশী বলিল—বাড়িতে।

—এখানে নিয়ে এস। কত আর হাত পুড়িয়ে খাবে?

—তোমারও তো তাই। ঐ যে বললাম, ও স্বাধীনতা পর্যন্ত আমাদের নেই।

অমর সরবে হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কথাটা বড় ভাল বলেছ শশী!

এই বিংশ শতাব্দীতেও জেলার সদর শহরটি পণ্ডিত-সভার অধিবেশনে চঞ্চল উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুর সুধাকৃষ্ণবাবু বয়সেও প্রাচীন এবং হিন্দুধর্মেও অনুরাগী ব্যক্তি। দীর্ঘকাল শাসনবিভাগে কাজ করিয়া মধুচক্র হইতে মধুনিষ্কাশনের কৌশলেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল প্রচুর। তিনি নিজে অধিবেশনে উপস্থিত থাকায় জেলার ধনী জমিদার, রায়সাহেব, রায়বাহাদুর, এমন কি জেলার একমাত্র রাজাসাহেব পর্যন্ত সভা অলঙ্কৃত করিয়া হাজির ছিলেন। সাহেব হাসিলে তাঁহারা হাসিতেছিলেন, গম্ভীর হইলে গম্ভীর হইতেছিলেন; আর কোন পণ্ডিতের বক্তব্য শেষ হইলে হাততালি দিতেছিলেন—সজোরে।

অধিবেশন-প্রারম্ভে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সভার উদ্বোধন করিলেন, বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিলেন,—এই জেলায় এখনও সংস্কৃত-চর্চার গৌরব অটুট আছে। বিশেষ ক'রে পণ্ডিত শিবশেখর ন্যায়তীর্থ ও তাঁর পুত্র পণ্ডিত শশিশেখর ন্যায়তীর্থের গৌরবে এ জেলা গৌরবান্বিত। পণ্ডিত শশিশেখরকে এই প্রসঙ্গে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারছি না। তিনি না থাকলে এ সভা কার্যে পরিণত করা অসম্ভব হ'ত। তিনি নবীন, এবং পাশ্চাত্য ভাষা, পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন ক'রে প্রাচীন কালের রক্ষণশীলতার প্রভাব হ'তে অনেকাংশেই মুক্ত। আজ যুগধর্মকে স্বীকার ক'রে সংস্কৃত সাহিত্য এবং শাস্ত্রীয় সংস্কৃতির উপর নূতন আলোকপাতের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন। সেইজন্যেই

তাঁর এ আন্তরিক প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। এ প্রয়োজনের পূরণের জন্যে মহামহোপাধ্যায় শ্যামাচরণ, পণ্ডিত শিবশেখর প্রমুখ মনীষিবৃন্দ এখানে মিলিত হয়েছেন। আজ তাঁদের কাছে আমাদের নিবেদন উপস্থাপিত ক'রে আমি সবিনয়ে সভা আরম্ভ করবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

পণ্ডিতদের সাধুবাদ এবং রায়বাহাদুরগণের হাততালির মধ্যে সুধাকৃষ্ণ-বাবু উপবেশন করিলেন। পরমুহূর্তেই সভা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ন্যায়তীর্থ শিবশেখর উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। গম্ভীর প্রশান্ত মুখে কঠোর দৃঢ়তা, গায়ে গরদের চাদর, পরনেও দুধের মত সাদা গরদ, অনাবৃত দক্ষিণ বাহুতে সোনার তারের তাগায় একটি প্রবাল ও রুদ্রাক্ষ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। বাঁ হাতে আপনার অভিভাষণটি ধরিয়া বলিলেন,—সমাগত পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করবার জন্যই আমি দণ্ডায়মান হয়েছি। আমি প্রাচীন, কিন্তু বর্তমান এই সভার রীতি-পদ্ধতি সমস্তই নবীন; সত্য বলতে কি, এ ধরণের সভা আমাদের দেশে প্রচলিতই ছিল না। এ রীতি বৈদেশিক। প্রাচীনকালে সভা আহ্বান করতেন রাজা, ধনী, জমিদার যাঁরা তাঁরাই, এবং তারও উপলক্ষ্য ছিল সামাজিক ক্রিয়ানুষ্ঠান। এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে, সে পার্থক্য সূক্ষ্ম হ'লেও শূন্যমণ্ডলের মত অনতিক্রম্য ব'লেই আমার মনে হয়। সামাজিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে সর্বোচ্চে এবং সর্বাগ্রে স্থাপিত করতে হয় যজ্ঞেশ্বরকে। তাঁকে অনুভব ক'রে অনুষ্ঠানের সর্বত্র বিরাজ করে ভক্তিসিক্ত নিষ্ঠা এবং সদাচার; সে প্রভাব এই ব্যবস্থার মধ্যে প্রভাবিত করা অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। এ হ'ল শুষ্ক জ্ঞানপ্রকাশের ক্ষেত্র।

একদল প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত ধ্বনি তুলিলেন,—সাধু সাধু!

ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—সুতরাং এই ত্রুটি পূরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা

আমাদের করা উচিত। সেই জন্যই আপনাদের প্রতি স্বাগত-সম্ভাষণ উচ্চারণ করার পূর্বে যজ্ঞেশ্বরকে এই যজ্ঞস্থলে অধিষ্ঠিত হবার প্রার্থনা আমি জানাব।

সমগ্র সভাস্থল এবার সাধুবাদে মুখর হইয়া উঠিল। শুধু শশিশেখর বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল। কলরব প্রশমিত হইতেই তাহার পিতার কণ্ঠস্বর আসিয়া তাহার কানে পৌছিল। তিনি মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, কিন্তু শশী তাহার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।

তাহার পর মর্মস্পর্শী ভাষায় রচিত শ্লোকে ন্যায়তীর্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানাইয়া বসিলেন। অতঃপর মূল সভাপতি মহামহোপাধ্যায়ের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সভা ভরিয়া উঠিল।

পরদিন ছিল বিচার-সভা।

সভার প্রারম্ভেই শশিশেখর উঠিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল,—আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে। প্রসন্ন হাসি হাসিয়া মহামহোপাধ্যায় বলিলেন,—জ্যোতিষ্কের ভগ্নাংশ থেকেই.জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি, জ্যোতি হ'ল তার জন্মগত সম্পত্তি। কোন্ গুহাতে সে জ্যোতি ব্যাহত হ'ল, ছোট ন্যায়তীর্থ? বল শুনি!

—অদ্বৈত-পরমব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপে ভাসমান কি না?

—নিশ্চয়ই।

—এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত ক'রেই ভাসমান?

—অবশ্য।

—চৈতন্যে যিনি সর্বদা বিরাজিত, আহ্বান ক'রে তাঁর চৈতন্যসম্পাদন প্রচেষ্টা সুতরাং ভ্রমাত্মক?

এবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শশিশেখরের মুখের দিকে চাহিয়া মহামহোপাধ্যায় বলিলেন—স্বীকার করলাম।

ন্যায়তীর্থ সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন,—আমি কিন্তু সম্পূর্ণ স্বীকার করলাম না। স্বপ্নাতুর অবস্থাতেও মানব ভ্রমাত্মক চৈতন্য অনুভব করে। সেখানে আহ্বানের প্রয়োজন আছে।

শশিশেখর বলিল,—জ্ঞানযোগীর ধ্যান নিদ্রাও নয়, স্বপ্নও নয়। যদি স্বপ্ন হয় তবে সে জ্ঞানযোগী নয়, অন্যথায় আহ্বানকারীই ভ্রান্ত—সে-ই স্বপ্নাতুর, চৈতন্যের প্রয়োজন তারই।

মহামহোপাধ্যায় গম্ভীর মুখে বলিলেন,—পণ্ডিত শশিশেখর, সভাপতি হিসাবে তোমাকে আমি নিবৃত্ত হ'তে আদেশ করছি। ন্যায়তীর্থ, আমি আপনাকে সবিনয়ে অনুরোধ করছি!

উভয়েই নিরস্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—মহামহোপাধ্যায় যদি অনুমতি করেন তবে আমি উঠতে পারি। শরীর বড় অসুস্থ ব'লে মনে হচ্ছে আমার।

মহামহোপাধ্যায় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ন্যায়তীর্থ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই পণ্ডিত শশিশেখর যুগধর্মকে স্বীকার করিয়া বৌদ্ধ দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত সমন্বয় করিয়া দর্শনের নূতন অধ্যায় রচনার প্রস্তাব উত্থাপন করিল। তীক্ষ্ণব্যঙ্গে গণ্ডীবদ্ধ মনোভাবকে বিদ্ধ করিয়া অকাট্যযুক্তি দেখাইয়া সুললিত ভাষায় অনর্গল সে বলিয়া গেল।

মহামহোপাধ্যায় তাহাকে স্বীকার করিয়া বলিলেন,—তোমার প্রস্তাব সাধু। তোমাকে আমি সমর্থন করি। কিন্তু সে ভার নিতে হবে তোমাদেরই। আমরা প্রাচীন, আমাদের সে আর সাধ্যাতীত।

বাসায় আসিয়া ন্যায়তীর্থ বসিয়া ছিলেন স্তম্ভিতের মত। জ্বরগ্রস্তের মত মাথার মধ্যে একটা প্রদাহ তিনি অনুভব করিতেছিলেন। পরিপূর্ণ জাগ্রত অবস্থাতেও পারিপার্শ্বিককে তিনি স্পষ্ট প্রত্যক্ষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না। রাজপথে মানুষ গাড়ি ঘোড়া যাইতেছে, আসিতেছে, কলরবের কথা কানে আসিতেছে, কিন্তু চিত্তে স্পর্শানুভূতি যেন হারাইয়া গিয়াছে।

মুখ দিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া, মাথা নাড়িয়া তিনি যেন জাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেন। হাঁ—তিনিই স্বপ্নাতুর, তাঁহারই চৈতন্যের প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া তিনি বালতি হইতে জল লইয়া বার-বার মাথাটা ধুইয়া ফেলিলেন। মাথাটা ধুইয়া তিনি খানিকটা সুস্থ বোধ করিলেন। নিজেই বিছানাটি বিছাইয়া লইয়া শুইয়া পড়িলেন। প্রায় সমস্ত দিনটা আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকিয়া অপরাহ্নে তিনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার ছাত্র মণিভূষণ বলিল,—শশীদাদা এসে-ছিলেন দু-বার। কিন্তু আপনি ঘুমোচ্ছেন দেখে ফিরে গেছেন।

ন্যায়তীর্থ গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন, সে শব্দের উচ্চতায় এবং অস্বাভাবিকতায় ছেলেটি চমকিয়া উঠিল। ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—এবার এলেও তাকে নিষেধ ক'রে দিয়ো, কোন প্রয়োজন নাই।

খড়ম জোড়াটা পায়ে দিয়া তিনি ঘরের মধ্যেই পদচারণা আরম্ভ করিলেন; উচ্চ কঠোর শব্দ—অস্বচ্ছন্দ বা অসমচ্ছন্দ নয়—অত্যন্ত দৃঢ় এবং কঠিন।

কিছুক্ষণ পর আবার ছাত্রটি আসিয়া শঙ্কিত ভাবে দাঁড়াইয়া ন্যায়তীর্থের মুখের দিকে চাহিল। ন্যায়তীর্থ আবার তেমনি ভাবে গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন,—কি?

—রায়বাহাদুর জ্ঞানরঞ্জন বাবু এসেছেন, দেখা করবেন।

ব্যস্ত হইয়া ন্যায়তীর্থ বাহিরে আসিয়া সম্ভ্রমভরেই রায়বাহাদুরকে আহ্বান করিলেন,—আসুন, আসুন!

হে-হে-হে শব্দে এক বিচিত্র হাসি রায়বাহাদুর হাসিয়া থাকেন, সেই হাসি হাসিয়া বলিলেন,—সায়েব পাঠালে আপনার কাছে। যেতে হবে আমার সঙ্গে। বাপ রে বাপ—খাটিয়ে মেরে ফেললে মশায়, আর বলবেন না। আমার দফা রফা, সব তাতেই বেটার আমাকে না হ'লে চলবে না। চলুন, গাড়ি আছে আমার।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—এখুনি?

হে-হে করিয়া আবার হাসিয়া রায়বাহাদুর বলিলেন,—হ্যাঁ হ্যাঁ। খেতাব দেবে মশায়—আপনি তো নেবেন না, তাই আপনার ছেলেকে খেতাব দেবে মহামহোপাধ্যায়। তবু আপনাকে একবার জিজ্ঞেস করা তো দরকার। চলুন, চলুন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—মণি, আমার চাদরখানা দাও তো।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সুধাকৃষ্ণবাবু শশীকে সত্যই স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, তিনি মানুষও ছিলেন সত্যকার গুণগ্রাহী ব্যক্তি। আজিকার এই আহ্বানের মধ্যে আরও একটু উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল। পিতা-পুত্রের এই আকস্মিক মতদ্বৈধের রূঢ়তাটুকু মুছিয়া দিয়া উভয়ের সম্বন্ধের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতিষ্ঠাও ছিল গোপন সঙ্কল্প। শশীকেও তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন। ন্যায়তীর্থকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়া বলিলেন,—আপনার সঙ্গে পরিচয় লাভ ক'রে আমি গৌরব অনুভব করছি ন্যায়তীর্থ। পরম আনন্দলাভ করলাম।

ন্যায়তীর্থ সবিনয়ে বলিলেন,—আপনি জেলার রাজ-প্রতিনিধি; আপনার সঙ্গে পরিচয় আমারও পরম সৌভাগ্য। রাজা-রাজপ্রতিনিধিরাই আমাদের রক্ষক, আপনারাই তো আমাদের ভরসা।

সুধাকৃষ্ণবাবু বলিলেন—অতি সত্য কথা। ত্রুটি আমাদেরই—আমরাই আপনাদের সন্ধান রাখি না, সম্মান করি না। সেই সায়েবের লেখার প্রতি এবার সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আপনাদের সম্মান সরকার করতে চান।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—আমাদের সৌভাগ্য।

—সম্মান অবশ্য উপাধি দিয়ে। তা' সরকারের পত্র পেয়ে আমি হাসলাম। মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ন্যায়তীর্থের গৌরব আর কি বৃদ্ধি হবে! নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—অকিঞ্চিৎকর হ'লেও যখন রাজার দান এবং আমার প্রাপ্য তখন না নিলে উপায় কি বলুন! অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করব।

সুধাকৃষ্ণবাবু চুপ করিয়া গেলেন; কিছুক্ষণ পর বলিলেন,—খুব সুখী হলাম আপনার কথা শুনে। সরকারকে আমি জানাব। শশিশেখরকেও আমরা দু-এক বছরের মধ্যেই উপাধি দেব। আর একটা কথা, শশী আজ বড়ই অন্যায় করেছে—তাকে আপনার মার্জনা করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে অনুতপ্ত হয়েছে।

কঠিন হাসি হাসিয়া ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—তা হ'লে বলছেন, অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে; স্বপ্নাতুর বা তন্দ্রাতুর অবস্থা থেকে জাগ্রদবস্থায় অবস্থান্তর! আহ্বানের তা হ'লে প্রয়োজন আছে!

সুধাকৃষ্ণবাবু হাসিলেন, বলিলেন,—তরুণ বয়সের ধর্মকে সহ্য ক'রে নিতে হবে ন্যায়তীর্থ মশাই, না নিলে উপায় কি?

ন্যায়তীর্থ বলিলেন,—দুদিন পরে, দুদিন পরে। আজ আদেশ করবেন না, পারব না। আজ আমি যাই।

ন্যায়তীর্থের খড়ম ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ন্যায়তীর্থ চলিয়া যাইতেই সুধাকৃষ্ণবাবু পাশের ঘরের দিকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিলেন—পণ্ডিত! শশীকে তিনি পাশের ঘরেই বসাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কেহ উত্তর দিল না। সুধাকৃষ্ণবাবু উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া দেখিলেন, ওপাশে দরজা খোলা, ঘরে কেহ নাই।

শশী সমস্তই শুনিয়াছিল। সে উদ্‌ভ্রান্তের মতই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। আজ সে স্পষ্ট অনুভব করিল তাহার প্রতিষ্ঠায় তাহার পিতার ঈর্ষা; জীবনের প্রতিটি ঘটনা আজ নূতন আলোকে আলোকিত হইয়া নূতন রূপে তাহার চোখে দেখা দিল। সহসা তাহার মাকে মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার সম্মুখে সে দাঁড়াইবে কেমন করিয়া! চলিতে চলিতে সে হোঁচট খাইল, চটিটা ছিঁড়িয়া গেল। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। ধিক্কারে লজ্জায় তাহার মন ছি-ছি করিয়া সারা হইতেছে। মাথার ভিতরটা কেমন করিতেছে! মনে ইচ্ছা হইল—দুই হাতে দলিয়া পৃথিবীর সব কিছু যদি সে মুছিয়া দিতে পারিত।

চারিদিকে অন্ধকার ঘন হইয়া আসিতেছে, সে বিভ্রান্তের মত লোকালয় ছাড়িয়া চলিল। কে যেন তাহাকে তাড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে। সে তাহার পিতা—দাম্ভিক ন্যায়তীর্থ। শহর পার হইয়া ঘন জঙ্গল—জঙ্গলের পরে রেল লাইন। শশিশেখর সেই জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া গেল।

শশিশেখরের আর সন্ধান মিলিল না। সন্ধান করিয়া পরদিন মিলিল রেল লাইনের উপরে কোন অসতর্ক পথিকের খণ্ড-খণ্ড ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন দেহের

মাংস, অস্থি, মেদ, অন্ত্র! মাথাটা পর্যন্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। চিনিবার উপায় নাই।

মাস-ছয়েক পর।

ন্যায়তীর্থ টোলের বারান্দায় অভ্যাসমত বসিয়া ছিলেন। ইহারই মধ্যে তিনি স্থবির হইয়া গিয়াছেন। পৌত্র চন্দ্রশেখর কাছেই দাওয়ার উপর বসিয়া একটা কাগজ চুষিতে ব্যস্ত ছিল। ন্যায়তীর্থ উদাস দৃষ্টিতে দিক্‌-চক্রবালের দিকে চাহিয়া ছিলেন;

একটি ছাত্র সহসা ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া চন্দ্রশেখরের হাত হইতে কাগজখানা কাড়িয়া লইয়া বলিল,—এ-হে-হে, উপাধি-পত্রখানা নষ্ট ক'রে ফেললে!

কাগজখানি সরকার-প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধিপত্র,—আজই কিছুক্ষণ পূর্বে সেটা আসিয়াছে। চন্দ্রশেখর এমন উপাদেয় ভোজ্যবস্তুটি হইতে বঞ্চিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। এতক্ষণে ন্যায়তীর্থের চমক ভাঙিল। তিনি পৌত্রকে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—কি হ'ল, কাঁদছ কেন দাদু?

ছাত্রটি শঙ্কিত স্বরে বলিল,—খোকা উপাধি-পত্রখানা মুখে পুরে নষ্ট ক'রে ফেলছে।—ওটা নেওয়াতেই ও কাঁদছে।

ন্যায়তীর্থ ছাত্রের হাত হইতে উপাধি-পত্রখানা লইয়া খোকার হাতে তুলিয়া দিলেন।

প্রমথনাথ বিশী

প্রমথনাথ বিশী বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বিস্ময়কর লেখক। সব্যসাচী দু'হাতে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে পারতেন—এঁর বহু হাত। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, সমালোচনা-সাহিত্য, ব্যঙ্গকবিতা এবং বক্রোক্তি—সবগুলি বিভাগেই এতখানি কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে দুর্লভ। 'প্রাচীন আসামী হইতে' নামধেয় কবিতাগুলিই প্রথম এঁর দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ঋণং কৃত্বা' ও 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটক-দুটি খরধার ব্যঙ্গগুণে নাট্যামোদী-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হয়। এ-দুটি আজও অবৈতনিক নাট্যোৎসাহীদের কাছে অতি প্রিয়।...ইনি সাধারণত ব্যঙ্গরচনাগুলি প্র না-বি এই সংক্ষিপ্ত নামে লেখেন। প্রমথনাথ বিশী ও প্র-না-বি এই দুজনের মধ্যে পাঠক-সমাজে কে বেশি প্রিয়, সে বিষয়ে যথেষ্ট তর্কের অবসর আছে। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রায় সকল দিকেই এঁর সমালোচক মন পরিক্রমা শেষ করেছে। এঁর সমালোচনা বা প্রবন্ধের বইগুলি নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করেছে যে, লেখার গুণে নীরস প্রবন্ধগ্রন্থও সরস এবং জনপ্রিয় হতে পারে। কিছুকাল ধরে ইনি ঐতিহাসিক গল্প ও উপন্যাস রচনা করছেন। বর্তমান গল্পটি সেই প্রচেষ্টারই অন্যতম ফল।

মহেন্-জো-দড়োর পতন

সিন্ধু নদের তীর বরাবর সুদীর্ঘ, সুদৃঢ়, সু-উচ্চ বাঁধ। বালির নয়, পাথরের নয়, প্রাকৃতিক নয়, ছোট মাপের ইটের তৈরী; এক সময় মানুষে তৈরী করিয়াছে। কিন্তু কতকাল আগে, কালের দিগন্তে সে স্মৃতি আজ অস্পষ্ট; বাঁধের গায়ে কত দিনের শ্যাওলা। নদীর ঘাত-প্রতিঘাতের কত চিহ্ন, কোন কোন অংশে ভাঙনের ক্ষত, আবার সেখানে মেরামত হইয়াছে।

বহু পুরুষ ধরিয়া মানুষে বাঁধটি দেখিতেছে; লোকে নদীর ঐতিহ্যের

যেমন সন্ধান করে না, বাঁধটি সম্বন্ধেও তাই—দুই-ই এখন সকল প্রশ্নের অতীত, দুইটিকে মানুষে বিনা প্রশ্নে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

বাঁধের একদিকে নদী, অপর দিকে নগর। নগরের দিক্ হইতে মাঝে মাঝে বাঁধে উঠিবার সোপান-শ্রেণী। বাঁধের মাথাটা বেশ প্রশস্ত, ৫।৭ জন মানুষ স্বচ্ছন্দে পায়চারি করিতে পারে, করেও তাই। ওখানে বেড়াইবার একটা স্থান, কত লোকে সকাল-বিকাল ওখানে হাওয়া খাইতে বেড়াইয়া থাকে।

আমাদের গল্পের সূত্রপাত ঐ বাঁধটার উপরে। সেখানে দুইজন লোক পাশাপাশি বেড়াইতেছিল, হাওয়া খাইতেছিল—এমন নয়; কারণ, এখনো সান্ধ্যবিচরণকারী দলের আসিবার সময় হয় নাই।

দু'জন লোকই দীর্ঘকায়, একজনের দাড়িগোঁফ দীর্ঘ, আর একজনের গোঁফ ছোট করিয়া ছাঁটা, কিন্তু দাড়ি দীর্ঘ; দু'জনেরই চুল লম্বা—সে চুল পিছন দিকে খোঁপার আকারে সজ্জিত, তাহাতে সোনার কঙ্কতিকা (কাঁকই) গোঁজা। বাম কাঁধের উপর, দক্ষিণ বাহুর নীচে দিয়া গায়ের কাপড় জানু পর্যন্ত প্রলম্বিত, অধোবাস অদৃশ্য। দু'জনাকেই সম্ভ্রান্ত পুরুষ বলিয়া বোধ হয়।

তাহারা নদীর দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিতেছিল—তাহাদের নিকটে দাঁড়াইলে, পূবদিকে মুখ ফিরাইলে দেখা যাইবে নদীর বিস্তৃত প্রবাহ, অনেক নীচে বলিয়া স্রোতোহীন প্রতীয়মান, কিন্তু মাঝে মাঝে দ্রুতগামী নৌকা দেখিলে স্রোতের প্রচণ্ডতা অনুমান হয়—আবার পশ্চিম দিকে চাহিলে দেখা যাইবে নগরের উচ্চাবচ সৌধতরঙ্গ—দূরে বলিয়া, নীচে বলিয়া দাবার ছকের মতো দৃশ্যমান—তিনতলা বাড়ীগুলোও খেলাঘরের মতো। বাঁধটা কত উঁচু—আর সম্মুখে পশ্চাতে বাঁধের বিস্তৃত শিরদাঁড়া—দুই দিকের দিগন্তে সূক্ষ্ম সুঁচালো হইয়া যেন মিশিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তি দুইজন এবারে মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইল।

একজন বলিল—এই আমাদের শত্রু, নদীই আমাদের শত্রু, আবার নদীই আমাদের মিত্র।

অপর জন বলিল—শত্রুতা, মিত্রতা—সবই অবস্থার উপরে নির্ভর করে।

পূর্বোক্ত জন বলিল—সেনাধ্যক্ষ, তোমার কথা অর্ধসত্য, সবই নিজেদের উপরে নির্ভর করে।

দ্বিতীয় জন বলিল—পূর্ত-সচিব, তোমার কাজ নদীকে সংযত করা, আমার কথাকেও তুমি সংযত করিয়া যথার্থ রূপ দিয়াছ।

তাহাদের কথোপকথন হইতে বুঝিতে পারা যাইবে—একজন নগরের সেনাধ্যক্ষ, অপর জন পূর্ত-সচিব—দু'জনেই নগরপ্রধানগণের শ্রেণীভুক্ত।

পূর্ত-সচিব বলিল—এবারে বন্যায় খুব জোর ধরবে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল—কি ভাবে বুঝিলে?

—দেখ না কেন, এখন বর্ষার প্রারম্ভ, ইতোমধ্যেই জল বাঁধের কতটা গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। তা' ছাড়া, আমি দেখিয়া আসিতেছি যে, পাঁচ বৎসর অন্তর প্রবলতর বন্যা হইয়া থাকে।

—হোক প্রবল বন্যা। তোমার বাঁধ আমাদের প্রহরী।

—প্রহরী প্রাচীন হইয়া পড়িয়াছে—আজ তাহার জীর্ণদশা। এবার বর্ষা-অন্তে বাঁধ মেরামত না করিলেই নয়।

—আমিও তাহাই বুঝি, কিন্তু নগরপ্রধানগণ কি অর্থ ব্যয় করিতে রাজী হইবেন?

—আমারও সেই আশঙ্কা। তাঁহাদের অধিকাংশই বয়সে নবীন, তাঁহারা নগরের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তাকে প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলিয়া মনে করেন। বাঁধ মেরামতের প্রশ্ন তুলিলেই তাঁহারা বলিবেন—ওটা পূর্ত-

সচিবের একটা খেয়াল, নিজের প্রতিষ্ঠা বাড়াইবার জন্য কেবল বাজে খরচের বাবদ অর্থ চান! কিন্তু—

—কিন্তু আমরা দু'জনেই বৃদ্ধ, আমরা জানি—হ্রাস বৃদ্ধি, উত্থান পতন, জীবন ও মৃত্যু প্রকৃতির নিয়ম।

—সেই তো বিপদ। নবীনেরা এসব কথা বুঝিতে চায় না। তাহারা বাঁধ-মেরামতের অনিবার্য অর্থ দিয়া নগরের স্থানে স্থানে দেবলিঙ্গ স্থাপন করিতেছে, অনর্থক ধুমধাম করিয়া অর্থের অপব্যয় করিতেছে। আমাদের সতর্কবাণী তাহারা শুনিতে চায় না।

—ঐ আর এক বিপদ। আমাদের প্রাচীন মৎস্য-পূজায় এখন আর কাহারো মন নাই। নবপ্রবর্তিত লিঙ্গ-পূজায় এখন সকলেই উন্মত্ত। কিন্তু পূর্ত-সচিব, ভাবিয়া দেখ, সে পূজা কত সরল ছিল; আড়ম্বর ছিল না, আবার আন্তরিকতারও অভাব ছিল না। আর এই মৎস্যদেব তো সিন্ধু নদেরই প্রতীক।

—সেই কথাই তো বলিতে চেষ্টা করিতেছি, নদীর দিক্ হইতে আমাদের মন নগরের দিকে, সরলতার দিক্ হইতে আড়ম্বরের দিকে ঘুরিয়া গিয়াছে। বাঁধের উত্তর দিক্‌টা দেখিয়াছ কি? এবার বর্ষায় যদি টেঁকে —সৌভাগ্য, বর্ষার অন্তে মেরামত না করিলেই দুর্ভাগ্যের চরম হইবে।

—পূর্ত-সচিব, তোমার ঐ উত্তর দিকের প্রসঙ্গে একটি জরুরী বিষয় মনে পড়িল। আমার গুপ্তচরেরা নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহাদের আমি উত্তর দিকের খবর সংগ্রহ করিতেই বিশেষভাবে আদেশ করিয়াছি। একজন দূত দুই শত ক্রোশ অবধি গিয়াছিল। সেখানে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, সে আগেও সেখানে একবার গিয়াছে। কিন্তু এবারে গিয়া দেখিল, নগরের সে পূর্বসমৃদ্ধি নাই।

—এমন বিপদ কেন ঘটিল? বন্যা?

—না।

—অগ্নি ?

—না।

—ভূমিকম্প ?

—না।

—তবে কি শত্রু ?

—এবারে ঠিক অনুমান করিয়াছ।

—কিন্তু তাহাদের কি সৈন্য ও অস্ত্র ছিল না ?

—ছিল বই কি।

—তবে ?

—আততায়ী মহাশক্তিসম্পন্ন।

—হইলেও, মানুষ ছাড়া কিছু নয়।

—সে কথা ঠিক। কিন্তু তাহাদের বাহন এক প্রকার দ্রুতগামী জীব। সেই বায়ুগতি বাহনে চড়িয়া তাহারা অতর্কিতে আসে, অতর্কিতে যায়, পদাতিকে তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কেন ?

—এত সংবাদ দূত রাখিল কি প্রকারে ?

—একবারের আক্রমণের সময়ে সে উপস্থিত ছিল।

—কি সেই জন্তু ?

—দূত তাহার একটা ছবি আঁকিয়া আনিয়াছিল।

—ছবিখানা দেখিয়াছ ? দেখিয়া কি বুঝিলে ?

—বুঝিলাম, সে জন্তু তেজস্বী, দ্রুতগামী ; আর বুঝিলাম, এদেশে কেহ তাহা দেখে নাই, এদেশে সে জন্তু নাই।

—কিন্তু দুই শত ক্রোশ দূরের ভয়ে ভীত হইবার তো কারণ দেখি না।

—পূর্ত-সচিব, যে বন্যায় আমরা সর্বদা শঙ্কিত, তাহা তো আরও দূর

হইতে আসিয়া থাকে।

—তা বটে।

—আর এমন দ্রুতগামী বাহন যাহাদের, তাহারা কি একটা নগর ধ্বংস করিয়াই ক্ষান্ত হইবে? সিন্ধুলালিত শ্রেষ্ঠ নগরের সংবাদ কি তাহাদের কানে পৌঁছিবে না?

—এ আশঙ্কা মিথ্যা নয়। চলো, আজ তোমার আবাসে গিয়া সেই অদ্ভুত জীবের ছবিটা দেখিব। সেখানা আছে তো?

—আমি যত্নে রাখিয়া দিয়াছি।

দুইজনে যখন বাঁধ হইতে নামিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তখন একজন নাগরিক ব্যস্তভাবে তাহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, নত হইয়া অভিবাদন করিল; বলিল, নগরপ্রধানগণ আপনাদের স্মরণ করিয়াছেন, শীঘ্র চলুন।

—কেন হে বাপু?

—তাহা আমি জানি না, তবে কোন বিপদ ঘটিয়া থাকাই সম্ভব।

—তাঁহারা কোথায়?

—মুখ্য স্নানাগারের নিকটবর্তী চত্বরে, সেখানে একটা ভিড় জমিয়া গিয়াছে।

—ভিড়ের মধ্যে কি আছে?

—তাহা আমি দেখি নাই, আমি দূরে ছিলাম।

—আচ্ছা চলো যাওয়া যাক।

তখন তাহারা দুইজনে দূতের অনুসরণ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া বাঁধ হইতে নামিল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পূর্বোক্ত স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা দেখিল, সত্যই এক বৃহৎ জনতা, চত্বর পূর্ণপ্রায়। তাহাদের দেখিবামাত্র পথাধ্যক্ষ, শকটাধ্যক্ষ এবং আরও ২।৪ জন রাজপুরুষ অগ্রসর হইয়া আসিল, বলিল—আসুন, এক বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়াছে!

হঠাৎ এমন কি বৈচিত্র্য ঘটিল, বুঝিতে না পারিয়া তাহারা ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিল—দেখিল, মাঝখানটা ফাঁকা, আর সেখানে দাঁড়াইয়া আছে এক অদৃষ্টপূর্ব জন্তু!

পূর্ত-সচিব বলিল—সেনাধ্যক্ষ, দেখ এক অদৃষ্টপূর্ব জানোয়ার।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আমার একেবারে অ-দৃষ্ট নয়, এ সেই জানোয়ার।

পূর্ত-সচিব সেনাধ্যক্ষের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল, সে মুখে পরিহাসের ছায়ামাত্র নাই, দেখিল—অমিতবিক্রম সেই পুরুষের মুখ পাংশু! পূর্ত-সচিবও ভীত হইয়া উঠিল।

ইতোমধ্যে জনতা সেই জন্তুটিকে লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে, কেহ লেজ ধরিয়া টানিতেছে, কেহ খোঁচা মারিতেছে, কেহ বা মুখের কাছে শষ্পমুষ্টি ধরিতেছে, কিন্তু তেজস্বী জন্তুটার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। সে গ্রীবা বাঁকাইয়া দণ্ডায়মান, মাঝে মাঝে নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হইতেছে, চক্ষুর শ্বেতাংশ ঘূর্ণিত করিতেছে, দূরপথ-অতিক্রমণে ক্লান্ত বলিয়া বক্ষ কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হইতেছে, আর নিতান্ত বিরক্তি বোধ করিলে লেজটি আন্দোলিত হইতেছে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল—এ জন্তু আসিল কোথা হইতে?

একজন নাগরিক অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—আমার ক্ষেতখামার এখান হইতে দূরে, প্রায় দুই দিনের পথ, সেখানে মাঝে মাঝে গিয়া তদারক করি। এবারেও গিয়াছিলাম, আজ সকালে উঠিয়া দেখি, জানোয়ারটা ক্ষেতের শস্য খাইতেছে, তখন—

—দাঁড়াও। দু'দিনের পথ তুমি একদিনের মধ্যে আসিলে কি প্রকারে?

—উহার পিঠে চড়িয়া।

—তোমার খামার কোন্ দিকে?

—উত্তর দিকে।

—সর্বনাশ!

সেনাধ্যক্ষের ভয়ের কারণ আর কেহ বুঝিতে না পারুক, পূর্ত-সচিব কতকটা বুঝিল।

সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণকে বলিল—নগরপ্রধানগণের এখনি একবার সম্মিলিত হওয়া আবশ্যক। আপনাদের আপত্তি না থাকে তো আমার ভবনে আসিলে সুখী হইব।

সকলে বলিল—আপত্তি কি।

সেনাধ্যক্ষ পূর্ত-সচিবের উদ্দেশে বলিল—সেই ছবিটার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে পারিবে।

তখন রাজপুরুষগণ সেনাধ্যক্ষের ভবনের দিকে চলিল, যাইবার আগে সেনাধ্যক্ষ জানোয়ারটাকে সযত্নে রক্ষা করিবার জন্য আদেশ দিয়া গেল।

পাঠক, এই নগরীর নাম মহেন-জো-দড়ো। আজকার ধ্বংসাবশেষ নয়, পাঁচ হাজার বছর আগেকার ধনে জনে সমৃদ্ধিতে পূর্ণ জীবনচঞ্চল নগর, তৎকালীন নাম 'নন্দুর'। আর ঐ অদৃষ্টপূর্ব জন্তুটি একটি ঘোড়া।

২

সেনাধ্যক্ষের আবাসে রাজপুরুষগণের সভা বসিয়াছে। সেনাধ্যক্ষ বিপদের আশঙ্কা সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে। বাঁধের উপর পূর্ত-সচিবকে যে সব কথা সে বলিয়াছিল, তাহাই আরও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়াছে, গুপ্তচর কাষ্ঠফলকে জন্তুর যে চিত্র আঁকিয়া আনিয়াছিল, তাহা সকলকে দেখাইয়াছে, সেই চিত্রের সঙ্গে জানোয়ারটির সাদৃশ্য দেখাইয়া দিয়াছে—আর বলিয়াছে, নূতন যে দুর্ধর্ষ জাতি সুদূর উত্তরে দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—এইরূপ দ্রুতগতি বাহনের জন্যই তাহারা অজেয়। তাহাদের

হাতে দুই শত ক্রোশ দূরবর্তী সমৃদ্ধ নগরের যে ভাবে পতন হইয়াছে, তাহারও বর্ণনা করিতে ভোলে নাই। এবং সর্বশেষে সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া প্রস্তাব করিয়াছে যে, নগর রক্ষা করিতে হইলে অন্য খাতে ব্যয় বন্ধ করিয়া উত্তর দিকে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর তুলিতে হইবে।

পূর্ত-সচিব সেনাধ্যক্ষের যুক্তি ও প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইয়া বলিয়াছে যে, নগরের দুটি শত্রু। একটি নদী, এতদিন তাহাকেই মাত্র শত্রু বলিয়া জানিতাম, কিন্তু সম্প্রতি আরও একটি শত্রুর আভাস শুনিতে পাওয়া গেল। পূর্ত-সচিব প্রস্তাব করিয়াছে যে, নগর রক্ষার জন্য উত্তর দিকে প্রাচীর গাঁথা যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি অত্যাশ্যক বাঁধের সংস্কার। সে জানাইয়া দিয়াছে যে, বাঁধটি অনেক কাল সংস্কৃত হয় নাই—উত্তর দিকটায় এমনি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, এই বর্ষাতেই কি হয় বলা যায় না। আর কোন মতে এবার বর্ষাকালে টিকিয়া গেলেও আগামী বর্ষায় ইহার পতন অবশ্যম্ভাবী, তখন নগরের কি অবস্থা হইবে, সকলকে বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছে।

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব অনেকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা করিয়া থামিল, কিন্তু তাহাদের কথায় আর কেহ যে বিচলিত হইল, এমন বোধ হয় না। তাহার একটি কারণ, সমবেত রাজপুরুষগণের মধ্যে এই দুই জনেই বয়সে বৃদ্ধ, অবশ্য পদগৌরবেও শ্রেষ্ঠ। অন্য সকলের বয়স তারুণ্যের কোঠায়, দু'এক-জনকে প্রৌঢ়ও বলা যাইতে পারে।

পথাধ্যক্ষ বয়সে তরুণ। সে এবারে উঠিল এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—মাননীয় রাজপুরুষদ্বয়ের কথা শুনিলাম, কিন্তু আমি তো উদ্বেগের কারণ দেখি না, যেহেতু কোথায় কোন্ সম্ভাবিত শত্রু রহিয়াছে, তাহার আশঙ্কায় ভীত হইয়া উঠিলে জীবনযাত্রা দুরূহ হইয়া পড়ে। একটি অদ্ভুত জানোয়ার নগরে আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা স্বেচ্ছায় আসে নাই,

আনীত হইয়াছে। তাহা ছাড়া ঐ নিরীহ জানোয়ারটি কিরূপে যে এমন ভয়াবহ, তাহা বুঝি না। বাঘের মতো তাহার নখ নাই, গণ্ডারের মতো তাহার খড়্গ নাই, হস্তীর মতো তাহার দন্ত নাই, কোথায় তাহার ভীষণতা ?

তাহার বর্ণনা শুনিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিল।

পথাধ্যক্ষ পুনরায় বলিতে লাগিল, আমার বিবেচনায় সেনাধ্যক্ষের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক। আর আপনারা যদি অনুমতি করেন তো বলি যে, নিজের মর্যাদা ও নিজ বিভাগের ব্যয়বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি আমাদের ভীতি প্রদর্শন করিতেছেন।

এই বলিয়া পথাধ্যক্ষ বসিল, কেহ তাহার উক্তির প্রতিবাদ তো করিলই না, বরঞ্চ ভাবগতিকে বুঝিতে পারা গেল যে, তাহাতে তাহাদের অনেকেরই সমর্থন আছে।

এবারে শকটাধ্যক্ষ উঠিল, বয়সে সেও তরুণ। সে বলিল—সেনাধ্যক্ষের উক্তির অর্বাচীনতা সম্বন্ধে অনেক বলা হইয়াছে, আর প্রয়োজন নাই। আমি পূর্ত-সচিবের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাই।

এই বলিয়া আরম্ভ করিল—পূর্ত-সচিব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, সর্বত্র তিনি ভয়ের ছায়া দেখিতে পান। এ বাঁধ কত কাল নির্মিত হইয়াছে কেহই জানে না, পূর্ত-সচিবের বয়স যতই হোক, আমার বোধ হয় তিনিও জানেন না। এতদিনের মধ্যে বাঁধ ভাঙে নাই, কাজেই এবারে ভাঙিবে এমন আশঙ্কা অমূলক। আর যদিই ভাঙে, পূর্ত-সচিব আছেন কেন ? এমন অবস্থায় বাঁধের পিছনে অর্থব্যয় আর নদীর জলে তঙ্কা ফেলিয়া দেওয়া সমান। আমার বিবেচনায় এই উদ্দেশ্যে কপর্দক ব্যয় করাও সমীচীন নয়।

শকটাধ্যক্ষ বসিলে তরুণবয়স্ক অরণ্যাধিপতি উঠিল। সে বলিল—পূর্বোক্ত বিষয়দ্বয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট মনে করি। পূর্ত-সচিব ও

সেনাধ্যক্ষের দাবী যে কতদূর ভিত্তিহীন, তাহা আপনারা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। আমার প্রসঙ্গ ভিন্ন। নগরের বৃহৎ স্নানাগারটি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে—এখন সব সময়ে তপ্ত জল পাওয়া যায় না, মেঝে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, অনেক সময়েই স্নানার্থীরা পিছলে পড়িয়া যায়, এমন অবস্থায় একটি বৃহত্তর স্নানাগার-নির্মাণ আশু প্রয়োজন। নগরকোষের উদ্বৃত্ত অর্থ প্রাচীর গাঁথিয়া অপব্যয় না করিয়া নাগরিকগণের সুখ-সুবিধা যাহাতে বাড়ে, সেই উদ্দেশ্যে একটি মনোরম স্নানাগার-নির্মাণ প্রয়োজন। অনেক বিলম্ব হইয়াছে—আর কালব্যাজ অমার্জনীয়।

এবারে পুনরায় সেনাধ্যক্ষ উঠিলেন, তিনি বলিলেন— বিপদের আশঙ্কাকে আপনারা দূরবর্তী বলিয়াছেন, আমি তো দেখি, বিপদ একেবারে ঘরের মধ্যেই। বাহিরের আক্রমণ ভয়াবহ সত্য, কিন্তু তাহাতে জয়-পরাজয় দুই-ই সম্ভবপর। কিন্তু যে আক্রমণ অভ্যন্তরীণ, তাহার হাত হইতে বাঁচিবার উপায় কি? আসল বিপদ আততায়ীর ভয় নয়, আসল ভীতি সেই ভয়কে অবহেলা। পুরাতন স্নানাগারে কেহ কেহ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছে, ইহাতেই আপনারা বিচলিত, কিন্তু আপনাদের যে মনোভাব দেখিতেছি, তাহাতে সমস্ত নগরটাই অচিরে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইবে আশঙ্কা হইতেছে। আপনারা এখনো সতর্ক হোন।

সেনাধ্যক্ষ বসিলে পথাধ্যক্ষ বলিল—বিপৎকালে বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য করিবার পরামর্শ আছে—আগে বিপদ আসুক, তার পরে বৃদ্ধেরা যেন মুখ খোলেন। এখনই বাক্যে কি প্রয়োজন? বৃদ্ধের মুখে বাচালতা নিতান্তই অশোভন।

—কিন্তু অর্বাচীন যখন পরামর্শদাতার পদ গ্রহণ করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, দুঃসময় ঘরের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। সেনাধ্যক্ষই এই বাচালতার উত্তর দিতে পারিতেন, কিন্তু এ তাঁহার নিজ ভবন। আর

সকলে তাঁহার অতিথি, কাজেই যে কথা এক্ষেত্রে তাঁহার বলা উচিত নয়—আমাকেই তাহা প্রকাশ করিতে হইল।

এই বলিয়া পূর্ত-সচিব বসিল।

এবারে অরণ্যাধিপতি উঠিল, বলিল—এই সব দূরস্থিত বিপদের কচ্-কচানি আর ভালো লাগিতেছে না। সন্ধ্যা সমাগত। আজ রাত্রে বৃক্ষপূজার তিথি। সাতটি নর-বলি হইবে। বলি প্রস্তুত। সেখানে যাইবার সময় হইয়াছে। চলুন, সেখানে যাওয়া যাক। কিন্তু তার আগে একটা কাজ সারিয়া লওয়া ভালো। এখানে রাজপুরুষগণ সমবেত হইয়াছেন, কাজেই স্নানাগার-নির্মাণের অর্থব্যয়ের অনুমতি আপনারা দিন।

এ বিষয়ে অধিক বিতর্ক হইল না, কেবল সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব মাত্র আপত্তি করিল, কাজেই অধিকাংশের সম্মতি অনুসারে নূতন স্নানাগার-নির্মাণের ব্যয় মঞ্জুর হইয়া গেল।

তখন আর সকলে প্রস্থান করিল, শুধু সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব মূঢ়ের মতো গালে হাত দিয়া সেই শূন্য সভাকক্ষে বসিয়া রহিল। বহির্গত রাজ-পুরুষদের পরিহাসের অট্টহাস্যও তাহাদের মৌনভঙ্গ করিতে পারিল না।

৩

এই ঘটনার পরে পূরা তিনটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং সেই সুদীর্ঘ সময়-মধ্যে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইবার লক্ষণমাত্রও দেখা যায় নাই; কাজেই এখন বৃদ্ধদ্বয় সমস্ত নগরবাসীর উপহাসের পাত্র। না উত্তর দিক্ হইতে অজ্ঞাত শত্রু আক্রমণ করিয়াছে, না পূর্ব দিক্ হইতে পরিজ্ঞাত নদী বাঁধ ভাঙিবার উপক্রম করিয়াছে।

যুগান্তরকারী বিপদ আসিতে এক যুগ সময় নেয়—তাই বলিয়া বিপদ

কখনোই আসিবে না এমন কথা মূর্খ ছাড়া কেহ বলে না। মানুষের জীবনে যুগ দীর্ঘ, সভ্যতার জীবনে তাহা পলকপাত মাত্র।

সেই ঘোড়াটি এখনো নগরে আছে, লোকে বিদ্রূপ করিয়া তাহাকে ডাকে সেনাধ্যক্ষ, আর ঘোড়াটির নখদন্তহীনতা স্মরণ করিয়া 'নখদন্তহীন বুড়ো' বলিয়া সেনাধ্যক্ষের উল্লেখ করে। পূর্ত-সচিবও বাদ যায় নাই। পূর্ত-সচিবের নাম পড়িয়াছে 'ভাঙা বাঁধ', আর বাঁধটাকে সকলে পূর্ত-সচিবের কবরখানা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।

এই ভাবে সুখে দুঃখে তিনটি বৎসর কাটিয়া গেল। চতুর্থ বৎসরে বর্ষাকালে বন্যায় জোর ধরিল, বাঁধের উত্তর দিক্‌টা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল। বাঁধ রক্ষার জন্য পূর্ত-সচিবের অধীনে কতকগুলি 'রাজ' থাকিত, কিন্তু এ সঙ্কট নিবারণ করা তাহাদের সাধ্য নয়।

নিরুপায় পূর্ত-সচিব রাজপুরুষগণের নিকট লোক পাঠাইল। তাহারা এখন দিবাভাগের অধিকাংশ সময় নবনির্মিত মনোরম স্নানাগারে কাটাইয়া থাকে।

"মহেন-জো-দড়োর অন্যতম আশ্চর্য জিনিস, একটি স্নানাগার। স্নানাগারটি এত সুবৃহৎ ও সুগঠিত যে, এই যুগের পক্ষে ইহার চেয়ে ভালো আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ইহা উত্তর-দক্ষিণে ১৮০ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ১০৮ ফুট প্রস্থ। ইহা চতুর্দিকে ৭।৮ ফুট পুরু প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই স্নানাগারের মধ্যভাগে একটা প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণে দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট, প্রস্থে ২৩ ফুট এবং গভীরতায় ৮ ফুট একটি সন্তরণ-বাপী আছে।......এই সন্তরণ-বাপীটির নির্মাণকৌশল খুব চমৎকার। বিংশ শতাব্দীর সুদক্ষ পূর্ত-বিশেষজ্ঞ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িবেন। এই বাপীর উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে সিঁড়ি এবং সিঁড়ির নীচে স্নানার্থীদের জলে নামিবার জন্য অনুচ্চ মঞ্চ ছিল। অদূরবর্তী কূপ হইতে জল আনিবার ব্যবস্থা করিয়া বাপীটি জলপূর্ণ করা

হইত এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত জলনিকাশের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে সাড়ে ছয় ফুট গভীর প্রণালী ছিল। এই জলাশয়ের চতুর্দিকে তিন চার ফুট পুরু করিয়া সুন্দর ও মসৃণ ইটের গাঁথনি দেওয়া হইয়াছিল এবং তৎসঙ্গেই স্যাঁত-সেঁতে ভাব দূর করার জন্য এক ইঞ্চি পুরু শিলাজতুর প্রলেপ দিয়া যাহাতে ইট গড়াইয়া পড়িতে না পারে, তজ্জন্য এক সারি মসৃণ পাতলা ইট দিয়া চাপিয়া দেওয়া হইয়াছিল।······বৃহৎ স্নানাগারের নিকটে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আর একটি গৃহ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে পাঁচ ফুট উচ্চ চতুষ্কোণ ইষ্টকমঞ্চ দেখিতে পাওয়া যায়; ঐগুলিতে চুল্লী বসানোর জন্য খাঁজ কাটা রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় যে, এই গৃহে চুল্লীর সাহায্যে স্নানাদির জন্য উত্তাপ-সঞ্চয়ের এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।"*

পূর্ত-সচিবের দূত আসিয়া দেখিল যে, রাজপুরুষগণ বাপীসলিলে জল-ক্রীড়া করিতেছে। সে সমস্ত নিবেদন করিল। একজন রাজপুরুষ বলিল—বড় সুসংবাদ। বাঁধ ভাঙাই এখন দরকার, বাপীতে আজ জল কম।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আর একজন বলিল—তুমি তোমার প্রভুকে গিয়া বলো, তিনি যেন আর একটু কষ্ট করিয়া বাঁধটা ভাঙিয়া দেন। নদী আমাদের মিত্র।

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল।

তৃতীয় আর একজন বলিল—পূর্ত-সচিব বাঁধ ভাঙিয়া জল ঢুকিবে—দুশ্চিন্তা করিতেছেন, কিন্তু জলের সঙ্গে যে প্রচুর মাছ ঢুকিবে—সে সুসংবাদ কি রাখেন?

হাসিতে হাসিতে বারংবার সুবৃহৎ স্নানাগার চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

অপ্রস্তুত দূত প্রস্থান করিল।

---

* 'প্রাগৈতিহাসিক মহেন-জো-দড়ো'—শ্রীকুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী, পৃ, ২৪-২৭

রাজপুরুষেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল, নাঃ, বুড়ো দু'টোকে আর সহ্য করা যায় না।

কেহ বলিল—এ দু'টো আমাদের সকল সুখের কাঁটা!

কেহ বলিল—মরেও না, মুখও বোজে না।

—কেবল শত্রু আর বন্যা!

—কেবল এলো এলো, গেল গেল!

—ভয় দেখিয়ে আমাদের ভালো করতে চান!

—আমরা খারাপটাই বা এমন কি?

—ওঁদের কালে ওঁরা যে কেমন ছিলেন, তা' শুনেছি তো ঠাকুরমার কাছে!

—রসনা ছাড়া যাদের আর সব ইন্দ্রিয় শিথিল, তাদের আর গতি কি বলো!

—সেদিন 'নখদন্তহীন ঘোড়া' বলছিল যে, আমাদের বিলাসিতা আজকাল বড়ই বেড়ে উঠেছে, তাতেই নাকি আমাদের অধঃপতন হয়েছে।

—হয়েছে! একেবারে হওয়া শেষ! কি সর্বনাশ!

—এবারে বুড়ো দু'টোকে সরানো দরকার।

—না হে, দু'টো একটা বুড়ো থাকা ভালো, তাতে যৌবনের মূল্য বোঝবার সুবিধা হয়।

—তবে ফ্যাচ্‌-ফ্যাচ করতে নিষেধ করে দিয়ো।

—তা না হলে আর বুড়ো কেন?

যাই হোক, পূর্ত-সচিবের প্রাক্তনের পুণ্যেই হোক আর বন্যার তীব্রতার অভাবেই হোক, বাঁধটা সেবার রক্ষা পাইয়া গেল। তাহাতে অন্যান্য রাজপুরুষগণের যুক্তিই প্রমাণিত হইল—বাঁধ ভাঙিবার নয়। আর যা ভাঙিবে না, তাহা রক্ষা করিবারই বা উদ্যম কেন? ঐ সূত্রে আরও একটা প্রসঙ্গ

অনেকের মনে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল। যে বস্তু ভাঙা-গড়ার অতীত, তাহা রক্ষা করিবার নিমিত্ত আবার বৃত্তিদানের ব্যবস্থা কেন? ভাবে-গতিকে মনে হইতে লাগিল যে, বাঁধটি যাইবার আগেই হয় তো বা পূর্ত-সচিবের বৃত্তিটি যাইবে। হয় তো বা সত্যই যাইত, এমন সময়ে সেই বছরেই শীতকালে উত্তরের প্রত্যাশিত আশঙ্কা অপ্রত্যাশিতরূপে দেখা দিল।

শীতকালের প্রারম্ভে গুপ্তচর আসিয়া সেনাধ্যক্ষকে জানাইল যে, উত্তর দিকে অশ্বারোহী আততায়িগণ দেখা দিয়াছে। সে বলিল—ষোল ক্রোশ উত্তরে যে নগর আছে, অশ্বারোহিগণ তাহা লুটপাট করিতেছে এবং অগ্নি-সংযোগে পোড়াইয়া দিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ শুধাইল—তাহারা সংখ্যায় কত?

—পাঁচ শতের অধিক হইবে মনে হয় না, কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।

—তাহারা কি এ নগরে আসিবে?

—আমার মনে হয়, এই নগরের উদ্দেশ্যেই আসিতেছিল, ঐ নগরটি পথে পড়ায় এবং তাহারা বাধা দান করায় আগে সেটিকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণের উদ্দেশে যাত্রা করিল। সে জানিত, তাহারা কোথায় থাকিবে। স্নানাগারের দ্বিতলে বিশ্রামকক্ষেই অবশ্য তাহাদের পাওয়া যাইবে। পথিমধ্যে পূর্ত-সচিবকে সংগ্রহ করিয়া লইয়া তাহাকে বিপদের কথা জানাইল এবং দুইজনে স্নানাগারের বিশ্রামকক্ষে দ্বিতলে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া দেখিল, রাজপুরুষরা সেখানে অক্ষক্রীড়ায় নিরত।

সেনাধ্যক্ষ সংক্ষেপে তাহাদের সব সংবাদ নিবেদন করিল, কিন্তু কেহ যে বিশ্বাস করিল এমন বোধ হইল না।

একজন রাজপুরুষ বলিল—আপনি আমাদের বালক বলিয়া মনে করেন, তাই সদা-সর্বদা জুজুর ভয় দেখাইয়া থাকেন।

আর একজন বলিল—আজ চার বৎসর ধরিয়াই তো তাহারা আসিতেছে! এতদিন যদি আসিয়া না থাকে, তবে আজই বা আসিবার নিশ্চয়তা কি?

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আজ না আসুক, কাল আসিবে।

—তবে সে কাল দেখা যাইবে। আজ আমাদের খেলা শেষ করিতে দিন।······নাও—তোমার রাজাকে সামলাও।

সেনাধ্যক্ষ রুষ্ট হইয়া উঠিল বলিল—আপনাদের সব খেলাই একেবারে শেষ হইবে।···

—দেখ, মন্ত্রী গেল!

একজন রাজপুরুষ বলিল—শত্রু আসে যুদ্ধ করুন।

—শত্রু আসিলে যে যুদ্ধ করিতে হয় তাহা জানি। কিন্তু যুদ্ধ করিতে সৈন্যের প্রয়োজন। আজ চার বৎসর বৃত্তি না পাইয়া সৈন্যগণ কর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, কেহ বা নগরান্তরে গিয়াছে। আর যাহারা আছে, শুধু-হাতে তাহারা লড়িতে পারে না, সংস্কার অভাবে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে।

—আমরা তাহার কি করিব?

—কি করিব! আপনারাই কি এজন্য দায়ী নহেন? সৈন্যদলেব প্রাপ্য বৃত্তি দিয়া আপনারা স্নানাগার গড়িয়াছেন, নূতন নূতন লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠায় অজস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন—এখন 'আমরা কি করিব'?

—তবে এক কাজ করুন, অর্থ দ্বারা আততায়ীদের বশ করিয়া ফিরাইয়া দিন।

—আমি ব্যবসায়ী নহি, সৈনিক, আমি যুদ্ধ করিতে পারি, কিন্তু

দালালি করিতে জানি না।

পূর্ত-সচিব বলিল—অর্থের স্বাদ তাহাদের দিবেন না, তাহা হইলে প্রতি বৎসর তাহারা অর্থের লোভে আসিয়া হাজির হইবে।

—তখন দেখা যাইবে। এবারে তো একটা ব্যবস্থা করুন।

—ও ব্যবস্থার মধ্যে আমি নাই। তার চেয়ে আসুন, সৈন্যদলের উপরে ভরসা না করিয়া আমরাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হই না কেন?

পূর্ত-সচিব বলিল—এ যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

—হাঁ, দুইজনে মিলিয়াছে ভালো! যান, আপনারা দুইজনে লড়াই করুন গিয়া, আমরা উহার মধ্যে নাই।

—ত থাকিবেন কেন!

সেনাধ্যক্ষ বলিতেছেন—আপনারা স্নানাগারে আছেন, অক্ষক্রীড়ায় আছেন, লিঙ্গপূজায় আছেন—আপনারা যুদ্ধের মধ্যে থাকিবেন কেন! বৃত্তি না পাইয়া সৈন্যদল ভাঙিয়া গিয়াছে—কত বার আপনাদের জানাইয়াছি! 'এই হইবে', 'আগামী বৎসর হইবে'! পাছে আমার গুপ্তচরেরা অশুভ সংবাদ আনিয়া আপনাদের বিলাসব্যসনে বাধা জন্মায়, তাই তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া বুদ্ধদেবের নিকটে বলি দিয়াছেন! এখন যখন বিপদ আসন্ন, আপনারা সব দায়িত্ব ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিতেছেন—আমরা উহার মধ্যে নাই।

একজন রাজপুরুষ রাগিয়া উঠিয়া বলিল—মহাশয়, অধিক ফ্যাচফ্যাচ করিবেন না, যান—ভাগুন।

এই বলিয়া একটি অক্ষগোলক সেনাধ্যক্ষকে ছুঁড়িয়া মারিল। কাষ্ঠ-গোলক তাহার কপালে লাগিয়া রক্ত বাহির হইল।

পূর্ত-সচিব বলিল—আপনারা বীর বটে, বন্ধুকে আঘাত করিতে হাত কুণ্ঠিত হয় না।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—এ মন্দের ভালো! হাত একবার উঠিয়াছে। এই হাত শত্রুর বিরুদ্ধে উঠুক!

—শত্রু আপনার মাথায়।

—তাই বুঝি সেখানে আঘাত করিলেন! আপনারা কেবল বীর নন, বুদ্ধিমান্‌ও বটে!—বলিলেন পূর্ত-সচিব।

—শত্রু আসুক, তখন দেখা যাইবে।

—শত্রু অবশ্যই আসিবে, তখন আর আপনাদের দেখা পাওয়া যাইবে না।

এই বলিয়া সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব স্থানত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। রাজপুরুষগণ পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিল।

—নাও, তোমার রাজা গেল!

—মন্ত্রীর দোষেই।

তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে নগরবাসীরা এক অপূর্ব দৃশ্য দেখিতে পাইল। তাহারা দেখিল, উত্তর দিগন্তে অকালে ধূলার ঝড় উঠিয়াছে। যাহারা জাগিয়া ছিল, ভালো করিয়া দেখিবার আশায় ছাদের উপর উঠিল; যাহারা তখনো নিদ্রিত ছিল, নগরের কোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া 'কি হইয়াছে' শুধাইতে শুধাইতে বাহিরে আসিল।

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিবের কাছে এ দৃশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। তাহারা অপমানের আশঙ্কা সত্ত্বেও রাজপুরুষগণের ভবনের দিকে রওনা হইল।

পথাধ্যক্ষ জাগরিত হইয়া বলিল,—সত্যই আসিয়াছে, না সমস্তটাই আপনাদের কল্পনা?

অরণ্যাধিপতি বলিল—দূরে আছে, এদিকে না আসিতেও পারে।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—আসিয়া পড়িলে আপনারা ব্যবস্থা করিবেন। সৈন্য

নাই, অস্ত্র নাই, যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা নাই, নামে মাত্র সেনাধ্যক্ষ হইয়া আমি কি করিব ?

—সে জন্য আপনাকে দুশ্চিন্তা করিতে হইবে না, যান।

সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব সমস্ত দৃশ্যটা পর্যবেক্ষণ করিবার আশায় বাঁধের উপরে গিয়া উঠিল।

বাঁধের উপর হইতে তাহারা দেখিল যে, ধূলার দিগন্ত ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, কাছে, আরো কাছে। ক্রমে ধূলিপটল:ভেদ করিয়া অশ্ব ও অশ্বারোহী দৃষ্ট হইল। গুপ্তচরের অনুমান ভুল নহে, সংখ্যায় পাঁচ শতের কাছাকাছি। তাহারা দেখিল যে, পাঁচ শত অশ্বারোহী নগর-সীমান্তে উপস্থিত। তেজস্বী জন্তুর উপরে সমান তেজস্বী সব পুরুষ। তাহাদের অঙ্গে পশুচর্মের আচ্ছাদন, পৃষ্ঠে তূণ, স্কন্ধলগ্ন ধনুক, দক্ষিণ হাতে দীর্ঘ বর্শা, বাম হাতে বল্‌গা ; আর, সকলকে ম্লান করিয়া দিতে পারে, দেহের এমন জ্যোতির্ময় কান্তি। তাহারা দেখিল, আততায়ীদের বর্ণ গৌর, প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণ নাসিকা, দীর্ঘপ্রলম্বিত কেশ, মুখমণ্ডল গুম্ফশ্মশ্রুহীন। শত্রু হইলেও তাহাদের মনে বিস্ময়ের ভাব উদিত হইল—হাঁ, ইহারাই দেশের অধিপতি হইবার যোগ্য বটে।

কিন্তু অলীক চিন্তার সময় তাহাদের ছিল না। তাহারা দেখিল যে, কয়েকজন রাজপুরুষ অশ্বারোহীদের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। অশ্বারোহীদের কয়েকজন অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তারপর বহুক্ষণ ধরিয়া উভয় পক্ষে কি সব কথাবার্তা হইতে থাকিল। অবশেষে তাহারা দেখিতে পাইল যে, শকট বোঝাই করিয়া থলিপূর্ণ যব গম ও নানা প্রকার খাদ্য অশ্বারোহীদের নিকটে নীত হইতেছে। দেখিতে পাইল যে, মূল্যবান রঙিন চর্ম-থলিকায় বোঝাই স্বর্ণ-মুদ্রা তাহাদের নিকটে নীত হইতেছে ; তাহাদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, আত্মরক্ষার সহজতম পন্থাটাই গৃহীত

হইল। তাহারা জানিত, সহজতম পন্থায় আত্মরক্ষা করিতে উদ্যত হইলে শেষ পর্যন্ত আত্মবিনাশ ঘটিয়া থাকে। তারপরে তাহারা দেখিল যে, থলিগুলি অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া আততায়িগণ ঘোড়ার মুখ উত্তরদিকে ফিরাইয়া দিল। তখন শীতের সূর্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

বাঁধ হইতে নামিবার মুখেই রাজপুরুষগণের সঙ্গে সেনাধ্যক্ষ ও তাহার সঙ্গীর সাক্ষাৎ হইল। তাহাদের দেখিতে পাইয়া পথাধ্যক্ষ বলিল—এবারে বিশ্বাস হ'লো তো যে, আমরা শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষায় সমর্থ।

পূর্ত-সচিব—ইহার নাম আত্মবিক্রয়, আত্মরক্ষা নয়।

পথাধ্যক্ষ। আপনারা তো লড়াই করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধের পরিণাম সব সময়েই অনিশ্চিত, নিশ্চয়ের মধ্যে—লোকক্ষয়।

সেনাধ্যক্ষ। আরও একটা বিষয়ে নিশ্চিত। পরাজিত হইলে তাহারা আর এদিকে আসিত না।

পথাধ্যক্ষ। আর আসিবে না বলিয়া গিয়াছে।

সেনাধ্যক্ষ। আর পাঁচ শত মাত্র আসিবে না, এবারে পঞ্চাশ সহস্র আসিবে।

পথাধ্যক্ষ। আবার ভীতিপ্রদর্শন?

অরণ্যাধিপতি। কেন পঞ্চাশ সহস্র আসিবে, কারণ শুনিতে পারি?

সেনাধ্যক্ষ। প্রথম কারণ, তাহারা ভাবিয়াছিল, অন্যান্য লুণ্ঠিত নগরের মতো ইহাও একটি ক্ষুদ্র পত্তন, তাই সামান্য সংখ্যায় আসিয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ, তাহারা দেখিল যে, সিন্ধুপত্তনের ইহা সব চেয়ে সমৃদ্ধ ও বৃহত্তম নগর। তৃতীয় কারণ, বুঝিয়া গেল যে, এই নগরে কেবল স্ত্রীলোক, বালক ও কাপুরুষের বাস; বুঝিয়া গেল যে, ইহারা শুধু কাপুরুষ নয়, নির্বোধও, নতুবা ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নিনির্বাপণের চেষ্টা করিত না। কাজেই আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, শীঘ্রই তাহারা এমন অমিত সংখ্যায় আসিবে, যাহাদের

পরাস্ত করিবার বা উৎকোচ দ্বারা লোভ প্রশমিত করিবার ক্ষমতা আপনাদের নাই। চতুর্থ কারণ, ইহারা বীরপুরুষ।

পথাধ্যক্ষ। উহাদের বলিতেছেন বীর! ঐ তো চেহারা। পাথরচাপাপড়া ঘাসের মতো, বিবর্ণ রঙ। বসন বুনিবার বুদ্ধি নাই বলিয়া যাহারা পশুচর্ম পরিধান করে! যেমন বীর, তেমনি বিদ্বান্, তেমনি বুদ্ধিমান্!

সেনাধ্যক্ষ। তৎসত্ত্বেও ইহাদের সম্মুখে এই সুবৃহৎ দেশের গৌরবময় ভবিষ্যৎ বিস্তারিত। এখনো সতর্কবাণী অবধান করুন, অবিলম্বে প্রস্তুত হোন, নতুবা অচিরকাল মধ্যে আপনাদের সমৃদ্ধি ও জীবন ঐ অস্তায়মান সূর্যের মতো বিলয়ের দিগন্ত স্পর্শ করিবে।

সেনাধ্যক্ষের কথায় সকলের হুঁশ হইল—তাই তো, সন্ধ্যা সমাগত!

পথাধ্যক্ষ বলিয়া উঠিল—বৃথা বিতর্কে লাভ নাই, আজ লিঙ্গপ্রতিষ্ঠার ভোজের নিমন্ত্রণটা বিস্মৃত হইবেন না। সন্ধ্যার পরেই সময়, স্থান—এই দীনের ভবন।

অত্যাবশ্যক কার্যসূচী মনে পড়িয়া যাওয়ায় সকলে দ্রুত প্রস্থান করিল। সেনাধ্যক্ষ ও পূর্তসচিবকে কেহ আহ্বান করিল না। তাহারা সেই নির্জন অন্ধকারের মধ্যে মূঢ়ের মতো নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতেও সাহস হইল না।

৪

সেনাধ্যক্ষের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইতে বড় বিলম্ব হইল না। পর বৎসর বর্ষাকালেই খবর আসিয়া পৌঁছিল যে, অশ্বারোহী আততায়ী আসিতেছে, এবারে আর পাঁচ শত মাত্র নয়, অগণ্য। শীতকালেই যুদ্ধের প্রশস্ত সময়,

কিন্তু শত্রু বুঝিয়াছে, দুর্বল ও কাপুরুষকে আক্রমণে কালাকাল বিচারের প্রয়োজন নাই।

এই কয়েক মাসের মধ্যে নগরের নৈতিক মেরুদণ্ড আরও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। রাজপুরুষগণ দেখিয়াছে যে, সৈন্যের চেয়ে স্বর্ণ অধিক শক্তিক্ষম। তাহারা সৈন্যদল একেবারেই ভাঙিয়া দিয়াছে, কেবল সেনাধ্যক্ষের মুষ্টিমেয় অনুচরকে দূর করিতে পারে নাই। সৈন্যে আর প্রয়োজন কি? শত্রুরা কি বলিয়া যায় নাই যে, তাহারা আর আসিবে না? আর যদিই বা আসে, যুদ্ধে বৃথা রক্তক্ষয় না করিয়া উৎকোচ দান করিলেই কার্য সিদ্ধ হইবে।

আবার রাজপুরুষগণের জীবনযাত্রা অনুসরণ করিয়া নগরের সাধারণ লোকেরাও বিলাসের সুলভ সংস্করণ প্রচারণায় লাগিয়া গিয়াছে। আগে যে অর্থ ও সামর্থ্য তাহারা চাষবাসে নিয়োগ করিত, তাহা দিয়া স্থানে স্থানে স্নানাগার তৈয়ারী করিয়াছে, রাজপুরুষগণের স্নানাগারের মতো তেমন মনোরম নয়, তবে মন্দও নয়; স্থানে স্থানে লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহার পূজায় সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় করিয়া থাকে; আর আগে যাহাদের গমের ও যবের রুটি হইলে চলিত, এখন অন্তত তাহার সঙ্গে মাছ-মাংসের ৫।৭টি পদ আহার করিয়া থাকে; রাজপুরুষগণের আহার্য কমপক্ষে দশপদী; রাজপুরুষগণ আগে তামার পাত্র ব্যবহার করিত, এখন রৌপ্যপাত্র ব্যবহার করে, লোকসাধারণ আগে মৃন্ময় পাত্র ব্যবহার করিত, এখন তাম্রপাত্র ছাড়া ব্যবহার করে না। ফলকথা, সমস্ত নগর বিলাসের স্রোতে গা ছাড়িয়া দিয়াছে। নদীর স্রোত সমুদ্রগামী, জাতীয় বিলাসের স্রোত সর্বনাশের সমুদ্র পর্যন্ত না লইয়া গিয়া থামে না। বিশেষ, সকলেই দেখিয়াছে যে, আর যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া মারিবার প্রয়োজন হইবে না, তবে আর নিয়মচর্যায় ও সামরিক শৃঙ্খলায় আবশ্যক কি? শত্রুকে বশ করিবার মতো নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন সমাজ আত্মার চেয়ে অর্থের উপরে যখন বেশী ভরসা

করে, বুঝিতে হইবে, তখন সর্বনাশের আর বিলম্ব নাই।

এই সর্বনাশের প্লাবনের মধ্যে যুগল গিরিশৃঙ্গের মতো সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব অটল, অচল। সেনাধ্যক্ষ রাজপুরুষগণের ভরসা একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে, আশঙ্কার কারণ সে আর বুঝাইতেও চেষ্টা করে না; প্রয়োজন কি! ঐ তো এক কথা শুনিতে হইবে,—মহাশয়, আমাদের সৈন্য নাই থাকিল, স্বর্ণ আছে। এখন সে মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া প্রস্তুত হইয়া আছে, জয় করিবার আশায় নয়, বাধা দিবার জন্য এবং মরিবার জন্য। সময়বিশেষে জয়ের চেয়ে পরাজয় অধিকতর গৌরবদ্যোতক। সেনাধ্যক্ষ জানিত, স্বর্ণ-স্বাদলুব্ধ শত্রু আবার আসিবে এবং তাহা অগৌণে। কিন্তু পরবর্তী শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া যে বর্ষাকালেই আসিয়া দেখা দিবে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই।

পূর্ত-সচিবের অবস্থাও সমান অসহায়। সে সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে যে, এবারে বন্যার পঞ্চবার্ষিকী জোর বাঁধিবার সময়, বাঁধ মেরামত না করিলে নগর রক্ষা পাইবে না। কিন্তু কে কার কথা শোনে। শঙ্কার সতর্কবাণী বিলাসের কানে কবে প্রবেশ করিয়া থাকে? রাজপুরুষগণের সহযোগিতা ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। অর্থ কোথায়? লোকজন কোথায়? সেনাধ্যক্ষের মতো তাহারও অবশ্য মুষ্টিমেয় অনুচর আছে, কিন্তু বাঁধের এখন যে অবস্থা, তাহা মুষ্টিমেয়ের সাধ্যের অতীত। সে অবশ্যম্ভাবীকে মানিয়া লইয়া সর্বনাশের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব নিজেদের মধ্যে স্থির করিয়াছে যে, বর্ষাকালে উভয়ের অনুচর একত্র করিয়া বাঁধ রক্ষা করিবে এবং শীতকালে আবার উভয়ের অনুচর একত্র করিয়া আততায়িগণকে বাধা দিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু তখন তাহারা কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, দুই বিপদ একত্র আসিয়া পড়িয়া তাহাদের সমস্ত পরিকল্পনা পর্যুদস্ত করিয়া দিবে। ধর্ম যখন মারে, তখন একেবারে

সমূলে আঘাত করিয়া মারে।

একদিন বর্ষার প্রারম্ভে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব বাঁধের উপর ঘুরিতেছিল, পূর্ত-সচিব এখন দিনরাত্রির অনেকটা অংশই বাঁধের উপরে কাটাইয়া থাকে। মুমূর্ষু সন্তানের শিয়রে জননীর মতো, বন্যাপ্রহত নগরের উর্ধ্বে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ—দু'জনেই নির্নিমেষদৃষ্টি। জল প্রতিদিন বাড়িতেছে, স্রোত প্রতিদিন প্রবল হইতেছে; বাঁধের উত্তরদিকের কতকটা ধ্বসিয়া পড়িয়াছে, এখনো নগরে জল প্রবেশ করে নাই বটে, তবে আর খানিকটা ভাঙিয়া পড়িলেই করিবে। পূর্ত-সচিবের অনুচরেরা ভগ্নস্থান গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু দিনে যেটুকু গাঁথিয়া তোলে, রাত্রে জল বাড়িয়া সেটুকু ধ্বসিয়া যায়। মানুষের হাতে ও নদীর স্রোতে সে এক প্রতিযোগিতা পড়িয়া গিয়াছে।

বাঁধের নীচে কারিগরেরা দেওয়াল গাঁথিতেছে, উপরে পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ কথোপকথনের অবকাশে তাহাদের কাজ দেখিতেছে।

পূর্ত-সচিব। নদী ইতোমধ্যেই কত প্রসারিত হইয়া গিয়াছে, ওপার আর দেখা যায় না।

সেনাধ্যক্ষ। বর্ষার সূচনাতেই এমন তো কখনো দেখি নাই।

পূর্ত-সচিব। কাল রাত্রে এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিয়াছি। নদী যেন দ্বিধা হইয়া নগরকে গ্রাস্‌ করিতে উদ্যত। সে যেন সাপের দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা; একটা আসিতেছে পূব হইতে, আর একটা উত্তর হইতে, দু'টাতে মিলিয়া নগরকে জড়াইয়া ধরিতে উদ্যত।

সেনাধ্যক্ষ। পূবেরটা বুঝিতে পারি, নদী। উত্তরেরটা কি?

পূর্ত-সচিব। স্বপ্নের আবার বোঝাবুঝি!

সেনাধ্যক্ষ। বোধ করি, তাহারও প্রয়োজন আছে। উত্তর দিকের বিপদও আমাদের আসন্ন।

পূর্ত-সচিব। শত্রু? সে তো শীতকালে।

সেনাধ্যক্ষ। তাহা হইলেই মন্দের ভালো। তবে রক্ষা কিছুতেই নাই। ঐ যে নগরের অগণ্য গৃহ হইতে সূপকার্যের ধূম উঠিতেছে, উঠিতেছে ক্ষীয়মাণ কর্মকোলাহল, ঐ যে পথে লোক-জীবনের চঞ্চলতার চিহ্ন, আর, ঐ যে আরও দূরে ছক-কাটা ক্ষেত্রসমূহে গোধূমের নবাঙ্কুর, ঐ গৃহপালিত গো-মহিষ, ছাগ প্রভৃতি—পালনকর্তার সঙ্গে ইহারাও লোপ পাইবে!

পূর্ত-সচিব। কেমন করিয়া জানিলে?

সেনাধ্যক্ষ। তোমার সেই স্বপ্নে দৃষ্ট দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা—

পূর্ত-সচিব। পূবেরটাকে হয় তো এবারেও সংযত রাখিতে পারিব।

সেনাধ্যক্ষ। কিন্তু উত্তরেরটা? প্রকৃতির লোভ সীমাবদ্ধ, মানুষের লোভকে সংযত করিবে কার সাধ্য?

পূর্ত-সচিব। আজ তোমাকে এত বিমর্ষ দেখিতেছি কেন?

সেনাধ্যক্ষ। কি জানি। ও কিসের গর্জন?

পূর্ত-সচিব। নদীর। পরিচিত গর্জন।

সেনাধ্যক্ষ। তাও বটে। কিন্তু আজ সমস্তর উপরেই কেমন একটা অপরিচয়ের সূক্ষ্ম পর্দা যেন পড়িয়া গিয়াছে।

পরদিন প্রাতঃকালে গুপ্তচর আসিয়া জানাইল যে, উত্তরদিকে অশ্বারোহী আততায়ী দেখা দিয়াছে। এই সংবাদে সেনাধ্যক্ষ বিস্মিত বা বিচলিত কিছুই হইল না, কেবল শুধাইল সংখ্যায় কত?

—অগণ্য, অসংখ্য, তরঙ্গের পরে তরঙ্গ।

ঠিক হইয়াছে। যাও, রাজপুরুষদের নিবেদন করো গিয়া। আমার আর কিছু করিবার নাই। কেবল আমার অনুচরদের বলিয়া দিয়া যাও, এখন হইতে তাহারা আমার আবাসের নিকটেই যেন থাকে, ডাকিবামাত্র যেন পাই।

গুপ্তচর প্রস্থান করিল।

তাহার কথা রাজপুরুষগণের কেহই বিশ্বাস করিল না। কেহ রাগ করিল, কেহ বিরক্ত হইল; কেহ বলিল, সেনাধ্যক্ষ একবার নিজে না আসিয়া লোক পাঠাইয়া পরীক্ষা করিতেছে; কেহ বলিল, আগে আসুক; কেহ বলিল, কোষাধ্যক্ষ যেন কিছু স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত রাখে। দূত চলিয়া গেলে তাহারা পুনরায় বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন হইল।

৫

নগরের চিহ্নিত জীবনের আরও একটা দিন গত হইয়াছে। প্রাতঃকাল। বাঁধের উপরে দণ্ডায়মান পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ। তাহারা নিজ নিজ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে এবং পরস্পরের মনও জানে। রাত্রের মধ্যে জল অনেকটা বাড়িয়াছে, কারিগরেরা ভাঙা জায়গা বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।

সেনাধ্যক্ষ। পূর্ত-সচিব, শেষে তোমার সেই স্বপ্নের কথাই সত্য হইয়া উঠিল দেখিতেছি।

পূর্ত-সচিব। কোন্ কথা?

সেনাধ্যক্ষ। সেই উত্তর দিকের জিহ্বা।

এবারে পূর্ত-সচিব কালকার মতো আর প্রতিবাদ করিল না, উত্তর দিকের বিপদ সম্বন্ধে এখন তাহারা নিঃসংশয়, বস্তুত উত্তর দিগন্ত কখন চঞ্চল হইয়া উঠিবে, তাহা দেখিবার উদ্দেশ্যেই বাঁধের উত্তর প্রান্তে উত্তর দিকে মুখ করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়া ছিল। যে কোন মুহূর্তে উত্তর সীমান্তে ধূলা উড়িয়া উঠিতে পারে।

মধ্যাহ্ন কাটিল, অপরাহ্ণও কাটিয়া গেল, রাত্রি আসিয়া পড়িল। নগরের কোলাহল কমিল, নদীর কলগর্জন বাড়িল; গৃহে গৃহে দীপ জ্বলিল, আকাশে

তারা ফুটিল ; পূবে একখানা ঘনমেঘ উঠিল, তাহার ছায়ায় নদী চামুণ্ডামূর্তি ধরিল।

পূর্ত-সচিব ও সেনাধ্যক্ষ বাঁধ হইতে নামিতে যাইবে, এমন সময় পূর্ত-সচিব চমকিয়া বলিল—ও কি !

—তাই তো—ও কি !

উত্তর দিগন্তে অস্পষ্ট আঁলোর বিন্দু।

—ওখানে তো আলো দেখা দিবার কথা নয় !

—যাহা নয়, তাহাই হইতে চলিয়াছে।

—তবে কি—

কোন সন্দেহমাত্র নাই।

প্রতি মুহূর্তে আলোর সারি দীর্ঘতর, আলোর দীপ্তি উজ্জলতর এবং ক্রমে আলোর সীমানা নিকটতর হইতে লাগিল। পূর্ব হইতে পশ্চিমে যতদূর দেখা যায়—আর অসংখ্য আলোর আভায় কতদূর যে দেখা যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই—সমস্ত আলোর ফুটকিতে ভরিয়া গিয়াছে। আকাশে তারা যেমন অগণ্য, সৈকতে বালু যেমন অসংখ্য, বনস্পতিতে পাতা যেমন অজস্র, তেমনি অগণ্য, অসংখ্য, অজস্র আলোকবিন্দু। আততায়ী সর্পের মাথার মণির প্রভায় সন্ত্রস্ত হরিণ যেমন মুগ্ধ বিস্ময় অনুভব করে, নগরবাসীও তেমনি একপ্রকার ভাব অনুভব করিল। মৃত্যু যদি মোহন মূর্তিতে আসে, তবে তাহার ভয়াবহতা অনেকটা হ্রাস পায়। রাত্রি দুই প্রহরের মধ্যে বসন্তকালে সমস্ত প্রান্তর যেমন ছোট ছোট ফুলে ভরিয়া যায়, তেমনি মহেন-জো-দড়োর উত্তরদিক্ আলোয় আলোয় ভরিয়া গেল। আর বসন্তের অরণ্যে বাতাস বহিলে যেমন একপ্রকার মিশ্রিত গুঞ্জন শ্রুত হয়, তেমনি একপ্রকার চাপা শব্দ উঠিতে লাগিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় নগর-বাসী সেই ভীষণ শোভার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া সে রাত্রিটা ছাদে ছাদে

কাটাইয়া দিল; আর স্থিরকর্তব্য সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব বাঁধ হইতে অবতরণ করিল না, তাহাদের মন আজ লঘু, তাহাদের লক্ষ্য আজ স্থির; কেবল চরাচরব্যাপী নিস্তব্ধতার কালো ঘোড়াটাকে নদীর কলধ্বনির চাবুকের আঘাত বারংবার চঞ্চল করিয়া তুলিতে বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব হইতে পশ্চিম, সকলেই প্রভাতের অপেক্ষায় রহিল।

প্রভাত হইলে উদ্বিগ্ন নগরবাসী দেখিতে পাইল যে, দগ্ধমশালপরিকীর্ণ সেই বিশাল প্রান্তর অশ্ব ও অশ্বারোহীতে পূর্ণ। অশ্বারোহিগণের অনেকে নিদ্রিত, অনেকে সবেমাত্র জাগিয়া উঠিতেছে; অশ্বসকল স্ব স্ব স্থানে দাঁড়াইয়া, ঘাড় নীচু করিয়া, ঘাস খুঁটিয়া খাইতে নিযুক্ত। আবার আততায়িগণ এতক্ষণ স্পষ্টভাবে অট্টালিকারণ্যসদৃশ সেই সমৃদ্ধ নগর দেখিতে পাইল, তাহাদের উৎসাহের অবধি রহিল না।

বাঁধের উপর হইতে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব দেখিতে পাইল যে, নগরবাসীর একটি ক্ষুদ্র দল আততায়িশিবিরের দিকে চলিয়াছে, সঙ্গে কয়েকখানি দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ শকট। তাহারা বুঝিতে পারিল, রাজপুরুষগণ ভেট সহকারে নবোদ্ভাবিত কৌশল-প্রয়োগে নগর রক্ষা করিতে চলিয়াছে।

রাজপুরুষগণ আততায়ীদের দলপতিসমীপে উপস্থিত হইয়া খাদ্যসম্ভার ও স্বুবর্ণমুদ্রা-পূর্ণ পেটিকা অর্পণ করিল, এবং সবিনয়ে নিবেদন করিল যে, এব রে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের ফিরিয়া যাওয়া উচিত। দ:পতি দ্রব্যগুলি গ্রহণ করিয়া জানাইল যে, তাহারা "আরিয়" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; তাহারা উপঢৌকন গ্রহণ করে, কিন্তু উৎকোচ লয় না।

পথাধ্যক্ষ বলিল—গতবারে তো লইয়াছিলে?

ক্রুদ্ধ দলপতি তাহার মুখে চাবুকের আঘাত করিয়া বলিল—চুপ কর্ বর্বর!

দলপতির আদেশে কয়েকজন লোক আসিয়া রাজপুরুষগণের বেশবাস

কাড়িয়া লইয়া তাহাদের খুঁটির সহিত বাঁধিয়া ফেলিল। তারপরে দলপতির আদেশে সমস্ত প্রান্তর চঞ্চল হইয়া উঠিল, আততায়িগণ যে যাহার অশ্বে চড়িয়া প্রস্তুত হইল।

বাঁধের উপর হইতে সেনাধ্যক্ষ ও পূর্ত-সচিব দেখিল যে, অশ্বারোহিগণ নগরের দিকে ধাবিত হইয়াছে, সারির পরে সারি, তরঙ্গের পরে তরঙ্গ; প্রথম দলের পদাঘাতেই রাজপুরুষগণ পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিল, তারপরে ঝটিকা-চালিত সমুদ্র-তরঙ্গ যেমন তটে আঘাতের পরে আঘাত করিতে থাকে, তটভূমি রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া উঠিতে থাকে, তেমনি সমস্ত কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। নগরবাসী যুদ্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, তাই স্ত্রীপুরুষ বালকবৃদ্ধ শতে শতে পলায়ন করিতে লাগিল; একদিকে অসহায় আর্তনাদ, অপরদিকে অশ্ব ও মানুষের বিজয়োল্লাস! নগর ও নগরবাসী প্রহত, আহত, নিহত, দলিত, মথিত, মর্দিত হইতে লাগিল।

সেনাধ্যক্ষ বলিল—ভাই, আর সহ্য হয় না, চলিলাম।

পূর্ত-সচিব বুঝিল, মুষ্টিমেয় অনুচর লইয়া সেনাধ্যক্ষ মরিতে চলিল।

পূর্ত-সচিব বলিল—যাও, আমিও আসিতেছি, কিন্তু নগর অধিকৃত হইতে দিব না—ইহা নিশ্চয় জানিও।

সেনাধ্যক্ষ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সব বুঝিল, তাহারা পরস্পরের মন ভালো করিয়াই জানিত।

নিঃসঙ্গ পূর্ত-সচিব দেখিল, মুষ্টিমেয় অনুচর-পরিবৃত সেনাধ্যক্ষ শত্রুসৈন্য-মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল, আর প্রবল আবর্তে তৃণখণ্ড ভাঙিয়া যেমন শত খণ্ড হইয়া কোথায় বিলীন হয়, সেনাধ্যক্ষ ও তাহার সৈন্য কয়েকজন মুহূর্তমধ্যে তেমনি কোথায় তলাইয়া গেল!

সেনাধ্যক্ষ তাহার ঋণ শোধ করিল, রাজপুরুষগণ আগেই করিয়াছিল, এবারে পূর্ত-সচিবের পালা। সে দেখিল যে, এমন বহু সহস্র অশ্বারোহী

বাঁধের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। সে বুঝিল, সুযোগ আসিয়াছে। সে একবার নদীর দিকে তাকাইল, কাল রাত্রিতে বন্যায় জল ও স্রোত দুই-ই বাড়িয়াছে!

তখন সেই বৃদ্ধ বাঁধের উপর নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল, বসিয়া পড়িয়া করজোড় করিয়া ঊর্ধ্বে চাহিয়া বলিল, হে মৎস্যদেব, এ নগর তোমার, তুমি ইহাকে রক্ষা করো। হে মৎস্যদেব, এ নগর তোমার আশ্রিত, শত্রুকবল-গ্রাসের গ্লানি হইতে তুমি ইহাকে রক্ষা করো। হে মৎস্যদেব, আমি দুর্বল, আমার মনে বল দাও।

তারপরে সিন্ধুনদের দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল—হে নদ, এতদিন তোমাকে বিষম শত্রু মনে করিতাম, আজ তুমি পরম মিত্র! হে নদ, এতদিন তোমার গ্রাস হইতে নগর-রক্ষায় প্রাণপণ করিয়াছি, আজ বুঝিতেছি, তোমার গ্রাসই নগর-রক্ষার একমাত্র উপায়। হে নদ, তুমি নগর গ্রাস করো, গ্রাস করিয়া শত্রু কবল হইতে রক্ষা করো। হে নদ, তুমি মৎস্যদেবের বাহন, এ নগর মৎস্যদেবের আশ্রিত, তুমি তাহাকে আপন আচ্ছাদনে ঢাকিয়া রক্ষা করো।

তারপরে আর্তকণ্ঠ আকাশের দিকে নিক্ষেপ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল,—বল দাও, দেবতা, বল দাও।

এই বলিয়া নীচে যেখানে কারিগরগণ বাঁধ মেরামত করিতেছিল, সেখানে সে নামিয়া গেল—চীৎকার করিয়া বলিল—লাগা, লাগা, সকলে হাত লাগা।

প্রভুর উৎসাহবাক্যে সকলে দ্বিগুণ বেগে প্রাচীর গাঁথিতে সুরু করিল, কিন্তু পূর্ত-সচিব বলিল—না, না, আজ উল্টো হাত লাগা!

—সে কি প্রভু!

—ঐ তো রে। যখনকার যা নিয়ম! ভাঙ! ভাঙ! বাঁধ ভাঙিয়া ফেল!

সকলে ভাবিল, পূর্ত-সচিব উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অন্যথা করিতে পারিল না, যেহেতু তাহারা প্রভুর আদেশ পালনে অভ্যস্ত, বিশেষ দেখিতে পাইল যে, স্বয়ং প্রভু বাঁধ ভাঙিবার কাজে অগ্রণী হইয়া হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

সকলে বাঁধ ভাঙিতে লাগিয়া গেল! গড়া কঠিন, ভাঙা সহজ। ভাঙন অপ্রত্যাশিত দ্রুত বাড়িয়া চলিল, বিশেষ সঙ্গে ছিল বন্যার প্রচণ্ড সহযোগিতা। দেখিতে দেখিতে দণ্ড দুই সময়ের মধ্যে বাঁধের একটা বিরাট অংশ ধ্বসিয়া পড়িয়া সেখানে জল ঢুকিল; জলের পথ মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়িতে লাগিল, এবং এক সময়ে একটা সুবৃহৎ তরঙ্গের প্রচণ্ড ধাক্কায় বাঁধের সমগ্র উত্তর অংশটা খসিয়া পড়িয়া মৎস্যদেবের তরঙ্গশীর্ষ বিজয়রথ নগরমধ্যে বিজয়-কল্লোলে ঢুকিয়া পড়িল।

জলের প্রথম আঘাতেই সানুচর পূর্ত-সচিব কোথায় ভাসিয়া চলিয়া গেল! এতক্ষণ পরে পূর্ত-সচিবও তাহার ঋণ শোধ করিল।

সমস্ত নদীটা যেন নগরমধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

অশ্বারোহিগণ পার্শ্বে তাকাইয়া দেখিল—এ এক অপ্রত্যাশিত সঙ্কট! নদী তাড়া করিয়া পিছনে পিছনে আসিতেছে! জল অতলস্পর্শ। তখন পিছু হটিবার তাড়া পড়িয়া গেল। একদল অশ্বারোহী অপর দলকে মথিত করিতে লাগিল, সকল দলই ডুবিয়া মরিল। অশ্বারোহিগণ প্রান্তরবাসী, নদীকে তাহাদের বড় ভয় ছিল, অবশেষে সেই নদীই তাহাদের আক্রমণ করিল! সকলে ডুবিল! নগরবাসী ও অশ্বারোহী কেহই প্রাণে বাঁচিল না। কেবল যে-সব অশ্বারোহী জলের সীমানার বাহিরে ছিল, তখনো নগর-সমীপে আসিয়া পৌঁছায় নাই, তাহারাই বাঁচিল; তাহারা অশ্বের মুখ ফিরাইয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে দ্রুততর বেগে ছুটিয়া পলাইল।

প্রাতঃকালে যেখানে ধনজনসমৃদ্ধ মহানগর ছিল, সন্ধ্যাকালে সেখানে দেখা গেল, দুস্তর জলমেরুর অমেয় বিস্তার!

পূর্ত-সচিব সত্যই তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছে, নগর শত্রুগণ কর্তৃক অধিকৃত হইতে সে দেয় নাই।

চরাচরব্যাপী সেই তরল অন্ধকারের ভূমিকার উপরে নিত্যকার মতো আজও নিঃশব্দে সন্ধ্যাতারাগুলি উঠিল।*

* এই গল্প রচনায় ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ তথ্যের কাছাকাছি থাকিতে চেষ্টা করিয়াছি। মহেন-জো-দড়োর ধ্বংসের দু'টি কারণ অনুমান করা হয়—সিন্ধুর বন্যা ও আর্যজাতির আক্রমণ। ইতিহাসের সহিত যেটুকু কল্পনা মিশাইলে গল্প হয়, তাহার বেশী কল্পনা না মিশাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

বিমল মিত্র

বিমল মিত্রের সাহিত্য-কীর্তির পশ্চাতে বহু বৎসরের অক্লান্ত অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার ইতিহাস আছে। যে-যুগে 'প্রবাসী' পত্রিকায় রচনা প্রকাশের অর্থ ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, সেই যুগে তিনি সে-পত্রিকায় নিয়মিত গল্প প্রকাশ করার পর একদিন হঠাৎ সাহিত্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিয়ে অজ্ঞাতবাস আরম্ভ করেন। দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের অধ্যায়ে স্বদেশে এবং বিদেশে জীবিকা-অর্জন ও জীবন-যাপনের সূত্রে তিনি যে-সব বিভিন্ন জীবন-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেই সময়ের সেই সব বিচিত্র উপাদান-সম্ভার নিয়ে আবার একদিন নতুন রূপে সাহিত্য-জগতে আবির্ভূত হন। এবং তাঁর এই পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙলা উপন্যাস-গল্প-সাহিত্যে বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, চরিত্র-চিত্রণ, ও সমাজ-চিন্তার দিক থেকে এক নতুন অধ্যায় সুরু হয়েছে।

যে-গল্প লেখা হয়নি

যে-গল্প আমি আজো লিখিনি, সেই গল্পটা বলি।

মাত্র দু'রতি ওজনের এক টুকরো হীরে। তাই নিয়েই একটা গল্প মাথায় এসেছিল। গল্পটা লেখবার আগে উষাপতিকে একটা চিঠি লিখেছিলাম, তার অনুমতি চেয়ে।

উষাপতি উত্তরে লিখেছিল, 'সতীকে নিয়ে গল্প তুই লিখতে পারিস, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু দেখিস ভাই, যাতে সতীর কোনো দুর্নাম বা বদনাম হয়, এমন কিছু লিখিস নে। জানিস তো, মেয়েমানুষের মন, চট্ করে এমন কাণ্ড করে বসবে—'

আরো অনেক কথা লিখেছিল। উষাপতি তখন ছিল পলাশপুরের

স্টেশন-মাস্টার। এখন বদলি হয়েছে রায়গড়ে। মাইনেও অনেক বেড়েছে। দু'পয়সা এদিক-ওদিক থেকেও আসে। নিজেও বিশেষ খরচে-স্বভাবের লোক নয়। কিন্তু চিঠির শেষে লিখেছে, 'তোদের ওখানে যদি ভালো কোনো ডাক্তার থাকে, একটু খবর নিয়ে জানাস, সতীকে চিকিৎসা করাতে চাই। অনেক ডাক্তার, বদ্যি, হাকিম, সাধুকে দেখালাম—খরচও হচ্ছে প্রচুর—কিন্তু কিছুই হচ্ছে না—'

উষাপতির অনুমতি নিয়ে গল্পটা আরম্ভ করেছিলাম বটে। কিন্তু লিখতে গিয়ে হঠাৎ কেমন হাসি এল। সতীকে নিয়েই গল্পটা বটে! উষাপতিকে অবশ্য জানাইনি দু'রতি ওজনের হীরের কথা। জানিয়েছিলাম, সতীই আমার গল্পের নায়িকা। কিন্তু আসলে তো জানি যে, সতী আমার গল্পের উপনায়িকা ছাড়া আর অন্য কিছুই নয়। শকুন্তলার যেমন প্রিয়ম্বদা! কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে আমার ঘরে কে এসেছিল? এ-গল্পের নায়িকা, না, উপনায়িকা?

সত্যি সেই রাতটার মধ্যেও যেন কিছু মোহ ছিল। সেটা বুঝি ফাল্গুনী-পূর্ণিমার রাত। জীবনে কতদিন জীবিকার জন্যে রাতের পর রাত জেগে কাটিয়েছি তার হিসেব নেই। অফিসের চারটে দেয়ালের মধ্যে কাজ করতে করতে অনেকবার বাইরে চেয়ে দেখেছি। কেমন করে রাতের গাঢ় অন্ধকার পাতলা হয়ে নীল হয়, সেই নীল কেমন করে সাদা হয় তাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু তবু মনে হয়েছে রোজই যেন নতুন দৃশ্য দেখছি। দশ বছর আগের সেই রাতটা যেন আজো আমার জীবনে অনন্য আর একক হয়ে রয়েছে। পলাশপুরের স্টেশন-মাস্টারের বাঙলোর সেই সঙ্গীহীন ঘরে সারারাত তো আমার অনিদ্রাতেই কেটেছিল। তবু সকালবেলা জলখাবার খেতে বসে উষাপতি অবাক্ হয়ে গিয়েছিল আমার চেহারা দেখে।

বলেছিল, 'রাত্রে তোর ঘুম হয়নি নাকি?'

বলেছিলাম, 'না।'

উষাপতি বলেছিলন 'আমারও হয়নি।'

কী জানি কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। বলেছিলাম, 'কেন, তোর হয়নি কেন?'

উষাপতি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেছিল…

কিন্তু যা বলেছিল, তা বলবার আগে গোড়া থেকে সমস্ত ঘটনাটাই বলা দরকার।

উষাপতি তখন সবে বদলি হয়েছে পলাশপুরে। নতুন বিয়ে করে সংসার পেতেছিল ওখানে। ওর অনেকদিনের সাধ ছিল আমাকে ওর বউ দেখায়। চিঠিতে লিখেছিল কতবার। নাকি বেশ নিরিবিলি জায়গা। অন্তত কলকাতার চেয়ে নিশ্চয়ই নিরিবিলি। চার-পাঁচটা কোলিয়ারীর সাইডিং শুধু বেরিয়ে গেছে স্টেশন থেকে। কোলিয়ারী ছাড়া স্টেশনের আর কোনো উপযোগিতাও ছিল না। মাঝে মাঝে চিঠি লিখতো আমাকে, 'এবার শীতকালে নিশ্চয়ই আসিস। তোর জন্যে সব রকমের ব্যবস্থা করে রেখেছি।'

কিন্তু যাওয়া আর আমার হয়ে ওঠেনি। উষাপতি যখনই ছুটিতে এসেছে, দেখা করেছে আমার সঙ্গে। বলেছে, 'আমার ওখানে গেলি না তো একবার?'

বিশেষ করে, স্টেশন-মাস্টারের বাড়িতে অতিথি হওয়ার একটা লোভও ছিল বরাবর। মুরগি, মাছ, ডিম, ঘি—সবই স্টেশন-মাস্টারের প্রায় বিনা-পয়সায় প্রাপ্য। আকারে-প্রকারে উষাপতি আমাকে জানিয়েও দিয়েছে সে-কথা। কিন্তু নিজের কোটর ছেড়ে নড়া-চড়া করার সুবিধে হয়ে ওঠেনি বলে যাওয়াও হয়নি ওর কাছে।

কিন্তু সেবার বিলাসপুরে যাবার পথে কেমন করে যে কাটনী স্টেশনে হঠাৎ নেমে পড়লাম, তা নিজেই জানি না। কাটনী থেকে কয়েকটা স্টেশন গেলেই পলাশপুর। ব্রাঞ্চ লাইনের ট্রেন। একটা রাত থাকবো ওখানে, তারপর পরদিন আবার ফিরবো এই-ই ছিল মতলব।

যখন গিয়ে পলাশপুরে পৌঁছলাম তখন বিকেল।

স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিল উষাপতি। সাদা গলাবন্ধ কোট পরলেও চিনতে কষ্ট হল না। আমাকে দেখেই একেবারে জড়িয়ে ধরেছে।

বললাম, 'কিন্তু কালকেই আমাকে ছেড়ে দিতে হবে ভাই, ভীষণ কাজ—'

'সে হবে না' বলে কাকে যেন হুকুম দিলে আমার মালপত্তোর বাড়িতে নিয়ে যেতে।

তা পলাশপুর বেশ বড় স্টেশন। সব গাড়ি জল নেয় এখানে। বাইরে বিরাট একটা খেলার মাঠ। জাফরি-দেওয়া বড় বড় বাঙলো। রাস্তায় ফিরিঙ্গী সাহেব-মেমেদের ভিড়। সাইকেল-রিক্স'র চল্ আছে বেশ এদিকে। বিকেল-বেলার গাড়ি দেখতে প্লাটফরমে টাউনের লোক এসে জুটেছে। গাড়ি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সব চলে গেল প্লাটফরম থেকে। ফাঁকা স্টেশন।

উষাপতির হাজার কাজ। দশজনকে হুকুম দিতে হয়। দশজনকে শাসন করতে হয়।

কাজের ফাঁকে একবার বললে, 'আর একটু বোস, একসঙ্গে যাবো বাড়িতে—আর এই কাজটা সেরে নি।'

শেষ পর্যন্ত একসময় কাজ সেরে উঠলো উষাপতি। বললে, 'আর পারিনে কাজের ঠেলায়! এই দেখ্ না, তুই এলি তোর সঙ্গে একটু ভালো করে কথা পর্যন্ত বলতে পারলাম না—যা হোক, তারপর কাল কিন্তু তোর যাওয়া হবে না বলে রাখছি—ওসব ওজর আপত্তি শুনছিনে।'

বললাম, 'তা হয় না রে। ওদিকে একদিন দেরি হলে ভারি অসুবিধে হবে আবার—'

'সে কৈফিয়ত দিস তুই মিলির কাছে, তার হাতে তোকে ছেড়ে দিয়ে আমি খালাস, ভাই—বাড়ির ব্যাপারে আমি নাক গলাই না। বাড়ির মধ্যে

ঢুকেছ কি আমার এলাকার বাইরে চলে গেলে—সেখানে মিলির কথাই ফাইন্যাল।'

বললাম, 'পুরোপুরি ডিভিসন-অব-লেবার দেখছি!'

উষাপতি সিগ্রেটে টান দিতে দিতে বললে, 'না করে উপায় ছিল না, ভাই। আমার অফিসের এত কাজ যে, এর পরে আর বাড়ির কোনো ব্যাপারে মাথা ঘামাবার ফুরসুত পাই না, ওটা মিলি নিজেই ঘাড়ে নিয়েছে, বলেছে,—'বাড়ির ব্যাপারে সম্পূর্ণ আমায় স্বরাজ দিতে হবে। তা এমন কি, ওর চিঠি পর্যন্ত আমি খুলে পড়তে পারবো না, ও-ও আমার চিঠিপত্র খুলবে না।'

তারপর একটু থেমে বললে, 'এই যে তুই এলি, কী খাবি না খাবি,—সমস্ত ভাবনা তার। কোথায় শুবি, কী করবি—ও নিয়ে আমায় আর মাথা ঘামাতে দেবে না।'

বললাম, 'এ রকম স্ত্রী পাওয়া তো সৌভাগ্যের কথা রে।'

উষাপতি হাসলো। বেশ যেন পরিতৃপ্তির হাসি। বললে, 'তা জানিনে। তবে যারা এসেছে বাড়িতে, দেখেছে মিলিকে, তারা বলে,—আমার নাকি স্ত্রীভাগ্য ভালো। তবে বিয়ে তো একটাই করেছি, তুলনামূলক বিচার করতে পারবো না ভাই।'

উষাপতি আবার বলতে লাগলো, 'আমি অবশ্য তোদের অনেক পরে বিয়ে করেছি, বলতে পারিস একটু বুড়ো বয়েসেই। মনে একটা ভয় ছিল বরাবর, এ বয়সে বিয়ে করে হয়ত আর-একজনকে কষ্ট দেব—কিন্তু…'

'কিন্তু' বলে কথাটা আর শেষ করলো না উষাপতি। আত্মতৃপ্তির এক বাঙ্ময় হাসিতে আবার ভরে উঠলো উষাপতির মুখ। সে-হাসি গোপন করতে চেষ্টা করলো না উষাপতি।

বললাম, 'তাহলে বিয়ে করে খুব সুখী হয়েছিস বল্—বিয়ে করবো না

বলে যে রকম পণ করেছিলি তুই —'

উষাপতি আবার হাসলো। বললে, 'সুখী ?…তবে আমি মিলিকে বলেছিলাম বি. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে দিতে, কারণ বরাবর ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করে এসেছে—শেষকালে আমাকে না দোষ দেয় যে, তোমার জন্যে আমার ডিগ্রীটা পাওয়া হল না ! তা, কী বলে জানিস—'

বললাম, 'কী বলেন ?'

'মিলি বলে…'

কিন্তু মিলি কী যে বলে তা আর বলা হল না। হঠাৎ ল্যাজ নাড়তে নাড়তে একটা বিলিতী টেবিয়ার কুকুর এসে আপ্যায়ন জানাতে লাগলো উষাপতিকে। উষাপতি বললে, 'আরে, তুই ঠিক টের পেয়েছিস দেখছি !'

বললাম, 'তুই আবার কুকুর পুষেছিস নাকি ?'

'আরে, আমি পুষতে যাবো কেন ? মিলির। মিলির ছোটবেলাকার কুকুর, বিয়ের পর এ-ও এসেছে সঙ্গে…যাক্‌গে যে-কথা বলছিলাম—' বলে উষাপতি আবার পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে এল।

গলা নীচু করে হাসতে হাসতে বললে, 'কালকে আমাদের বিয়ের বার্ষিকী গেছে কিনা—খুব খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল, কুকুরটা খুব খুশি আছে তাই, তা সেই উপলক্ষে হীরে-বসানো নেকলেস একটা দিয়েছি ভাই, মিলিকে—আনিয়েছি কলকাতা থেকে ! তুই একবার দেখিস তো—বেটারা ঠকালো, না, ঠিক দাম নিয়েছে।'

বললাম, 'কত দাম নিলে ?'

'চোদ্দ শো টাকা নিয়েছে অবশ্য, তা নিক্‌গে, সে জন্যে কিছু নয়। উপ্‌রি পয়সা ওয়াগন পিছু কিছু-কিছু পাওয়া যায়, কোলিয়ারী যদ্দিন আছে ভাই, টাকার অভাবটা নেই তদ্দিন। তারপরে যদি বদলি করে কখনও কোনো খারাপ স্টেশনে তখন দেখা যাবে—'

কথা বলতে বলতে উষাপতির বাঙলোর সামনে এসে গিয়েছিলাম। উষাপতির আভাস পেয়ে বুঝি তার স্ত্রীও এসে দাঁড়ালো সামনে। আমাকে অবশ্য আশাই করছিল। কারণ আমার স্যুটকেস, বিছানা আগেই পৌঁছে গেছে এখানে।

কিন্তু উষাপতির স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে কেমন যেন থমকে গেলাম। আমাকে দেখে যেন কালো হয়ে এল তাঁর মুখখানা।

তবে একমুহূর্তের জন্যে! এমন কিছু নজরে পড়বার মতো নয়।

উষাপতি এগিয়ে গিয়ে বললে, 'এই দেখো, কাকে এনেছি। আমাদের দলের হীরো এ—আর ইনি—'

আলাপ হল। এবার হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন মিলি দেবী। টেবিলে গিয়ে বসলাম। চায়ের সরঞ্জাম তৈরি ছিল।

চা তুলে নিয়ে উষাপতি বললে, 'কিন্তু ও কী বলছে জানো, ও নাকি কালই চলে যাবে।'

মিলি দেবী হঠাৎ অবাক্ হয়ে আমার দিকে চাইলেন, 'সে কী। তা বললে শুনছি না, কাল আপনার যাওয়া চলবে না।'

উষাপতি বললে, 'এখন তোমার হাতে ভার দিয়ে দিলাম—আমার আর কিছু করবার নেই। যা ভালো বোঝো করো।'

মিলি দেবী হাসতে হাসতে বললেন, 'তাই নাকি ?'

বললাম, 'ক্ষমা করবেন এবার। পরের বার বরং থাকবো যতদিন বলেন, এবারে বিশেষ জরুরী কাজে—'

মিলি দেবী বললেন, 'বাড়িতে যখন আমার এলাকার মধ্যে এসেছেন, তখন আপনাকে দু'দিন থেকে যেতেই হবে···আমরা বিদেশে পড়ে থাকি, একটু বুঝি দয়া-মায়া নেই আপনাদের ?'

উষাপতি হাসতে লাগলো।

হাসতে লাগলাম আমিও।

মিলি দেবীও হাসতে লাগলেন।

কথা বলতে বলতে উষাপতি হঠাৎ বললে, 'তোমার নেকলেসটা দাও তো একবার, দেখাই।'

বললাম, 'আমি তো এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি বেশ—ওঁর গলাতেই তো মানাচ্ছে ভালো। কেন আর—'

উষাপতি বললে, 'না না, তা কি হয়। হারটা খুলে দাও—বেটারা ঠকালো কিনা জেনে নেওয়া ভালো। এ আমাদের ভালো সমঝদার একজন, ওদের ফ্যামিলিতে এ-সব জিনিস আছে অনেক।'

মিলি দেবী নেকলেসটা খুললেন। বেশ চমৎকার জিনিসটা মনে হল। দেখে মনে হল, ন্যায্য দামই নিয়েছে। নতুন ডিজাইনের জড়োয়ার কাজ করা হার। ঠিক লকেটের ওপর একটা দু'রতির হীরে জ্বলজ্বল করছে।

হারটা ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, 'বড় সুন্দর জিনিস—আপনার পছন্দ আছে বৌদি।'

মিলি দেবী খানিক পরে চলে যাবার পর উষাপতি বললে, 'বেশি বয়সে বিয়ে করলে এই সব গুনোগার দিতে হয় ভাই।'

বললাম, 'কেন? এ কথা বলছিস কেন?'

উষাপতি সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কী একটা কাজে পাশের ঘরে চলে গেল। আমিও এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে লাগলাম। বড়লোক হয়েছে উষাপতি এখন। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুন্দরী স্ত্রী পেয়েছে। শুধু সুন্দরী স্ত্রী নয়, সুশিক্ষিতা বিদূষী বলা চলে। হয়ত উষাপতি নিজের ঐশ্বর্য দেখাতেই আমাকে এতবার আসতে নিমন্ত্রণ করেছিল। তবু খুশি হলাম দেখে যে, তার জীবন সার্থক হয়েছে। বিয়ে করে সুখী হয়েছে সে। বাপ-মা-মরা উষাপতি। বড় গরীব ছিল আমাদের দলের মধ্যে। বরাবর ওর উচ্চাশা,

একদিন আমাদের সমান পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে। এতদিন পরে তা সফল হয়েছে। দেখে আনন্দই হল।

অনেকদিন আগেকার কথা। ভালো করে সব মনে নেই। শুধু মনে আছে বেশ আনন্দে, হাসিতে, গল্পে কেটে গেল সে-সন্ধ্যেটা। আরো মনে আছে বার বার মিলি দেবী কেবল বলেছেন, 'কাল আপনার যাওয়া হবে না তা বলে, আর একটা দিন থাকতেই হবে।'

সেইদিন রাত্রেই ঘটনাটা ঘটলো।

ঠিক কত রাত্রে বলতে পারবো না। নতুন জায়গায় ঘুম আসছিল না। মনে হল ভেজানো দরজাটা খুলে কে যেন ঘরে ঢুকলো। নিস্তব্ধ রাত। শুধু মাঝে মাঝে রেলের ইঞ্জিনের ফোঁসফোঁসানি আর আক্রোশের গর্জন কানে আসে।

বললাম, 'কে ?'

ছায়ামূর্তি বললে, 'আমি—'

বিছানার ওপর সটান উঠে বসেছি। অস্পষ্ট হলেও অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না।

বললাম, 'আপনি! হঠাৎ ?'

মিলি দেবী বলে উঠলেন, 'আপনি হঠাৎ এখানে আসতে পারেন, আর আমি পারি না ? এ আমার বাড়ি, আমার স্বামীর ঘর, আমি এখানে খুব সুখে ছিলাম—কেন তুমি এলে ? বলো, সত্যি কথা বলো—কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে ?'

হতচকিত নির্বাক বিস্ময়ে আমার কণ্ঠরোধ হয়ে এল।

বললাম, 'কী বলছেন আপনি!'

'চীৎকার কোরো না, পাশের ঘরে আমার স্বামী শুয়ে আছেন। তুমি ললিতকে বোলো, মিলি তাকে ভুলে গেছে। কাঁসারিপাড়া লেন-এর সে-

বাড়িটা সে-ঘরটা আমার আর মনে নেই, আমি এখন মিলি মল্লিক—আমি এখন পরস্ত্রী…'

আবার বললাম, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'মিথ্যে কথা বোলো না, আমি তোমাদের সবাইকে চিনি। ললিত তোমার ভাগ্নে নয়? বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিক্‌নিক্ করতে আমাদের সঙ্গে যাওনি তুমি? ইণ্টারমিডিয়েট টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে ট্যাক্সি করে কারা ঘুরিয়েছিল আমাকে! আমরা গরীব ছিলুম, তাই তোমাদের সাহায্য আমরা তখন নিয়েছি। কিন্তু এখন তো আমি বড়লোকের স্ত্রী! এখানে তোমাদের প্রয়োজন মিটে গেছে। এখন শাড়ি দিতে এলেও নেব না, গয়না দিতে এলেও নেব না আমি, সিনেমা দেখাতে এলেও যাবো না তোমাদের সঙ্গে—কেন এসেছ তুমি? একজনকে পাগল করে দিয়েছ বলে ভেবেছ আমাকেও করবে? সত্যি বলো তো, কিছু মনে পড়ছে না?'

ললিত নামে কোনো ভাগ্নে দূরে থাক, ও-নামের কোনো বন্ধুও আমার কোনো কালে ছিল না। কী জানি কী খেয়াল হল, বললাম, 'পড়ছে।'

'ললিত তোমায় পাঠিয়েছে? সত্যি কিনা বলো?'

এবারও বললাম, 'হ্যাঁ।'

'আমি তোমাদের সকলকে চিনি, জানতাম না আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে—কিন্তু তোমাদের পায়ে পড়ি, আর কখনও এসো না এখানে, যাও কাল সকালেই চলে যেয়ো এখান থেকে—বুঝলে?'

বললাম, 'যাবো।'

'হ্যাঁ, তাই যেয়ো।'

শরীরটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে মিলি দেবী যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন।

তারপর সমস্ত রাত আমার আর ঘুম এল না। মনে হল—কার ভুল?

আমার, না, মিলি দেবীর ? আর কখনো কোথাও ওঁকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। কে ললিত ? কার ভাগ্নে ? কবে কার সঙ্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরেছেন ? কবে ঘুরে বেড়িয়েছেন ট্যাক্সিতে ? আমার চেহারার সঙ্গে কি অন্য কারো চেহারার বা নামের মিল আছে ? নিজের স্মৃতির অলি-গলি-ঘুঁজি সমস্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো কিনারা করতে পারিনি।

ভোরবেলাই বিছানা ছেড়ে উঠেছি।

উষাপতি তারও আগে উঠেছে। চায়ের টেবিলে পোশাক পরে তৈরি সে। এখনি বোধ হয় ডিউটিতে যাবে। পাশে কালকের মতো মিলি দেবীও বসে। কিন্তু চেহারার মধ্যে কোনো বৈলক্ষণ্য নেই যেন।

উষাপতি আমাকে দেখেই বললে, 'কাল রাত্রে তোর ঘুম হয়নি নাকি ? এ রকম চেহারা কেন রে ?'

বললাম, 'না, নতুন জায়গা বলে হয়ত।'

উষাপতি বললে, 'আমারও হয়নি।'

জিগ্যেস করলাম, 'কেন ?'

উষাপতি বললে, 'সতী কাল রাত্রে বড় বিরক্ত করেছে।'

'সতী ! সতী কে ?' জিগ্যেস করলাম।

মিলি দেবী চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'আমার দিদি।'

উষাপতি বললে, 'হ্যাঁ, মিলির দিদি। মাথাটা সম্প্রতি খারাপ হয়েছে, পাগলের মতো লক্ষণ, আমার এখানেই রয়েছে এখন।'

হঠাৎ যেন সন্দেহ হল। মিলি দেবীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। শান্ত, পরিতৃপ্ত, স্নিগ্ধ দৃষ্টি। কাল রাত্রে তবে কি ভুল দেখেছি ? পাগলের প্রলাপ শুনেছি কেবল ?

উষাপতি আবার বললে, 'মাঝে মাঝে বেশ থাকে, কাল রাত থেকে আবার হঠাৎ কিরকম মাথাটা বিগড়ে গেছে—সারা বাড়িময় ঘুরে ঘুরে

বেড়িয়েছে, চীৎকার করেছে, বকেছে—কেঁদেছে—'

উষাপতি আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখালে। একটা ঘরের ভেতর বন্ধ। অবিকল মিলি দেবীর মতো দেখতে। বয়সে দু'-এক বছরের ছোট-বড় হয়ত। ঘরের মধ্যে আপন মনেই বিড়বিড় করে বকছে।

উষাপতি বললে, 'এখন ওইরকম কিছুদিন থাকবে, তারপর আবার কিছুদিন ভালো হয়ে যাবে—স্বামী নেয় না, তারপর থেকেই···কিন্তু তুই আজকে থাকছিস তো ?'

বললাম, 'না ভাই, আজ পারবো থাকতে।'

উষাপতি মিলির দিকে চেয়ে বললে, 'ও কী বলছে শোনো —থাকবে না নাকি আজ।'

মিলি দেবী তেমনি স্নিগ্ধ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'তা হবে না, থাকতেই হবে কিন্তু—'

চা খেতে খেতে হঠাৎ উষাপতি একবার স্ত্রীর দিকে কৌতূহলী হয়ে যেন কী দেখতে লাগলো। কাছে গিয়ে গলার নেকলেসটা দেখে বললে, 'একি ! তোমার লকেটের হীরে কোথায় গেল ?'

'কই দেখি ? কী সর্বনাশ !'

আমিও দেখলাম।

মিলি দেবীও নেকলেসটা খুলে দেখে অবাক্ হয়ে গেছেন। তাই তো ! কাল সন্ধ্যেবেলাও তো ছিল সেটা ! কোথায় গেল একরাত্রের মধ্যে ! খোঁজো তো বিছানাটা ! বিছানাটা খোঁজা হল। খোঁজা হল ঘর-দোর। এখানে-ওখানে। ব্যস্ত হয়ে পড়লো উষাপতি। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মিলি দেবী। কোথাও তো যাওনি ! দেখো তো বাথরুমটা ! যাবে কোথায় ? হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে না। শোবার ঘর, হল ঘর, আর নয়তো বাথরুম।

কিন্তু বৃথা চেষ্টা! সেদিন কোথাও সেই দু'রতি ওজনের হীরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি সেদিন। উষাপতি আর মিলি দেবীর কাছে আজ পর্যন্ত সেটা নিরুদ্দেশ হয়েই আছে হয়ত!

মনে আছে সেদিন কারো অনুরোধ উপরোধ না-শুনেই চলে এসেছিলাম পলাশপুর থেকে।

ফিরে এসে গল্পটা সমস্ত লিখে পাঠিয়েছিলাম উষাপতির কাছে। আপত্তির কিছু আছে কিনা জানতে। উত্তরে উষাপতি লিখেছিল, 'মিলিও তোর গল্পটা মন দিয়ে পড়েছে। বলেছে,—গল্পটা ভালো হয়েছে, কিন্তু যেন অসম্পূর্ণ মনে হল লেখাটা। দু'রতি হীরের কথাটা গল্পের পক্ষে, মনে হলো, যেন অবান্তর হয়ে গেছে। গল্পের সঙ্গে ওর যোগাযোগ কী বোঝা গেল না, আমি অবশ্য সাহিত্যের কী-ই বা বুঝি—যা হোক সেই হীরেটা এখনও পাওয়া যায়নি, পাওয়া যাবেও না বোধহয়।'

আজও এক-একবার ভাবি, মিলি দেবীকে চিঠি একটা লিখবো নাকি? লিখবো নাকি হীরেটা আমার কাছেই আছে? জানিয়ে দেবো নাকি যে, সেদিন ভোরবেলা নিজের বিছানাটা বাঁধবার সময় আমার শোবার ঘরেই সেটা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম? সেই দু'রতি ওজনের হীরেটা! কিন্তু আবার ভাবি, থাক্ না। উষাপতি স্ত্রী নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করছে। ওদের সংসারে আগুন জেলে লাভ কি! আমার এ গল্প যদি অসম্পূর্ণ থাকে তো থাক—আমি জীবনে আরো অনেক সম্পূর্ণ গল্প লিখতে পারবো, কিন্তু ওরা সুখে থাকুক। আমার একটা গল্পের চেয়ে ওদের জীবন অনেক দামী!

সমাপ্ত